# একাত্তরের বাংলাদেশ

লে. কর্নেল সরদার মাহমুদ হোসেন (অব.)



একাত্তরের বাংলাদেশ
লে. কর্নেল সরদার মাহমুদ হোসেন (অব.)

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বঙ্গোপসাগরের কোল জুড়ে আদুরে কন্যার মতো ৫৫ হাজার বর্গমাইল ব্যাপ্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। এখানে ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয় আবহাওয়ার, বিস্তৃত শ্যামলিমার, মনের। চৈত্রের কাঠফাটা রোদ্দুরে দেখা যায় খটখটে শুকনো মাঠ, বিবর্ণ ঘাস, বৃক্ষরাজি। আবার বর্ষার ছোঁয়ায় দেখতে দেখতে নরম মাটিতে খেলে যায় সবুজের হিল্লোল। এ সেই বাংলাদেশ যেখানে বৈশাখের নিষ্ঠুর আঘাতে তছনছ হয় জনপদ, বনজঙ্গল। উত্তাল নদী আর সাগর দুঃস্বপ্নের মতো দুঃখ ছড়ায়। আবার হেমন্তের পরশ বিলিয়ে যায় মাটির সোঁদা গন্ধ। বসন্ত প্রকৃতিকে ভরে দেয় বাহারি ফুলের সৌন্দর্যে, প্রতিটি হৃদয় আন্দোলিত হয় ভালবাসায়।

বাংলাদেশের হুবহু প্রতিভু এর প্রতিটি মানুষ। এরা ভালোবাসায় অনন্য, সহৃদয়তা ও আতিথেয়তায় অতুলনীয়। কিন্তু প্রয়োজনে বৈশাখি ঝড়ের প্রচণ্ডতায় ছুটতে পারে অনায়াসে, অকাতরে উৎসর্গ করতে পারে অমূল্য জীবন। তারই প্রমাণ একাত্তরের আগ্নেয়গিরি, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধ সবার জন্য অনন্ত প্রেরণাদায়ী, প্রাতঃস্মরণীয়। তারই একটি খণ্ডচিত্র লেখার সুযোগ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়েছি একাত্তরের একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে তিনি বারবার সময় দিয়েছেন, সহিষ্ণু ছিলেন সকল প্রশ্নের মুখে। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া এ বইটি পূর্ণতা পেতো না । আমি তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ ছাড়া ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমি বিভিন্ন বইয়ের সাহায্যে নিয়েছি যেগুলোর একটি তালিকা গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ সব সূত্র থেকে নেয়া কিছু তথ্য ও ছবি বইকে সমৃদ্ধ করেছে। আর ইন্টারনেট দিয়েছে বেশুমার তথ্য ভাণ্ডার। এ ছাড়া কর্নেল মঞ্জুর মোর্শেদ (অব.) কুমিল্লা সেনানিবাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করেছেন। সাহায্য করেছেন বীর উত্তম ২/লে. শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের এককালীন অধ্যক্ষ রেজাউল ইসলাম। আমার একান্ত সুহৃদ ও সুলেখক মোহাম্মদ সা'দাত আলী ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে প্রত্যেকটি তথ্যকে বস্তুনিষ্ঠ করতে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভিন্নভাবে ছবি রিপ্রডিউস ও ইলাসট্রেশন তৈরিতে সাহায্য করেছেন লে. কর্নেল কামরুল ইসলাম। আমার শুভাকাঙ্খী আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনিস্টিটিউটের ফরেজ আলী উৎসাহী হয়ে অলঙ্করণে সাহায্য করেছেন । লাভবান হয়েছি বিজয় কেতনের সমৃদ্ধ তথ্য ভাণ্ডার থেকে। এছাড়া সৈনিক করণিক মো. মাহবুবুর রহমান নিরলসভাবে আমাকে মুদ্রাক্ষরিক সহায়তা দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

# ভূমিকা

আগুনের উত্তাপ নেই! কিংবা পতঙ্গের পাখা! তা-ও কি সম্ভব? মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসহীন বাংলাদেশ, সে কি সত্যিকারের বাংলাদেশ! গোলাপের গন্ধ আর সৌন্দর্যের মতো মুক্তিযুদ্ধ এবং এর বীরত্বগাথা মিশে আছে আমাদের অস্তিত্বের সাথে। এ এক বিরল বীরত্বগাথা যা স্মরণে উদ্বেলিত হই প্রতিদিন। অহঙ্কারী হই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, তাঁদের কথা স্মরণ করে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন হাসিমুখে। আমাদের চেতনায় ধুপের মতো নীরবে জ্বলে জ্বলে গন্ধ বিলায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, একাত্তরের ইতিহাস। হেমন্তের সন্ধ্যায় মৃদুমন্দ বাতাসে হাসনাহেনার সুগন্ধের মতো ভরিয়ে তোলে মন। এ যেন এক প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার শেষে শান্ত সমুদ্রের বুকে মেঘের কোলে উঁকি দেয়া সূর্যের ঝলমলে আলো, পথহারা নাবিকের চোখে হঠাৎ দেখা সবুজ বনভূমি। একাত্তরের স্মৃতিকথা সাহারার উত্তপ্ত নিরস বালুতে পেশল বাহুর ব্যবহারে সবুজ বিপ্লব ঘটাবার প্রেরণা জাগায় বুকে। এ জাতির জন্য একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ জনম জনম ধরে প্রেরণাদায়ী, অফুরন্ত শক্তির উৎস। শঙ্কাকুল অভিযাত্রায় অনায়াসে কাণ্ডারি হতে সাহস জোগায় বেগবান স্রোতের মতো। বঞ্চিতের পাশে দাঁড়াবার আহবান শুনি এখনো একাত্তরের নির্ঘুম দিনগুলির মাঝে। কাজেই একাত্তরের একজন যোদ্ধা যখন ডেকে বললেন... লিখবে সেই ইতিহাস, একাত্তরের? আনন্দে নেচে উঠলো বুক, শিরায় শিরায় উঠলো অভূতপূর্ব কম্পন। বুকের গভীরে অস্তিত্ব চিৎকার করে বললো... লিখে ফেল এ অনন্য ইতিহাস, সাধারণ এবং অসাধারণ ঘটনার মাঝে ফুটে উঠুক আমাদের সবার ত্যাগ, বীরত্ব আর বিজয়ের কথা। চিত্রিত হোক একাত্তরের সেইসব দিন, বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা।

শুরু হলো লেখা। এগিয়ে চললো দিনের পর দিন এবং মাস। দেখতে দেখতে ঘুরে এলো বছর। তারপর এক সময় তৈরি হলো একজন মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত **'একাত্তরে বাংলাদেশ'**।

অনিন্দ্য প্রকাশ-এর প্রথম
মাঘ ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১৮ ০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
কালার কিং
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৮ ৯৩৮৭৩১

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রুফ সংশোধন : মোহাম্মদ সা'দাত আলী

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

---

*EKATTORE BANGLADESH* by Lt. Col. Sardar Mahmud Hossain PHD
Published by Afzal Hossan Anindya Prokash
30/1ka Hemendra Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
E-mail :_anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2013
Price : Taka 400.00
US $ 20

ISBN : 978 984 414 386 9

**উৎসর্গ**

মুক্তিযুদ্ধের জানা এবং অজানা হাজারো শহীদের উদ্দেশ্যে
ওরা ছিল একদিন দুরন্ত তরুণ
দিয়ে গেল প্রাণ
বাংলার ইতিহাসে হয়ে গেল
চির অম্লান●

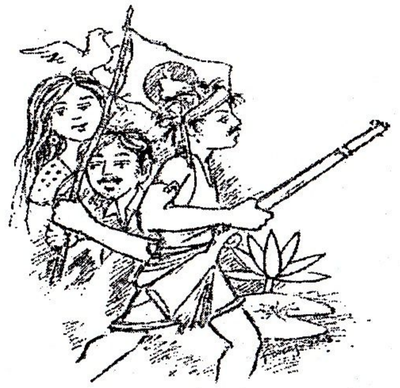
একজন মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতার আলোকে

# একাত্তরে বাংলাদেশ

লে. কর্নেল (অব.) সরদার মাহমুদ হোসেন, পিএইচডি



অনিন্দ্য প্রকাশ



দরজা খুলতেই মুক্তিযোদ্ধার হাসিমুখ দেখতে পেলাম। সহাস্যে হাত বাড়ালেন একাত্তরের তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর হাতের উত্তাপে সেদিনের উদ্যম আবারও অনুভূত হলো। বসলেন সোফায়, মুখোমুখি। বললেন-মেডিকেল কলেজ দিয়েই শুরু করি। সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লাম। স্মিত হেসে শুরু করলেন তিনি। শুরু হলো পিছনে ফিরে তাকানো, এক বর্ণিল স্মৃতিচারণ।

সত্তরের মাঝামাঝি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা নবীন ডাক্তারদের মধ্যে অফুরন্ত উদ্যম। পাঁচ বছরের সাধনার ফসল – মেডিকেল গ্রাজুয়েট হয়েছেন যারা কারুরই উৎসাহের অন্ত নেই। সামনে অপেক্ষা করছে সীমাহীন ভবিষ্যৎ। ডক্টর'স ক্যাফেতে চলে তাদের নিয়মিত আড্ডা। প্রায়ই চায়ের কাপে ঝড় তোলেন তারা কে কোন বিষয়ে ক্যারিয়ার করবেন। এক ধরনের আনন্দের জোয়ারে ভাসছেন সবাই, প্রায় সারাক্ষণ। কারো কারো মাঝে আবার সিদ্ধান্তহীনতা, র‍্যাপিড সাকসেসের চেষ্টা। হোক না পথ আরও কঠিন, সাফল্যের শিখরে ওঠার অদম্য উৎসাহ সকলের চোখে মুখে।

সে সময়কার পূর্ব পাকিস্তানে এতো ডাক্তার ছিল না। হঠাৎ করে তাদের উপর হেলথ্ সার্ভিসের নির্দেশ এলো – এ ব্যাচকে ইন্টার্নি করানো হবে না। এরা সরাসরি ডাক্তার হিসাবে জয়েন করবেন। মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনও তাদের রেজিস্ট্রেশন দিতে রাজি হলো। চিকিৎসকের অভাবে চিকিৎসা সংকট ছিল বলেই সিদ্ধান্তটা এরকম। তখন সরকার চাচ্ছেন কোনো না কোনোভাবে সংকট থেকে উত্তরণ। কিন্তু তাতে সম্মত হলেন না নবীন ডাক্তারবৃন্দ। নবীন মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের মনে দ্বিধা। ইন্টার্নি না করলে বাস্তব জ্ঞানের ঘাটতি আবশ্যম্ভাবী। আলোচনার তরঙ্গ তাই ক্রমান্বয়ে উত্তাল তুফানে পরিণত হলো, নিল কঠোর প্রতিবাদের রূপ। নবীনদের মধ্য হতে ক'জন দিলেন জ্বালাময়ী বক্তৃতা। দেখতে না দেখতে ক্যাম্পাস হয়ে উঠলো উত্তপ্ত। সবাই এক সুরে কথা বললেন। এ এক ধরনের ঐক্য, প্রয়োজনের তাকিদে। সম্ভবত ঐ বয়সে ঐক্যের বন্ধনটা গড়ে উঠে দ্রুত– ভাষায়, ভাবনায় এবং কাজে।

ওরা ডাক্তার হয়ে গেলেও হোস্টেলে আগের রুমগুলোতেই অবস্থান করছিলেন। একদিন ভোরবেলা ঘটে গেল অঘটন। প্রতিবাদী ডাক্তার বন্ধুদের পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। দু'একজন ফোন করে সেদিনের নবীন ডাক্তার আবুল হোসেনকে বললেন– তুই বাঁচলি কী করে? আসলে তখনো তিনি জানতেন না যে কখন কী ঘটে গেছে। যাদের ধরে নিয়ে গেছে তারা তখন পুলিশ কাস্টডিতে। আর যারা বাদ পড়েছেন তাদের জন্য অশনি সংকেত! কখন না আবার ধরা পড়েন! তাই ঢাকা থেকে পালানো শুরু হলো দ্রুত, যে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়, যে কোনো দিকে, যে কোনো সময়ে। হাজত বাস কারও কী আর কাম্য হতে পারে! একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাও বসে থাকলেন না। চলে গেলেন নরসিংদি, তার গ্রামের বাড়িতে।

তবে দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলো। ঢাকায় ফিরতে শুরু করলেন তারা। পুলিশ কাস্টডিতে যারা ছিলেন তাঁদেরও ছেড়ে দেয়া হলো। হাসপাতালের অবস্থা স্বাভাবিক করতে তৎকালীন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর আবদুল খালেক মুখ্য ভূমিকা পালন করলেন। তিনি যাকে সামনে পেলেন তাকেই চাকরিতে জয়েন করতে উৎসাহিত করলেন। যারা আগে আগে এলো ক্যারিয়ার মেকিং এর জন্য তাদের পছন্দের ডিসিপ্লিনে পাঠালেন তিনি। কিন্তু এ নবীন ডাক্তার ফিরলেন শেষের দিকে এবং যা হবার তা-ই হলো। তার জন্য অপেক্ষা করছিল সামান্য অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তা। ততদিনে তার পছন্দের সাবজেক্টে আর কোনো পদ খালি নেই।

প্রিন্সিপাল তাকে বললেন – You are too late. তবে হাল ছাড়লেন না। সার্জারি, মেডিসিন, আই, ইএনটিসহ প্রায় সব ডিপার্টমেন্টেই টেলিফোন করলেন। সব ডিপার্টমেন্টই না করলো। জানাল নো ভ্যাকান্সি। সব বিভাগই তখন লোকবলে পরিপূর্ণ। প্রিন্সিপাল শেষে চোখ তুলে তাকালেন ডা. আবুল হোসেনের দিকে। পরামর্শের ভঙ্গিতে তাকে বললেন – তুমি গাইনিতে জয়েন করো। প্রফেসর নুরুল হককে বলে দিচ্ছি। হোসেন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই প্রফেসর নুরুল হকের সাথে কথা বললেন প্রিন্সিপাল। বললেন– একটা ভালো ছেলে, জয়েন করতে চায়, পাঠিয়ে দিচ্ছি। হোসেনকে বললেন – তুমি যাও, জয়েন করো।

তরুণ ডাক্তার যখন প্রফেসর নুরুল হকের কাছে পৌঁছলেন তখন তার চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছে। বললেন – বস, চা খা।

মুক্তিযোদ্ধা এই পর্যায়ে এসে আবারও স্মিত হাসলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়ত নস্টালজিয়া। মনে রাখার মতো কোনো স্মৃতি ছায়া ফেলেছে মনের গহীনে। মুচকি হাসি লেপ্টে রইলো তাঁর মুখে বেশ অনেকক্ষণ। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন – মাহমুদ, শুরুটা ছিল ভালোই। তবে ধীরে ধীরে কাজের চাপ বাড়তে লাগলো। ওখানে প্রফেসর নুরুল হকের ইউনিট ছাড়াও প্রফেসর ফিরোজা



বেগম এবং প্রফেসর আবদুল ওয়াদুদ এর অধীনে আরো দু'টো গাইনোকোলজি ইউনিট ছিল। সব মিলিয়ে চব্বিশ কিংবা ছাব্বিশ জন লেডি ডক্টর। কিন্তু জুনিয়র পুরুষ ডাক্তার ছিলাম কেবল আমি একা। ধীরে ধীরে কলিগদের কেউ কেউ বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলে তাদের রাতের ডিউটি আমাকে দিতে শুরু করলেন।

আসলে কলিগ মানেই লেডি মেডিকেল অফিসার। বললেন, তার কাছে রিকোয়েস্ট বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছলো যে, I was about to break down অর্থাৎ কাজের চাপে ভেঙে পড়ার উপক্রম।

তাদের মধ্যে অবশ্য কনসিডারেটও ছিলেন কেউ কেউ। রাতের খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে করে পৌঁছে দিতেন যাতে আমায় ক্ষুধায় কষ্ট পেতে না হয়। তবে তাতে আমার কষ্টের লাঘব হলো না তেমন একটা। কারণ থাকার জায়গা সোবাহানবাগে। ওখানেই ছিল ডক্টরস হোস্টেল। হলুদ বাসে সেখান হতে আমাদের আনা নেয়া করা হতো। রাত ন'টায় ছেড়ে যেতো বাস হাসপাতাল থেকে এবং বন্ধুদের আপ্যায়ন আতিথেয়তায় আমি অবশ্যম্ভাবী মিস করতাম সেটা। শেষে ফিরতে হতো ঝুঁকি নিয়ে, স্কুটারে যদি ফেরার আদৌ কোনো সুযোগ থাকতো।

ভালো মানুষের সনাতন ইতিহাস, ভাবলাম মনে মনে।

তবে সে সব দিনগুলিতে রাস্তায় চলাচলে তেমন কোনো ঝুঁকি ছিল না। রাস্তাঘাট থাকতো ফাঁকা ফাঁকা। একমনে বলে চললেন ডাঃ হোসেন। অতদূরে যেতে ভয় ভয় লাগতো লোকজনের। যদিও কখনো কোনো হাইজ্যাকারের হাতে পড়েননি কখনো।

মনে মনে ভাবি, এদিন আর সেদিন! পার্থক্য কতো! এখন তো ট্রাফিক জ্যামের মতোই রাস্তাঘাট আগলে আছে হাইজ্যাকার। তাদের হাতে কিছু না দিতে পারলে আবার চড়, থাপড়, কিল, বেমক্কা ঘুষি কিংবা ক্ষুরের পোচ মিলে যাবে ফাও। হতে পারে পিস্তলের নল হতে বের হয়ে আসা কোন নিরেট বুলেট। শেষমেশ ঠিক করলেন তিনি সেনাবাহিনীতেই ক্যারিয়ার করবেন। তাই সুযোগ বুঝে অ্যাপ্লাই করে দিলেন একদিন। কিন্তু যে দিন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন দেখলেন তার শুভাকাঙ্ক্ষী লেডি কলিগরা ফন্দি করে অপারেশন লিস্টে তার নামে সব কেসগুলো রেখে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য মহৎ, যাতে হাসপাতালেই ব্যস্ত থাকেন তিনি।

কিন্তু একবার ডিসিশন যখন নিয়েছেন তখন ফিরবেন বলে নেন নি তিনি। ঠিক ঠিকই তিনি ফিরলেন না। আসলে ফিরবেনইবা কেমন করে – It was destined by Almighty that he becomes an army officer and a freedom fighter.

অভিজ্ঞতার চারণ ভূমিতে আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি একাত্তরের যোদ্ধার সাথে। জানালেন, তিনি যখন ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঢুকলেন এর নিরিবিলি, পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ভালো লাগলো তার। ইন্টারভিউ দিলেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায়। তখন এ হাসপাতাল ছিল একেবারে ছোট্ট কলেবরে। কিছু সাধারণ ছোটো ছোটো এবং কিছু টিনশেড বিল্ডিং মিলিয়ে। এখনকার মতো এতো বিশাল কলেবর তখন প্রয়োজনও ছিল না, কল্পনাতেও আসেনি কারও। পেশেন্টের চাপ ছিল নগণ্য। কমান্ডিং অফিসারের অফিসের সামনের বারান্দায় চাকরি প্রার্থীদের বসতে দেয়া হলো। সংখ্যায় সবাই মিলে প্রায় পঁচিশ জন। তাদের সাক্ষাতকার নিলেন সে সময়কার ডাইরেক্টর জেনারেল অব মেডিকেল সার্ভিসেস লেফটেন্যান্ট জেনারেল আইয়ুব। যারা নির্বাচিত হলেন, প্রায় সাথে সাথেই তাদের জানিয়ে দেয়া হলো ফলাফল। অনেককেই প্রশ্ন করা হলো কোথায় কে প্রথম পোস্টিং চাচ্ছে। সাক্ষাতপ্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিলেন ডা. আবদুল মান্নান। তিনি বললেন – I like to see West Pakistan.



একমনে বলে চলেছেন একাত্তরের যোদ্ধা। আমরা বিগত শতাব্দীর যে সত্তর দশকের কথা বলছি তখন চিকিৎসকদের সংখ্যা ছিল বেশ কম। এখনকার মতো এতো মেডিকেল কলেজ এবং এতো চিকিৎসকও ছিল না যে হেলথ সার্ভিসের জন্য উদ্বৃত্ত হবে। এমনকি আমি যখন ১৯৮০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হই, ইন্টার্নি করার পর পরই হেলথ সার্ভিসে নিয়োগ পেয়েছিলাম অনায়াসে। আমাদের পূর্বসূরী ডাঃ হোসেনও তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান হেলথ সার্ভিসে চাকরি পেয়েছিলেন কিন্তু জয়েন করেননি। শেষে একসময় তার অপেক্ষার পালা শেষ হলো। ডাকযোগে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলেন একদিন। জানালেন, তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন সেদিন। জয়েন করার আগে তিনি আর তার বন্ধু মঈন সেনাসদর অফিসার মেসে একজন এএমসি (আর্মি মেডিক্যাল কোর) অফিসারের সাথে দেখা করতে গেলেন। তার কাছে জানতে চাইলেন এ সার্ভিসের ভালো-মন্দ দিকগুলো, সুবিধা-অসুবিধা। মঈন তার পূর্ব পরিচিত। ভদ্রলোক ব্রিফ করলেন। সার্ভিসের ভালো-মন্দ দু'টো দিকই তুলে ধরে বললেন– জীবনটা এরকমই, কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা মিলিয়ে। তবে



পিছিয়ে গেলেন না ওরা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে লেখা ছিল "You have beeen selected. You are posted to 40 Field Ambulance Comilla Cantonment. You are directed to join as soon as possible (asp)."
ডিসিশন নিয়ে নিলেন। জয়েন করবেন কুমিল্লা সেনানিবাসে। বাড়ির কাছাকাছি বলে এক ধরনের স্বচ্ছন্দ ভাব বিরাজ করছিল তার মনে। এক সময় বললেন যে আর্মি ক্যারিয়ার করার জন্য প্রথম থেকেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেননি। অন্য দশজনার মতোই ক্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাই করেছিলেন। বরং তিনি কলআপ লেটার পেয়ে বেশ খানিকটা অবাক হয়েছিলেন।

কথা বলতে বলতে মূল প্রসঙ্গে ফিরে এলেন একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা, স্মৃতির তেপান্তরে। বললেন তার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কলিগরা ফেয়ারওয়েলের ব্যবস্থা করলেন। অনুষ্ঠানটা হলো চাইনিজ রেস্তোরাঁয়। গাইনি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর, সকল লেডি ডক্টর ছাড়াও প্রিন্সিপাল সস্ত্রীক আমন্ত্রিত হলেন সে অনুষ্ঠানে।

একাত্তরের যোদ্ধার মুখে ফুটে উঠেছে সরল একটা হাসি। স্মৃতির অতল হতে মুক্তো কুড়ানোর আনন্দ মাখানো স্বরে বললেন, তার সকল মহিলা কলিগরা এটা সেটা সেদিন উঠিয়ে দিচ্ছেন তাকে। কিছুক্ষণ দেখে দেখে প্রিন্সিপাল আবদুল খালেক প্রফেসর নুরুল হককে সখেদে বললেন – স্যার, আপনি বরং আমাকে আপনার ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার করে নিন। তাঁর কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই তারুণ্য আর প্রাণোচ্ছল হাসির ছোঁয়া ডা. হোসেনের কানেও বাজতে থাকলো অনেকক্ষণ ধরে। সেই বিদ্যাপীঠের একজন উত্তরসূরী হয়ে একদিন নতুন চাকরি, নতুন আশা, নতুন স্বপ্নের সন্ধানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মায়া আমাকেও ছাড়তে হয়েছিল। এটাই জীবন, এটাই নিয়ম। শীতের সকালে ঘাসের ডগায় তাজা টলটলে স্বচ্ছ শিশির বিন্দুর দীর্ঘ সারি। বেলা বাড়তে বাড়তে তারা নেই হয়ে যায়। যদিও ততোটা সহজ মনে হয়নি আমারও। হাসি, আনন্দ, কখনো বা ছোটোখাটো বেদনার স্মৃতিবহ দীর্ঘ ছ'টা বছর! পুরনো ফেলে আসা বিদ্যাপীঠের জন্য যেন নতুন করে আবার অদ্ভুত এক টান অনুভব করলাম।

স্মৃতি তাকে নিয়ে এলো ডিসেম্বর ১৯৭০ এ। সে দিনটা ছিল ২ ডিসেম্বর ১৯৭০। চেপে বসলেন ট্রেনে ডা. আবুল হোসেন। যাচ্ছেন কুমিলা সেনানিবাসে। এটা হবে তার নতুন কর্মস্থল। জীবনের আরেকটা অধ্যায়ের শুরু। ঢাকা ছাড়ার পর চোখ মেলে দেখলেন বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য। দেখলেন সবুজ অরণ্য আর খোলা মাঠ। দেখলেন রেললাইনের পাশ ধরে খানা-খন্দক। বেশি নিচু জায়গায় বোরো ধানের আবাদ আর ডোবায় কচুরিপানা। সাদা আর বেগুনির ছোপ ছোপ রঙে ভাসমান ফুলের মেলা। ওরা অপূর্ব, মন কাড়া সুদীর্ঘ নীলিমার নিচে শান্ত ভালোবাসার মতো। দু'টা ডাহুক হাঁটছে আপন মনে ডোবার পাশে। খেলছে

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ভালো লাগলো তার। ইন্টারভিউ দিলেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায়। তখন এ হাসপাতাল ছিল একেবারে ছোট্ট কলেবরে। কিছু সাধারণ ছোটো ছোটো এবং কিছু টিনশেড বিল্ডিং মিলিয়ে। এখনকার মতো এতো বিশাল কলেবর তখন প্রয়োজনও ছিল না, কল্পনাতেও আসেনি কারও। পেশেন্টের চাপ ছিল নগণ্য। কমান্ডিং অফিসারের অফিসের সামনের বারান্দায় চাকরি প্রার্থীদের বসতে দেয়া হলো। সংখ্যায় সবাই মিলে প্রায় পঁচিশ জন। তাদের সাক্ষাতকার নিলেন সে সময়কার ডাইরেক্টর জেনারেল অব মেডিকেল সার্ভিসেস লেফটেন্যান্ট জেনারেল আইয়ুব। যারা নির্বাচিত হলেন, প্রায় সাথে সাথেই তাদের জানিয়ে দেয়া হলো ফলাফল। অনেককেই প্রশ্ন করা হলো কোথায় কে প্রথম পোস্টিং চাচ্ছে। সাক্ষাতপ্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিলেন ডা. আবদুল মান্নান। তিনি বললেন – I like to see West Pakistan.



একমনে বলে চলেছেন একাত্তরের যোদ্ধা। আমরা বিগত শতাব্দীর যে সত্তর দশকের কথা বলছি তখন চিকিৎসকদের সংখ্যা ছিল বেশ কম। এখনকার মতো এতো মেডিকেল কলেজ এবং এতো চিকিৎসকও ছিল না যে হেলথ সার্ভিসের জন্য উদ্বৃত্ত হবে। এমনকি আমি যখন ১৯৮০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হই, ইন্টার্নি করার পর পরই হেলথ সার্ভিসে নিয়োগ পেয়েছিলাম অনায়াসে। আমাদের পূর্বসূরী ডাঃ হোসেনও তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান হেলথ সার্ভিসে চাকরি পেয়েছিলেন কিন্তু জয়েন করেননি। শেষে একসময় তার অপেক্ষার পালা শেষ হলো। ডাকযোগে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলেন একদিন। জানালেন, তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন সেদিন। জয়েন করার আগে তিনি আর তার বন্ধু মঈন সেনাসদর অফিসার মেসে একজন এএমসি (আর্মি মেডিক্যাল কোর) অফিসারের সাথে দেখা করতে গেলেন। তার কাছে জানতে চাইলেন এ সার্ভিসের ভালো-মন্দ দিকগুলো, সুবিধা-অসুবিধা। মঈন তার পূর্ব পরিচিত। ভদ্রলোক ব্রিফ করলেন। সার্ভিসের ভালো-মন্দ দু'টো দিকই তুলে ধরে বললেন– জীবনটা এরকমই, কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা মিলিয়ে। তবে



পিছিয়ে গেলেন না ওরা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে লেখা ছিল "You have beeen selected. You are posted to 40 Field Ambulance Comilla Cantonment. You are directed to join as soon as possible (asp)."
ডিসিশন নিয়ে নিলেন। জয়েন করবেন কুমিল্লা সেনানিবাসে। বাড়ির কাছাকাছি বলে এক ধরনের স্বচ্ছন্দ ভাব বিরাজ করছিল তার মনে। এক সময় বললেন যে আর্মি ক্যারিয়ার করার জন্য প্রথম থেকেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেননি। অন্য দশজনার মতোই ক্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাই করেছিলেন। বরং তিনি কলআপ লেটার পেয়ে বেশ খানিকটা অবাক হয়েছিলেন।

কথা বলতে বলতে মূল প্রসঙ্গে ফিরে এলেন একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা, স্মৃতির তেপান্তরে। বললেন তার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কলিগরা ফেয়ারওয়েলের ব্যবস্থা করলেন। অনুষ্ঠানটা হলো চাইনিজ রেস্তোরাঁয়। গাইনি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর, সকল লেডি ডক্টর ছাড়াও প্রিন্সিপাল সস্ত্রীক আমন্ত্রিত হলেন সে অনুষ্ঠানে।

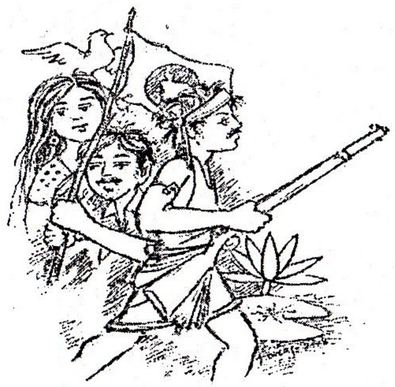
একাত্তরের যোদ্ধার মুখে ফুটে উঠেছে সরল একটা হাসি। স্মৃতির অতল হতে মুক্তো কুড়ানোর আনন্দ মাখানো স্বরে বললেন, তার সকল মহিলা কলিগরা এটা সেটা সেদিন উঠিয়ে দিচ্ছেন তাকে। কিছুক্ষণ দেখে দেখে প্রিন্সিপাল আবদুল খালেক প্রফেসর নুরুল হককে সখেদে বললেন – স্যার, আপনি বরং আমাকে আপনার ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার করে নিন। তাঁর কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই তারুণ্য আর প্রাণোচ্ছল হাসির ছোঁয়া ডা. হোসেনের কানেও বাজতে থাকলো অনেকক্ষণ ধরে। সেই বিদ্যাপীঠের একজন উত্তরসূরী হয়ে একদিন নতুন চাকরি, নতুন আশা, নতুন স্বপ্নের সন্ধানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মায়া আমাকেও ছাড়তে হয়েছিল। এটাই জীবন, এটাই নিয়ম। শীতের সকালে ঘাসের ডগায় তাজা টলটলে স্বচ্ছ শিশির বিন্দুর দীর্ঘ সারি। বেলা বাড়তে বাড়তে তারা নেই হয়ে যায়। যদিও ততোটা সহজ মনে হয়নি আমারও। হাসি, আনন্দ, কখনো বা ছোটোখাটো বেদনার স্মৃতিবহ দীর্ঘ ছ'টা বছর! পুরনো ফেলে আসা বিদ্যাপীঠের জন্য যেন নতুন করে আবার অদ্ভুত এক টান অনুভব করলাম।

স্মৃতি তাকে নিয়ে এলো ডিসেম্বর ১৯৭০ এ। সে দিনটা ছিল ২ ডিসেম্বর ১৯৭০। চেপে বসলেন ট্রেনে ডা. আবুল হোসেন। যাচ্ছেন কুমিলা সেনানিবাসে। এটা হবে তার নতুন কর্মস্থল। জীবনের আরেকটা অধ্যায়ের শুরু। ঢাকা ছাড়ার পর চোখ মেলে দেখলেন বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য। দেখলেন সবুজ অরণ্য আর খোলা মাঠ। দেখলেন রেললাইনের পাশ ধরে খানা-খন্দক। বেশি নিচু জায়গায় বোরো ধানের আবাদ আর ডোবায় কচুরিপানা। সাদা আর বেগুনির ছোপ ছোপ রঙে ভাসমান ফুলের মেলা। ওরা অপূর্ব, মন কাড়া সুদীর্ঘ নীলিমার নিচে শান্ত ভালোবাসার মতো। দু'টা ডাহুক হাঁটছে আপন মনে ডোবার পাশে। খেলছে

কতকগুলো শিশু কাদায় মাখামাখি করে অন্য পাশে। দেখে এখন আর কাউকে চেনার উপায় নেই। আকাশে পাখা মেলেছে এক ঝাঁক শঙ্খচিল। ক'টা কাক উড়ছে দূরে একটা ঝোপের উপর। গ্রাম-বাংলার অতি পরিচিত প্রিয় মুখ। বড়ো ভালো লাগছে দেখতে। জীবনানন্দের একটা কবিতা ঘুরে ফিরে বারবার মনে আসতে লাগলো :

আবার আসিবো ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে – এই বাংলায়
হয়ত মানুষ নয় – হয়ত বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ;
হয়ত ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন এ কাঁঠাল ছায়ায়

সুখের রেশ ধরে দেখতে দেখতে এক সময় তিনি পৌঁছে গেলেন কুমিল্লায়। নামলেন স্টেশনে। নিয়ম অনুযায়ী তার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ওরা স্টেশন থেকে সরাসরি নিয়ে এলো তাকে ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে। হয়ে গেলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের একজন লেফটেন্যান্ট। নাম হয়ে গেলো লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন।



কুমিল্লা সেনানিবাস নতুন অফিসারের জন্য একদম অপরিচিত জায়গা। এখানকার কিছুই জানা নেই তার। সবই নতুন নতুন, চেনা পরিবেশের বাইরে। তবে বেশ গোছানো, ছবির মতো। তখনকার ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন বদিউল আলম। কেউ একজন নবীন অফিসারকে পৌঁছে দিলো উপ-অধিনায়কের রুমে। উপ-অধিনায়ককে সেনাবাহিনীতে সংক্ষেপে বলা হয় টুআইসি অর্থাৎ সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। তিনি তেমন একটা কথাবার্তা বললেন না হোসেনের সাথে। তবে অল্পক্ষণেই অধিনায়কের সঙ্গে এ নবীন অফিসারের ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দিলেন। সৌম্য দর্শন মিষ্টভাষী অধিনায়ক সাধারণ দু'চারটি কথা জিজ্ঞেস করলেন মাত্র। নাম, বাড়ি কোথায়, কবে মেডিকেল গ্রাজুয়েট হয়েছেন ইত্যাদি। শেষে তাকে বললেন – আরো দু'একজন জয়েন করেছে। However, you can go to officers' mess today.



কুমিল্লা সেনানিবাসে শুরু হলো নতুন জীবন। অফিস থেকে তিনি চলে এলেন মেসে, নাম হানিমুন লজ। নামটার সাথে লোকেশনের মিল অনেক। একদম নিরিবিলি। সবুজের কোলে শিশুর মতো। তবে সত্যিকার হানিমুনের জন্য এ মেসটা নির্ধারিত নয়। এটা অবিবাহিত অফিসারদের মেস। একাত্তরের যোদ্ধা একসময় হাসতে হাসতে বললেন– In the honeymoon lodge without honeymoon I started my first day in army. শুরু হলো তার সামরিক জীবনের প্রথম দিন।

৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে তার দু'একদিনের মধ্যে আসলেন মঈন। এবং আরও দু'চার দিন পরে আকতার (তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, মেজর পদে অবসর নেন এবং অ্যাডভান্স টু কন্টাক্ট বইটি লেখেন)। শুধু যে ইউনিটে নবীন অফিসারদের সংখ্যা বাড়লো তাই নয়, তার রুমমেটদের সংখ্যাও বাড়লো। এরা দু'জনেই ঠাঁই নিলেন হানিমুন লজে, তাঁর রুমে। তাদের ব্লকের উল্টোদিকে ঠিক এমনি আর একটি ব্লক। ওদিকটায় তখন থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অফিসারবৃন্দ।

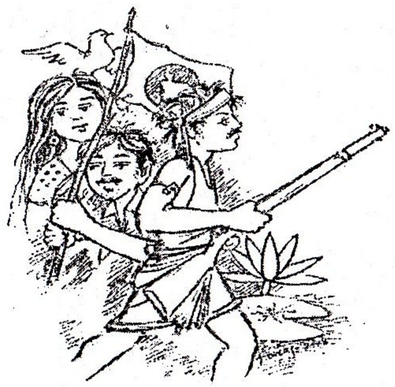
একাত্তরের লেফটেন্যান্ট আকতার সব সময়ই একটু অন্য ধরনের, অন্যদের থেকে। যেমন বাথরুমে ভিড়, তো কী হয়েছে? একটা আয়না নিয়ে লিভিংরুমের মধ্যেই শেভ করে ফেলবেন তিনি। কখনও কিউ'র ঝামেলায় যাবেন না। লেফটেন্যান্ট মঈন আবার অন্য গুণে গুণান্বিত – তিনি বেশ ধর্মভীরু। খুব ভোরে উঠেন। তার ওঠাউঠির জন্য সবার একটু জ্বালাতন হতো বইকি! যদিও মুখ ফুটে কেউ এ নিয়ে কখনো কথা বলেন নি।

কুমিল্লা সেনানিবাসের হানিমুন লজে নবীন তিন অফিসারের আর্মির জীবন শুরু হলো পুরোদমে। এরই মধ্যে ড্রেস তৈরি হয়ে গেছে তাদের। নিজেরাই র‍্যাঙ্ক পরে হাঁটা শুরু করলেন একদিন। হানিমুন লজ দিয়ে বের হয়ে ২৪ এফএফ (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) রেজিমেন্টের কোয়ার্টার গার্ডের সামনে দিয়ে ইউনিটে আসেন, হেঁটে হেঁটে। হাঁটেন লাইন ধরে, তিনজনে। কাজ কিন্তু সামান্য। এম আই রুমে রোগী দেখা। এম আই রুমকে বেসামরিক হাসপাতালের আউটডোরের সাথে তুলনা করা চলে। রোগী হয় কম। অফিস আওয়ারে রোগীর সংখ্যা গড়ে মাত্র চার কি পাঁচ জন। ওদের মধ্যে একজনে রোগী দেখেন তো বাকি সবাই মিলে আড্ডা মারে। নির্ভেজাল আনন্দময় সময় পার হয়ে যায় দেখতে দেখতে। এমআই রুমটাও দূরে নয়। অফিসের পাশেরই একটা রুম। কটাইবা ইউনিট তখনকার দিনে। একটা মাত্র ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড যার অধীনে ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া ছিল ২৪ এফএফ রেজিমেন্ট, ৪ ইস্ট বেঙ্গল, ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন, ৭১ মর্টার ব্যাটারি, ১১৭ এফআইইউ, ১৩৫ ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানি, 'এ' ফিল্ড কোম্পানি, ৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট রিয়ার, যার মেইন তখন সিলেটের খাদিম নগরে, হযরত শাহ পরানের মাজারের কাছেই।

কতকগুলো শিশু কাদায় মাখামাখি করে অন্য পাশে। দেখে এখন আর কাউকে চেনার উপায় নেই। আকাশে পাখা মেলেছে এক ঝাঁক শঙ্খচিল। ক'টা কাক উড়ছে দূরে একটা ঝোপের উপর। গ্রাম-বাংলার অতি পরিচিত প্রিয় মুখ। বড়ো ভালো লাগছে দেখতে। জীবনানন্দের একটা কবিতা ঘুরে ফিরে বারবার মনে আসতে লাগলো :

আবার আসিবো ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে – এই বাংলায়
হয়ত মানুষ নয় – হয়ত বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ;
হয়ত ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন এ কাঁঠাল ছায়ায়

সুখের রেশ ধরে দেখতে দেখতে এক সময় তিনি পৌঁছে গেলেন কুমিল্লায়। নামলেন স্টেশনে। নিয়ম অনুযায়ী তার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ওরা স্টেশন থেকে সরাসরি নিয়ে এলো তাকে ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে। হয়ে গেলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের একজন লেফটেন্যান্ট। নাম হয়ে গেলো লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন।



কুমিল্লা সেনানিবাস নতুন অফিসারের জন্য একদম অপরিচিত জায়গা। এখানকার কিছুই জানা নেই তার। সবই নতুন নতুন, চেনা পরিবেশের বাইরে। তবে বেশ গোছানো, ছবির মতো। তখনকার ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের উপ-অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন বদিউল আলম। কেউ একজন নবীন অফিসারকে পৌঁছে দিলো উপ-অধিনায়কের রুমে। উপ-অধিনায়ককে সেনাবাহিনীতে সংক্ষেপে বলা হয় টুআইসি অর্থাৎ সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। তিনি তেমন একটা কথাবার্তা বললেন না হোসেনের সাথে। তবে অল্পক্ষণেই অধিনায়কের সঙ্গে এ নবীন অফিসারের ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দিলেন। সৌম্য দর্শন মিষ্টভাষী অধিনায়ক সাধারণ দু'চারটি কথা জিজ্ঞেস করলেন মাত্র। নাম, বাড়ি কোথায়, কবে মেডিকেল গ্রাজুয়েট হয়েছেন ইত্যাদি। শেষে তাকে বললেন – আরো দু'একজন জয়েন করেছে। However, you can go to officers' mess today.



কুমিল্লা সেনানিবাসে শুরু হলো নতুন জীবন। অফিস থেকে তিনি চলে এলেন মেসে, নাম হানিমুন লজ। নামটার সাথে লোকেশনের মিল অনেক। একদম নিরিবিলি। সবুজের কোলে শিশুর মতো। তবে সত্যিকার হানিমুনের জন্য এ মেসটা নির্ধারিত নয়। এটা অবিবাহিত অফিসারদের মেস। একাত্তরের যোদ্ধা একসময় হাসতে হাসতে বললেন– In the honeymoon lodge without honeymoon I started my first day in army. শুরু হলো তার সামরিক জীবনের প্রথম দিন।

৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে তার দু'একদিনের মধ্যে আসলেন মঈন। এবং আরও দু'চার দিন পরে আকতার (তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, মেজর পদে অবসর নেন এবং অ্যাডভান্স টু কন্টাক্ট বইটি লেখেন)। শুধু যে ইউনিটে নবীন অফিসারদের সংখ্যা বাড়লো তাই নয়, তার রুমমেটদের সংখ্যাও বাড়লো। এরা দু'জনেই ঠাঁই নিলেন হানিমুন লজে, তাঁর রুমে। তাদের ব্লকের উল্টোদিকে ঠিক এমনি আর একটি ব্লক। ওদিকটায় তখন থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অফিসারবৃন্দ।

একাত্তরের লেফটেন্যান্ট আকতার সব সময়ই একটু অন্য ধরনের, অন্যদের থেকে। যেমন বাথরুমে ভিড়, তো কী হয়েছে? একটা আয়না নিয়ে লিভিংরুমের মধ্যেই শেভ করে ফেলবেন তিনি। কখনও কিউ'র ঝামেলায় যাবেন না। লেফটেন্যান্ট মঈন আবার অন্য গুণে গুণান্বিত – তিনি বেশ ধর্মভীরু। খুব ভোরে উঠেন। তার ওঠাউঠির জন্য সবার একটু জ্বালাতন হতো বইকি! যদিও মুখ ফুটে কেউ এ নিয়ে কখনো কথা বলেন নি।

কুমিল্লা সেনানিবাসের হানিমুন লজে নবীন তিন অফিসারের আর্মির জীবন শুরু হলো পুরোদমে। এরই মধ্যে ড্রেস তৈরি হয়ে গেছে তাদের। নিজেরাই র‍্যাঙ্ক পরে হাঁটা শুরু করলেন একদিন। হানিমুন লজ দিয়ে বের হয়ে ২৪ এফএফ (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) রেজিমেন্টের কোয়ার্টার গার্ডের সামনে দিয়ে ইউনিটে আসেন, হেঁটে হেঁটে। হাঁটেন লাইন ধরে, তিনজনে। কাজ কিন্তু সামান্য। এম আই রুমে রোগী দেখা। এম আই রুমকে বেসামরিক হাসপাতালের আউটডোরের সাথে তুলনা করা চলে। রোগী হয় কম। অফিস আওয়ারে রোগীর সংখ্যা গড়ে মাত্র চার কি পাঁচ জন। ওদের মধ্যে একজনে রোগী দেখেন তো বাকি সবাই মিলে আড্ডা মারে। নির্ভেজাল আনন্দময় সময় পার হয়ে যায় দেখতে দেখতে। এমআই রুমটাও দূরে নয়। অফিসের পাশেরই একটা রুম। কটাইবা ইউনিট তখনকার দিনে। একটা মাত্র ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড যার অধীনে ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া ছিল ২৪ এফএফ রেজিমেন্ট, ৪ ইস্ট বেঙ্গল, ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন, ৭১ মর্টার ব্যাটারি, ১১৭ এফআইইউ, ১৩৫ ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানি, 'এ' ফিল্ড কোম্পানি, ৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট রিয়ার, যার মেইন তখন সিলেটের খাদিম নগরে, হযরত শাহ পরানের মাজারের কাছেই।

একদিন ছোটো একটা কুইজ হলো। সেনাবাহিনীর জীবনে এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরের বন্ধনহীন জীবন থেকে কঠোর শৃংখলার পরিবর্তনের পর্যায় অস্বস্তিকর লাগতে পারে। তিন রুমমেট যখন হাঁটতেন, হাঁটতেন ক্যাজুয়ালি। এক এক সময় এক একজন ডানে কিংবা বামে থাকতেন। নিয়ম অনুযায়ী এদের মধ্যে যিনি চাকরিতে জ্যেষ্ঠ তিনি ডানে থাকবেন এবং তিনিই স্যালুটের রিপাই দেবেন। ওরা যাওয়া আসার পথে পার হন ২৪ এফএফ এর কোয়ার্টার গার্ড। একদিন ঐ রেজিমেন্টের একজন ক্যাপ্টেন তাদের ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন – Who is the senior most amongst you? হোসেন জয়েন করার সুবাদে সিনিয়র। ন্যাচারালি তিনিই উত্তর দিলেন। তখন সে ক্যাপ্টেন মৃদু ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বললেন – তা হলে তোমারই উচিৎ স্যালুটের রিপ্লাই দেয়া। নিয়ম তো সেটাই বলে। জবাবে সেদিনের নবীন অফিসার বললেন – We are in the learning phase. However, I will take care of this.

হোসেন আর্মিতে জয়েন করার ক'দিন পরে একটা কাজে ঢাকায় আসেন, ডিসেম্বরেই। ঠিক সাধারণ নির্বাচনের আগের দিন। ভোট দেয়ার জন্য এক ধরনের ব্যাকুলতা তার মনে। ব্যক্তিগত কাজ সেরে ভোটের দিন ৭ ডিসেম্বর হাজির হলেন জিওগ্রাফি বিল্ডিং এর সামনে, ঢাকা ভার্সিটি'র। ওটাই তাদের ভোট কেন্দ্র। দেখলেন দীর্ঘ লাইন। ভোট শেষ করে কুমিল্লায় ফেরা কষ্টকর হবে। দু'একজন বন্ধুকে জানালেন সমস্যাটা। বললেন তিনি সেনানিবাসে ফিরতে চান বেলা থাকতে থাকতে। আবার ভোটও দিতে চান। তার বন্ধুরা শুনে মহা খুশি। তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে গেলেন পোলিং বুথের ভিতর। ভোট দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট ফিরে এলেন কুমিল্লায়, নিজ কর্মক্ষেত্রে, সেনানিবাসের স্বল্প পরিসর গণ্ডির ভিতর।

দেখতে দেখতে একদিন টেমপরারি ডিউটি চলে এলো। ২৪ এফএফ রেজিমেন্টের মেডিকেল কভার। ওরা যাবে হাটহাজারি ফায়ারিং রেঞ্জে। যাবে পায়ে হেঁটে, কুমিলা থেকে চট্টগ্রাম। শুরু হলো দীর্ঘ পদযাত্রা। প্রায় তিন দিন হাঁটার পরে তারা হাটহাজারি পৌঁছলেন। প্রথম দিন এ দলের যাত্রা বিরতি ছিল চৌদ্দগ্রামে। আর বাকি দিনের কথা তিনি মনে করতে পারলেন না। স্মৃতির পাতা কিছুক্ষণ ব্যাকুল হয়ে খুঁজলেন তিনি। পরে হাল ছেড়ে দিলেন এক সময়।

বললেন তখন ইয়াং ছিলেন, হাঁটলেন। তবে পুরো পথ তাকে হাঁটতে হয়নি। কখনো কখনো অ্যাম্বুলেন্সও ব্যবহার করেছেন তিনি। আসলে তার হাঁটারই কথা নয়। অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাপুর এ ব্যাপারে লিবারেলও ছিলেন। তিনি চাননি তাদের ডাক্তার হাঁটুন। তবে কোনো কোনো অফিসার তাকে বলল - We are on the move, join us.

ফায়ারিং শেষে অবশ্য তারা সবাই কনভয় করেই ফেরত আসেন কুমিলায়। এটা সম্ভবত জানুয়ারির শেষদিকের ঘটনা।



সাধারণ নির্বাচনে কিন্তু ঘটে গেছে বৈপ্লবিক বিজয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ একমাত্র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে পশ্চিম অংশে পিপিপি'র প্রাধান্য বজায় রইলো।

হাটহাজারি থেকে ফেরার পর সেনানিবাসের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন সবাই। খাবার ব্যবস্থা ২৪ এফএফ রেজিমেন্ট পরিচালিত অফিসার মেসে। রিক্রিয়েশনের জন্য আছে একটা মাত্র টেলিভিশন, থাকে মেস সেক্রেটারির নিয়ন্ত্রণে। সময় কাটাবার জন্যে মাঝে মাঝে সবাই মিলে আড্ডা মারেন, খোশ গল্প করেন। আকতার আবার তাসে ওস্তাদ। আর গল্প এন্তার, চলে হরহামেশা। শুধু ঘুমাবার আগে তারা ফিরে আসেন হানিমুন লজে। না ফিরতে পারলেই যেন ভাল হতো। কিন্তু তাতো হবার নয়। ঘুম প্রয়োজন, স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের জন্যই। আর খাবার ঘর কিংবা ইউনিটে ঘুমাবার সুযোগ নেই। তা না হলে হয়ত ও কাজটিও সেখানেই সারতেন সবাই মিলে।

একাত্তরের ফেব্রুয়ারি। তখন পরিবেশ ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ। টেলিভিশন প্রোগ্রামে আর্টিস্টরা কালো ব্যাজ ধারণ করে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন। সেবারে একুশে ফেব্রুয়ারি আসার আগেই চারদিকে সাজ সাজ রব। চলনে বলনে সবার স্বতঃস্ফূর্ততা। আসলে আমাদের জীবনের অনন্য এ দিনটি জাতির অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। ভাবতেও কেমন গা আনন্দে উদ্বেলিত হয়। কবে যেন আমরা এ দিনটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি জানতেও পারিনি। অনুভব করিনি, ব্যাপারটা ঘটেছে মনের অজান্তে। যেভাবে শিরায় শিরায় প্রবাহিত উত্তপ্ত রক্তের স্রোত, না হলে প্রাণ বাঁচে না, অথচ দেখিনা, প্রায় সেভাবেই। একাত্তরের ফেব্রুয়ারির কথা মনে পড়লে সবার রক্তেই চলে আসে সত্তরের জ্বলোচ্ছ্বাসের বেগ। মনে পড়ে অলিতে গলিতে শুনছি নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতার ভরাট কণ্ঠে আবৃত্তি :

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত ?

এমনভাবে সাজ সাজ ভাব। যেন যুদ্ধ চলছে সেদিনের বাংলাদেশে। সত্যি বলতে কী, পুরো বাংলাদেশী জাতিসত্তা মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে একুশের চেতনা আর চিরন্ময়তার সাথে। সবার হৃদয়ে উত্তাল হয়ে ওঠা দেশপ্রেমের ছোঁয়া। সবাই যেন কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আবেশে বিভোর হয়ে বলছে 'ফুলে ও ফসলে কাদামাটি জলে ঝলমল করে অবনি - হেরিনু পল্লি জননী'।

একদিন নবীন অফিসারবৃন্দ মেসে বসে টেলিভিশন দেখছিলেন। একজন পাকিস্তানি অফিসার তাদের জিজ্ঞেস করলেন – What is that black thing on the chest of the artists?

উক্ত অফিসার ২৪ এফ এফ রেজিমেন্টের। এ তিন জন নবীন অফিসারের একজন জবাবে বললেন– They are putting it as a rememberence of the martyrs of the language movement.

সেই অফিসার জবাবে বললো – If I get a chance, I will shoot at that point.

কী অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্য ভরা সে জবাব। কিন্তু গালভরা জবাবও পেলো সে সাথে সাথে। এদের মধ্য হতে একাত্তরের লেফটেন্যান্ট আকতার মুখের উপর কড়া জবাব দিলেন – Probably, you will not get that chance.

উক্ত অফিসার এর জবাব না দিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু লেফটেন্যান্ট আকতারের জবাবে বাঙালি অফিসার সবাই খুশি। দাঁত ভাঙা জবাব বটে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে কী চলে!

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এখানে কিছু বলা দরকার। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা। অথচ পাকিস্তানের ৬৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার ৪৪ মিলিয়নই ছিল বাংলা ভাষাভাষী। ১৯৪৭ সালে করাচিতে জাতীয় শিক্ষা সভায় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এবং বিদ্যালয়সমূহে এ ভাষার ব্যবহারের জন্য সুপারিশ রাখা হয়।

তখনই এ সুপারিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে জাগ্রত প্রতিবাদী কণ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আবুল কাসেমের নেতৃত্বে এর প্রতিবাদে একটা রেলি বের করে। আবুল কাসেম তখন তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারি। সেখানে তারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের দাবি জানান।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এবং সুশীল সমাজ বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ ও লেখক-রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমেদ বললেন যে যদি রাষ্ট্রভাষা উর্দু হয় তা হলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী 'অশিক্ষিত' এবং 'অনুপযুক্ত' হয়ে যাবে সরকারি বিভিন্ন কর্মপরিসরে। দেখতে দেখতে ডিসেম্বরের শেষের দিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো।

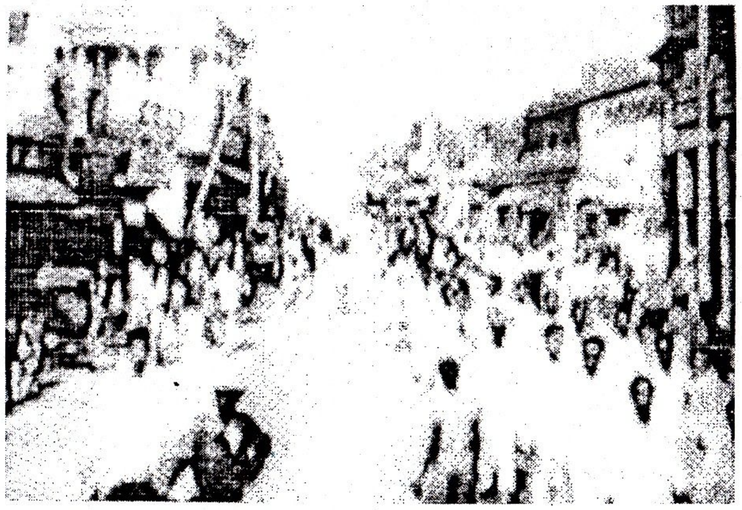
১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরের অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা হরতাল পালন করেন। রাষ্ট্রভাষা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়ার জন্য এটা প্রথম বড় ধরনের প্রতিবাদ। মিছিল চলার সময় শামসুল হক, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল ওয়াহেদ এবং অন্যান্যরা গ্রেফতার হন। রেলির নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা একজন পুলিশ অফিসারের রাইফেল ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টার সময় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ছাত্রনেতা আবদুল মতিন এবং আব্দুল মালেক উকিল অংশ গ্রহণ করেন এ মিছিলে।



ঐ দিন বিকালে পুলিশি গ্রেফতার এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। একদল ছাত্র প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বাসার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে ঢাকা হাইকোর্টের সামনে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। এর পরবর্তীতে ১২ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটানা হরতাল চলে ঢাকায়।

অবস্থা দেখে গভর্নর জেনারেল মোহম্মদ আলী জিন্নাহ এলেন ঢাকায়। একুশে মার্চ রেসকোর্সের গণসংবর্ধনায় তিনি ঘোষণা করলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দু মুসলিম জাতি গোষ্ঠীর ঐতিহ্যকে লালন করে এবং উর্দুই রাষ্ট্রভাষা থাকবে। জিন্নাহ আরো একটু বেশি বলে ফেললেন : যারা তার মতের সাথে ভিন্নতা পোষণ করেন তারা পাকিস্তানের শত্রু। জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে একই কথা বললেন ২৪ মার্চে।

এর পর পরই শুরু হয়ে গেলো হট্টগোল। জিন্নাহর বক্তৃতার মধ্যে শ্রোতাদের একটা বড় অংশ প্রতিবাদ করলেন। ২৮ মার্চে ঢাকা ছাড়ার আগে এক রেডিও বক্তৃতায় জিন্নাহ একই বক্তব্য আউড়ে গেলেন আবারও। এ যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়া।



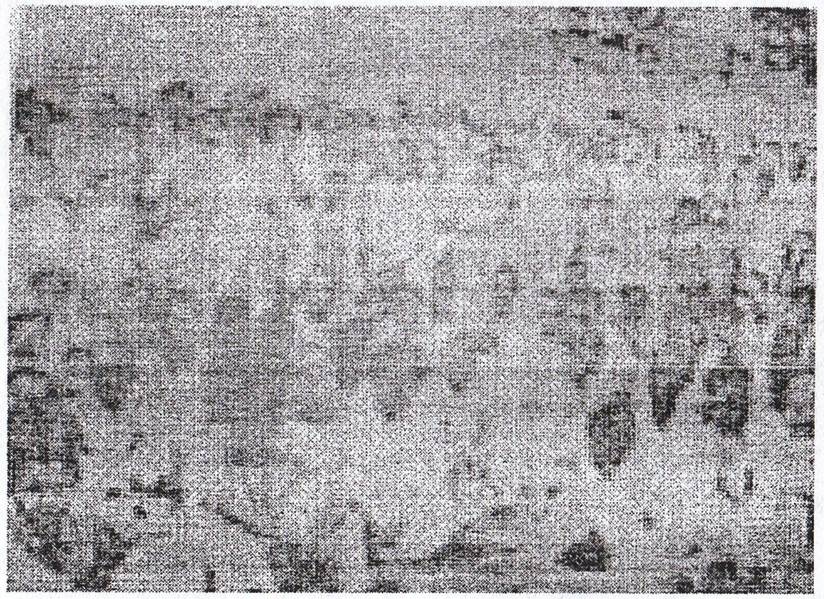
উত্তাল বায়ান্নর ৪ ফেব্রুয়ারি - বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবির পক্ষে নওয়াবপুর রোডে জনতার মিছিল

১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা পর্যন্ত আন্দোলন যেন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। জিন্নাহর পরে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে খাজা নাজিমউদ্দিন পুনরায় ভাষার ব্যাপারে একমাত্র উর্দু (Urdu Only) নীতির কথা ঘোষণা করলেন ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫২-এর বক্তৃতায়। ফলে ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠিত হলো। স্থান হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার লাইব্রেরি হলো। সভা হলো

সেখানেই। এ মিটিংএ সভাপতিত্ব করেন সবার শ্রদ্ধেয় মাওলানা ভাসানী। তৎকালীন অ্যাকশন কমিটি সর্বাত্মক হরতালের ডাক দিল ২১ ফেব্রুয়ারি ।

এরই মধ্যে বাংলাকে আরবি হরফে লেখার প্রস্তাবনাও আসে সরকারের তরফ হতে। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়াও অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। সেখানে তারা আরবি হরফে বাংলা লেখার সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি জানায়। যখন এ দাবির পক্ষে মিছিলের প্রস্তাব চলছিল তখন সরকার শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

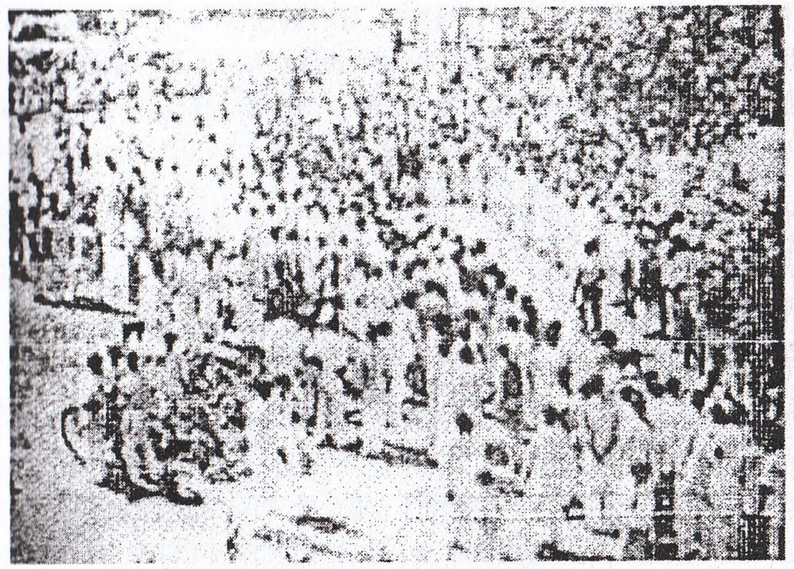
বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির কথা খানিকটা আরও বিশদ আকারে বলা দরকার। কারণ যে দিন জিন্নাহ 'একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা' হবে বলে ভাবলেন সেদিনই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন তিনি। যা কালের আবর্তে কেবল বড়ো হয়েছে। আর একুশে ফেব্রুয়ারি যেন ক্ষমাহীন এক দেয়াল তুলে দেয় পূর্ব ও পশ্চিমকে বিভক্ত করে। সে দেয়ালের ভিত কেবল শক্তই হয়েছে কালের পরিক্রমায়।



ভাষার দাবিতে ওরা অবিচল - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ এর সভা

সেদিন ভোর ন'টা থেকেই ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জমা হতে থাকে। অবস্থার নিরিখে উপাচার্যসহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত হলেন সেখানে। যখন বেলা সোয়া এগারোটা তখন ছাত্ররা ভার্সিটি গেট ক্রস করে ১৪৪ ধারা ভাঙার চেষ্টা করে। এদের থামাতে মোতায়েনকৃত আর্মড পুলিশ টিয়ার





রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়
প্রতিবাদী ছাত্র জনতার মিছিল, ভাঙলেন ওরা ১৪৪ ধারা

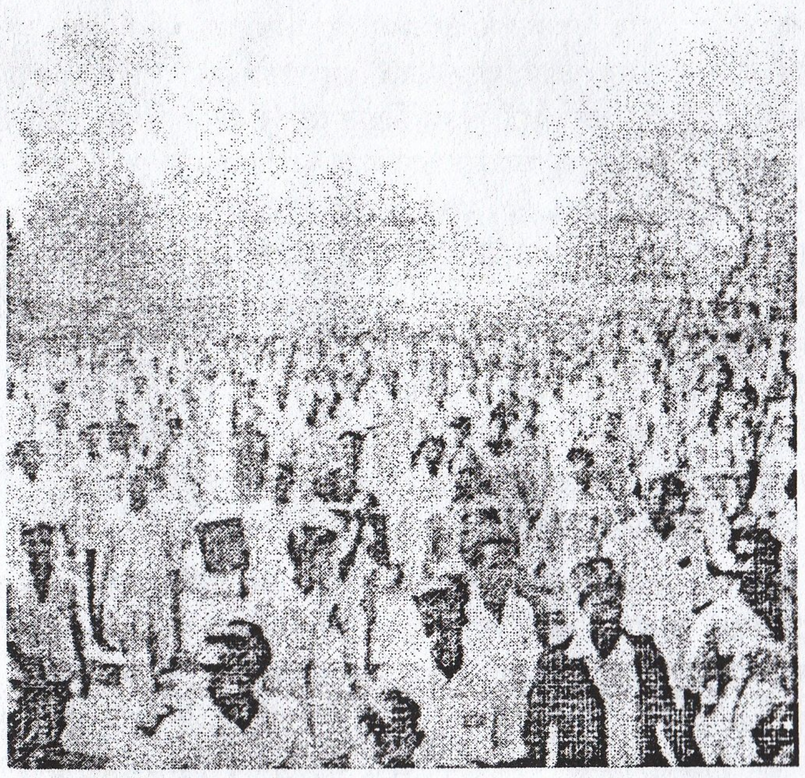
শেল ছোড়ে। সেদিনের প্রতিবাদী ছাত্রদের জন্য এটা ছিল কেবল সতর্কবার্তা। তখন একদল ছাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজে দৌড়ে ঢুকে যায়। আর বাকিরা পুলিশ বেষ্টনির মাঝে ক্যাম্পাসে প্রসেশন করে। ছাত্ররা মিছিল শেষ করে যখন ফেরার উদ্যোগ নেয় তখন অনেককেই গ্রেফতার করে পুলিশ। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং পূর্ব বাংলা বিধানসভা ব্যবস্থা পরিষদ (East Bengal Legislative Assembly) ভবনের চারদিকে জমা হতে থাকে। তারা সেখানে বিধান কর্মকর্তার (Legislator) রাস্তা অবরুদ্ধ করে রাখে। তাদের দাবি একটাই, তারা পরিষদে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে চায়। এখানে উলেখ্য যে তখন বিধানসভার কার্যক্রম চলছিল। যখন একদল ছাত্র জোর করে পরিষদ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করে তখনই বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করে পুলিশ। রক্ত ঝরলো বাঙালির। শহীদ হলেন আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবুল বরকত এবং আবদুল জব্বারসহ আরো অনেকে। মাতৃভাষার আন্দোলনে জীবন বিসর্জন দিয়ে ওরা আমাদের স্মৃতিতে এবং বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। তাঁরা হয়ে গেলেন আমাদের আন্দোলনের অফুরন্ত উৎস।

দুঃসংবাদ দ্রুত ধায়। কথাটা সত্য। গুলি এবং শহীদ হবার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার সর্বত্র। সাথে সাথে দোকান-পাট, অফিস এবং সরকারি যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অসন্তোষ ছড়ায় দ্রুত, শহরের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। তখন পরিষদ ভবনে ক'জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যেমন মনোরঞ্জন ধর, বসন্ত কুমার দাস, শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ মোট ছ'জন বিধান কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনকে আহত ছাত্রদের হাসপাতালে দেখতে যেতে অনুরোধ করেন। ছাত্র শহীদ হবার ঘটনায় শোক হিসেবে তারা পরিষদের

কার্যক্রম বন্ধ করারও অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রিকে। এ প্রস্তাবনা একবাক্যে সমর্থন করেন মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, সরফুদ্দিন আহমেদ, শামসুদ্দিন আহমেদ খন্দকার ও মসিহউদ্দিন আহমেদ। কিন্তু নুরুল আমিন একগুয়ের মতো তাদের প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করে দিলেন।

বাইশে ফেব্রুয়ারি অবস্থার আরো অবনতি হলো। একটা বড়ো মিছিল ১৪৪ ধারা ভাঙলো ঢাকায়। তিরিশ হাজারেরও অধিক ছাত্র-জনতা কার্জন হলের সম্মুখে জমায়েত হলো। পুলিশ আবারও ফায়ার করলো ছাত্র ও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে। শহীদ হলেন আরো চারজন। ফলে আন্দোলন হলো আরো বেগবান। বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন কলেজ, ব্যাংক, রেডিও স্টেশনের কর্মকর্তা ও করণিকরাও আন্দোলনে যোগ দিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

জনতার রুদ্র রোষে পুড়ল জুবিলি প্রেস ও মর্নিং নিউজের কার্যালয়। পুলিশ আবারো ফায়ার ওপেন করলো। তবে এবার আবেগপ্রবণ বাঙালির সরাসরি হৃদপিণ্ডে। ফায়ার করলো ওদের শোক মিছিলে যখন নওয়াবপুর রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছিলো ওরা। এ গোলাগুলি প্রাণ কেড়ে নিল অনেকেরই। যাদের মধ্যে সফিউর রহমান এবং অহিউলাহ ছিলেন। অহিউলাহর বয়স তখন মাত্র ন'বছর।



যে কোনো মূল্যে ভাষার মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে - শহীদদের জানাজার পর ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ এর ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল।

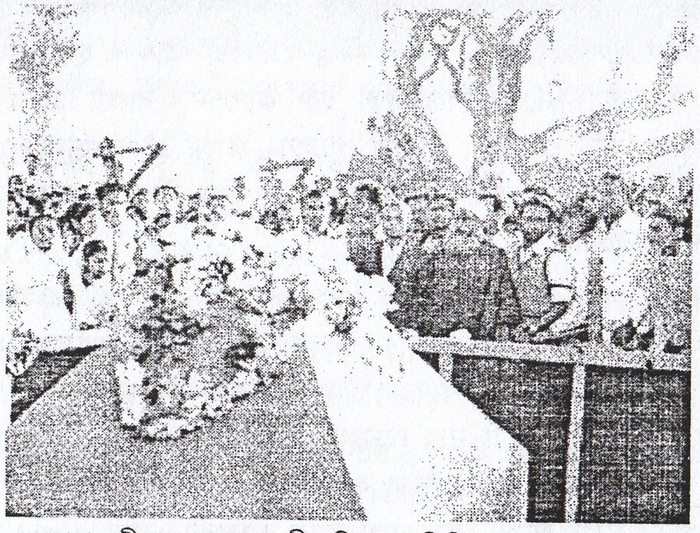


ভাষা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ২৩ ফেব্রুয়ারির রাত থেকে শুরু করে ২৪ ফেব্রুয়ারির ভোর নাগাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দ গড়ে তুললেন শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। এ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন শহীদ সফিউর রহমানের পিতা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশের সহায়তায় ভেঙে ফেলে সে স্তম্ভ। কিন্তু ওরা তখনো জানে না মায়ের ভাষার স্মরণে সে স্মৃতিস্তম্ভ ততোদিনে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। সাথে সাথে আয়োজন হলো প্রতিবাদের। ২৯ তারিখের প্রতিবাদে অংশ গ্রহণকারীদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে পুলিশ।

সরকার তখন খবরের উপর আরোপ করলো নিয়ন্ত্রণ। কাজেই আহতের সঠিক প্রতিবাদকে প্রকাশ করা গেলো না। কিন্তু সরকারের অনুগত সংবাদ মাধ্যম ঘটনাকে হিন্দু এবং সমাজতন্ত্রীদের উস্কানির ফসল বলে প্রতিপন্ন করতে চাইল। আবুল বরকত এবং রফিকউদ্দিন আহমেদের পরিবারবর্গ পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনার চেষ্টা করলেও তারা সফল হলেন না। কারণ পুলিশ কেস নিল না। ৮ এপ্রিলের সরকারি রিপোর্টে পুলিশি গোলাগুলির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলো। ১৪ এপ্রিলে সংবিধান সভার বৈঠক বসে। তখন কিছু সদস্য বাংলা ভাষার বিষয়টি আলোচনায় আনতে চাইলে মুসলিম লীগের বাধার মুখে তা স্থগিত হয়ে যায়।

এপ্রিলের ১৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হলো। 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ' ২৭ এপ্রিল বার এসোসিয়েশন হলে একটি সেমিনার আয়োজন করে। ঐ সেমিনারে বক্তারা সরকারকে বন্দি-মুক্তি, বেসামরিক লোকজনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের আহবান জানান।

ভাষা আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলো। নতুন করে শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন শহীদ বরকতের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ আওয়ামী লীগের সমর্থন পুষ্ট হয়ে



ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন আবুল বরকতের পরিবারের সদস্যবৃন্দ

২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিন ওরা সম্মান জানাবে ভাষা শহীদদের। প্রথমে বার্ষিকী উদযাপন করতে যেয়ে শোকের চিহ্ন হিসেবে ওরা বুকে ধারণ করলো কালো ব্যাজ। বেশির ভাগ অফিস, ব্যাংক, স্কুল ও কলেজসমূহ বন্ধ রইলো এদিন। সভায় প্রায় এক লক্ষ লোক সমেত হলেন আরমানিটোলায়। সেখানে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অন্যান্য বন্দিমুক্তির দাবি করা হলো।

কিন্তু রাজনীতিবিদ ফজলুর রহমান বললেন যে, যারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান তারা দেশের শত্রু। এ কথায় আবারও ছড়িয়ে পড়লো উত্তেজনা। কাজেই যখন সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো ছাত্র-জনতা পুনরায় তা উপেক্ষা করলো নির্ভয়ে। ১৯৫৪ এর একুশের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে উড়লো কালো পতাকা। দলে দলে ওরা ভাগ হয়ে নামল মিছিলে। মিছিল থেকে পুলিশ আবারও গ্রেফতার করলো আন্দোলনরত ছাত্র-জনতাকে এবং পরে ছেড়ে দিল। যদিও ছাত্ররা সেদিন স্বেচ্ছা কারাবরণের জন্য তৈরি ছিল।

১৯৫৪ তে বেশ ক'টি উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা ঘটে। যেমন ৭ মে পূর্ব পাকিস্তানের সংবিধান পরিষদ বিক্ষুব্ধ হয়। তখন ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নিন্দা জ্ঞাপন করে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট এ প্রদেশের জন্য সঙ্গত কারণেই স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। বগুড়ার মুহম্মদ আলী তখন এদেশের প্রধানমন্ত্রী। মুসলীম লীগের সংসদ সদস্যদের নিয়ে তিনি যে মিটিং করলেন তাতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদার কথা তিনি বাতিল করে দিলেন। ফলে দেশময় ছড়িয়ে পড়লো অস্থিরতা। এ সময় পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের ভাষাভাষীরাও তাদের আঞ্চলিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে সোচ্চার হয়ে উঠে। কিন্তু মৌলভী আব্দুল হক ভাষার ব্যাপারে মুসলিম লীগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা শুরু করলেন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে তিনি এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তখন এমন গণজাগরণ শুরু হলো যে যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ব্যাপকভাবে হারিয়ে বিজয় লাভ করলো।

যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা গ্রহণের পর এক আদেশ বলে প্রতিষ্ঠা করলো বাংলা একাডেমী। উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার উন্নয়ন এবং নিজস্ব সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে লালন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট বেশি সময়ের জন্য স্থায়িত্ব পেলো না। পেশল বাহুর ধাক্কায় কিছুদিন পর এ সরকার ছিটকে পড়লো। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহম্মদ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে দিয়ে তার শাসন জারি করলেন। যখন গভর্নর জেনারেলের শাসন শেষ হলো তখন যুক্তফ্রন্ট ৬ জুন, ১৯৫৫ সালে আবার মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে। এ সরকারে যোগদান থেকে বিরত থাকে আওয়ামী লীগ।



যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করলো ১৯৫৬ সালে। তখন বাঙালির মনে প্রশান্তি, পিছনে লেলিয়ে দেয়া পুলিশের ভয় নেই।

তখনকার সরকার নতুন শহীদ মিনার গড়ার জন্য প্রকল্প হাতে নেয়। সংসদের অধিবেশন বসলে সাংসদরা পাঁচ মিনিটের জন্য কার্যক্রম স্থগিত করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতৃবৃন্দ বেশ বড়ো করে মিছিল ও সভার আয়োজন করেন। সাথে সাথে সকল সরকারি অফিস এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম ভাষা শহীদদের প্রতি শোক জানাতে বন্ধ থাকে। শেষমেষ অনেক বন্ধুর পথ পরিক্রমার পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ২৯ ফেব্রুয়ারি,

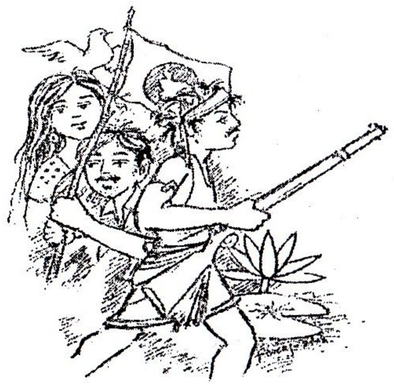


ওরা চিরঞ্জীব - ভাষা শহীদদের স্মরণে গড়ে উঠে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

১৯৫৬ বাংলা ভাষাকে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করে। তারা শাসনতন্ত্রের আর্টিকেল ২১৪(১)-কে নিম্নরূপভাবে সংশোধন করে : "The state Language of Pakistan shall be Urdu and Bengali".

যদিও আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের পর আবার উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন দেশের একক ভাষা হিসেবে কিন্তু ৬ জানুয়ারি, ১৯৫৯ সালের আদেশ বলে তিনি আবার দুই ভাষার রাষ্ট্রনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ভাষার মর্যাদার লড়াই এগিয়েছে। অনেক জানা এবং অজানা পরমাত্মীয়রা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন সে আন্দোলনে। সেই ভাষার অবমাননা কোনো বাঙালি মেনে নেবে না।



আইয়ুব ক্লাব। যে ক্লাবে কুমিল্লা সেনানিবাসের নতুন বাঙালি অফিসারবৃন্দ টিভি দেখতেন এবং সময় কাটাতেন সেটারই নাম। এন্টিরুমে একটা মাত্র টেলিভিশন। সেনানিবাস এবং বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। বাইরের হালচালের একমাত্র যোগসূত্র। এরপর যা হলো তা অবশ্য আশা করেনি কেউ। পরের দিন যথারীতি এরা তিনজন এলেন টিভি দেখতে। অবাক হয়ে দেখলেন টিভিটা তালা বন্ধ। মেসে একজন এনসিও ইনচার্জ থাকে, যাকে বলা হয় মেস হাওয়ালদার। বর্তমানে বলা হয় মেস সার্জেন্ট। নাম মনে নেই ওদের। তিন বন্ধুর একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন – ইসকা চাবি কী ধার হায়? মেস হাওয়ালদারের সাফ জবাব – মালুম নেহি, মেস সেক্রেটারি লেগিয়া।

মেস সেক্রেটারি ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের অফিসার। তাকে রুমে পাওয়া গেলো না। তাদের এই ছোট্ট ক্রাইসিসের সময় বাঙালি আর্টিলারি অফিসার ক্যাপ্টেন নুরুন্নবী তার ভেসপায় বিকট আওয়াজ তুলে হাজির। না চাইতেই যেন তৃষ্ণার্ত চাতকের মুখে পানি। সমস্যা দেখে গম্ভীর হলেন তিনি। লেফটেন্যান্ট আকতারকে তুললেন তাঁর বিখ্যাত বাহনে। চললেন শহরের দিকে।

যদিও ঐ সময় শহরে যাওয়া বারণ কিন্তু ওরা তার তোয়াক্কা করলেন না। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন এক গোছা চাবি নিয়ে। ভাবটা এমন, হয় এসপার নয় ওসপার।

শেষপর্যন্ত অপারেশন সাকসেসফুল। টেলিভিশনের বন্ধ দরজা খুলে দেয়া হলো। বাটন চাপতেই পর্দায় ভেসে উঠলো সাদা কালো ছবি। দিনের স্বাভাবিক প্রোগ্রাম চলছে। কিন্তু কোত্থেকে যমদূতের মতো এসে হাজির হলো মেস সেক্রেটারি। টিভি চলছে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সে। কারও তোয়াক্কা না করে আবার বন্ধ করে দিল সেটা।

তার এ কাজটা অফিসারদের ভদ্রতার বাইরে। এ এক ধরনের আত্মমর্যাদা হানিকর, এক ধরনের বর্বরতা। আর ওরা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন – Why have you switched off? Is it the order of CO?

উক্ত অফিসার রূঢ়ভাবে জবাব দিলেন – yes.



ওরাও সবাই রুষ্ট। আসলে সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। অফিসারগণ বললেন – There cann't be any such order. We want to hear the news.

কিন্তু তাকে মানান গেলো না। শেষপর্যন্ত টিভি বন্ধ করেই চলে গেলো বীরদর্পে সে। সম্ভবত ওরা চাচ্ছিলো না বাঙালি অফিসারবৃন্দ খবর দেখুক, দেশের চলমান গণজাগরণ সর্ম্পকে জানুক আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক। তাই এ তথ্যপ্রবাহ বন্ধ করা। বাঙালিকে অন্ধকারে রাখতে পারলে এরা সময় মতো সঠিক কাজটি করতে পারবে।

পরের দিন ইউনিটে পৌঁছে রাতের ঘটনার ফলো আপ পেলেন তরুন অফিসারবৃন্দ। কমান্ডিং অফিসার তাদের ডাকলেন। রাতের ঘটনার ব্যাপারে জানতে চাইলেন কী হয়েছিল। শান্তভাবে উপদেশ দিলেন মেসের নিয়ম কানুন মেনে চলতে। ঘটনা খুঁজতে যেয়ে জানতে পারলেন রাতেই সে সময়কার ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি তাদের কমান্ডিং অফিসারকে মেসের ইনসিডেন্সটা অবহিত করেছিলেন। উর্দুভাষী অফিসারই মেসের নিয়ম ভেঙে টেলিভিশন বন্ধ করেছে। কিন্তু সেটার উপর আইনি মোহর মেরেছেন ব্রিগেড কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে।

শেষমেষ যা দাঁড়ালো, ২১ ফেব্রুয়ারি'র আগে আর টিভি দেখার সুযোগ পেলেন না বাঙালি অফিসারগণ। আসলে এদেরকে কোণঠাসা করেই রাখা হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানে বাংলা ভাষাভাষীদের সত্যিকারের অবস্থানের ইঙ্গিত এ থেকেই পাওয়া যায়।

স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গ জুড়েই থাকলো। সেদিনের নবীন অফিসার হোসেন জানালেন – যতদূর তার মনে পড়ে শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণ হয়েছিল খুব সংক্ষিপ্ত। ডেপয়মেন্ট ছিল ক্যান্টনমেন্টের আশপাশেই। এমডিএস (মেঈন ড্রেসিং স্টেশন) লাগানো হয় সিএমএইচ (কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল) এর কাছে। আর এডিএস (অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশন) লাগান হয় ৪ ইস্ট বেঙ্গল (ইবিআর) এর প্রায় লাগোয়া হয়ে। একটা মাত্র এডিএস ডেপ্লয় করা হলো যার কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন মুক্তার কামাল চৌধুরী। আর ঐ এডিএস এর জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব পেলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। কিন্তু রাতের বেলা সেখানে যেয়ে থাকতে হয়নি তাকে। অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহাঙ্গীর মিতভাষী এবং অমায়িক ছিলেন। জিপে করে নবীনদের এক্সারসাইজ এলাকায় নিয়ে যেতেন। রাতে এসে তারা থাকতেন এমডিএস এ অর্থাৎ সেনানিবাসের অভ্যন্তরেই।

একদিন রাতে অন্যান্য অফিসারদের সাথে এমডিএস এ বসে আড্ডা মারছেন সবাই। হঠাৎ করে অপারেটর জানালো লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনের সাথে এক

ভদ্রমহিলা কথা বলতে চান। অবাকই হয়েছিলেন তিনি। কারণ, তখন অবধি কুমিল্লায় অফিসের বাইরের কারোর সাথেই পরিচয় হয়নি তার। আসলে হবেই বা কেমন করে? বাইরে তেমন একটা গেলে তো? তবুও কথা বললেন। আর সে ছিল তার কুমিল্লা'র এক বান্ধবী, ডাক্তার, তাদের মতোই সবে পাশ করা। ঢাকা মেডিকেল কলেজে হোসেনের সহপাঠিনী। বাসায় যেতে দাওয়াত দিলেন তাকে। সম্মতি দিলেন হোসেন। তবে সাথে সাথে এও জানালেন যে এক্সারসাইজ শেষ হলে একদিন যাবেন। কারণ এক্সারসাইজ চলাকালীন বাইরে যাওয়া বারণ।

এক্সারসাইজ তখন শেষ। টিপরা বাজারে ঘোরার ছলে হোসেন একদিন একটা রিক্সা করে চলে গেলেন শহরে। বাইরের কাউকে বলাও মুশকিল যে কঠিন নিয়মের বেড়জালে বাঁধা পড়েছেন এরা। খোলা আকাশের সীমানা থেকে সরাসরি ঢুকে পড়েছেন খাঁচায়, হোক না সে সোনারই। বাঁধাটা স্বাভাবিকের চেয়ে কঠিন তখন পশ্চিমাদের বাড়াবাড়ির কারণে। ওরা ভয় কিংবা অন্য কোনো কারণে বাঙালি অফিসারদের বেসামরিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইছে।

বাড়ি খুঁজে পেতে সময় লাগেনি তেমন একটা হোসেনের। ভদ্রমহিলার পুরো পরিবার ভয়ানক খুশি ওকে তাদের মাঝে পেয়ে। তারা অবাঙালি তবে না খাইয়ে ছাড়লেন না। শেষে ফিরতে ফিরতে সেই রাত সাড়ে ন'টা। দ্রুত ফেরার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। আসলে ভদ্রতার সীমা পার হতে পারেননি তিনি। হোস্টদের বলতে পারেননি ওদের কঠিন নিময় কানুনের কথা।

পরের দিন আবার সিও'র অফিসে তলব। জিজ্ঞেস করলেন – কোথায় গিয়েছিলে কাল রাতে? নবীন লেফটেন্যান্ট সত্যি কথাই বললেন। সিও তাকে বললেন - Don't think that you will do and we shall not know. Wherever you go and whatever you do, it will come to my knowledge.

আসলে সে সময় যে গণজাগরণ চলছিল তার উত্তাপ সেনাসিবাসে বসে অনুভব করা যাচ্ছিল না। দেশে তখন ক্ষোভ দানা বাঁধছে বেশ জোরে শোরে। ক্ষুদ্র রাই হতে পাহাড় হয়ে যাবার মতো কিংবা বিন্দু বিন্দু বরফ মিলেমিশে হয়ে যাচ্ছে অ্যান্টার্কটিকার বরফ সমুদ্র।

বাইশ বছরের বৈষম্যে একাত্তরের ইস্ট পাকিস্তান ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ পুরো বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধুর কথায় তখন দেশ উঠে, বসে। এ অংশে সত্যিকার অর্থে পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গুর হয়ে এসেছে। ওরা নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে দ্রুত। সম্ভবত সে-জন্যই শঙ্কা! চলাচলের উপর বিধিনিষেধ। শেষ রক্ষার চেষ্টা আর কী!

একাত্তরের দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে বিদ্রোহী কবির দু'টো কবিতার কটা লাইন বার বার ফিরে আসতে লাগলো মনে :

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার



আমি তখন স্কুলের শেষ পর্যায়ে। এই সব কবিতা আর গানের সুর আমার তরুণ রক্তকে দুরন্ত সাইক্লোন অ্যানজেলার মতো নাচিয়ে তুলতো। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শুনতাম এ কবিতা। কখনো গানের সুরে, কখনো বা কবিতার মতো বাজছে হোটেলে, রেঁস্তোরায়, দোকানে, হাটে, গঞ্জে। বাজছে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়ের গভীরে। ভোটের অভাবনীয় বিজয় এদেশের মানুষের মনোবলকে করেছে মজবুত, সিদ্ধান্তে ও ভাবনায় দিয়েছে দৃঢ়তা। দরকারে স্বাধিকারের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা– এ প্রত্যয়কে করেছে প্রশস্ত। একাত্তরের প্রথম দিক দিয়েই মানসিকভাবে এ জাতি যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সম্ভবত স্বাধীনতার ছবি ফুটে উঠেছে সবার মনে। তবে সামরিক বাহিনীতে নতুন জয়েন করে সেনানিবাস থেকে সেটা পুরোপুরি অনুভবের উপায় ছিল না একাত্তরের এই আর্মি অফিসারদের। নির্দিষ্ট গণ্ডিতে থাকলে তার সীমাবদ্ধতা থাকে অনেক।

তখনকার দিনে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল নিতান্ত সীমিত। টেলিফোনও এতো উন্নত ছিল না। আর সেনানিবাস হতে বাইরে আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করতে হতো আর্মি এক্সেঞ্জের মাধ্যমে। সুতরাং সুযোগ ছিল সীমিত, কেবলমাত্র আর্মি টু আর্মি কল। আর তা ছাড়াও আরো কিছু কারণ ছিল যেমন :

১। পেপার আসতো অল্প
২। টিভি দিলো বন্ধ করে
৩। শহরে যাওয়া বারণ

তখনকার দিনে টিভির চেয়ে রেডিওর প্রচলন ছিল বেশি। ইচ্ছে করলে অনেকেই রেডিও কিনে নিতে পারতেন। যদি কল্পনাও করতে পারতেন যে আকাশের ঈশান কোণে জমে উঠেছে অশনি সংকেত, সবাই রেডিও রাখতেন একটা করে সাথে। নিজেদের জনগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা কোনো শাসকগোষ্ঠী করতে পারে চট করে সেটা কারও ধারণায়ও আসেনি। পাকিস্তানিরা হয়ত প্রথম থেকেই একাত্তরের পূর্ব পাকিস্তানিদের তাদের অংশই মনে করেনি। তা না হলে পরবর্তীতে নৃসংশতায় ওরা চেঙ্গিস খানের বাবার পরিচয় দিতে পারতো না।

একাত্তরে কুমিল্লা সেনানিবাসে অন্যান্য যে সব বাঙালি অফিসার ছিলেন তাদের সাথে নবীন অফিসারদের স্বল্প সময়ে বাস্তব যোগাযোগ ঘটেনি। আর ছিলেনইবা ক'জন। ২৪ এফএফ এর উপ-অধিনায়ক মেজর আসাদ, ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, লেফটেন্যান্ট মাহবুব আর ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের ক'জন অফিসার। আরো দু'চারজন হয়ত ছিলেন যাদের কথা স্মৃতিতে বিলীন হয়ে গেছে সে দিনের যোদ্ধার।

তবে আর্টিলারিতে ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান। ইমামুজ্জামান প্রথমে আর্টিলারি মেসে ছিলেন, রাস্তার ওপারে অর্থাৎ টিপরা বাজারের দিকে।

কিন্তু একদিন সেখান থেকে তিনি হানিমুন লজে নবীনদের পাশের রুমে চলে এলেন, বিছানাপত্র সমেত। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। ডর ভয় কমই ছিল তাঁর। পাকিস্তানিদের বলতেন পায়া। বলতেন – পায়াদের বিশ্বাস নেই, কখন যে কী করে বসে। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তার বাসস্থানের এ পরিবর্তন। অর্থাৎ দিন যতো এগিয়ে যেতে লাগলো মার্চের দিকে ততই যেন এক ধরনের অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হতে থাকলো সেনানিবাসের বাঙালি অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ।

শুনতে শুনতে একাত্তরের চারণভূমিতে কুমিল্লায় সেনানিবাসের বাঙালি অফিসারদের অনুভূতির সাথে লেখক একাত্ম হয়ে গেলেন। ঐ দিনগুলোয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের মর্যাদা আর অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলে এ-সব ঘটনাবলি। একই দেশ অথচ কী বৈষম্যের বিভাজন! এক অদৃশ্য দেয়াল উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে তর্জনীয় ইশারায়। বলছে – তোমরা বাঙালি, তোমাদের অবস্থান ঐখানে, ঐ অনেক নিচে। থাক ওখানেই। আর আমরাই তোমাদের প্রভু। কর্তৃত্ব করতেই জন্মেছি। আমাদের অবস্থান এইখানে, এই উঁচুতে।

কিন্তু প্রভুদের উঁচু দেয়ালের সিংহাসনে ফাটল ধরতে শুরু করেছে ততদিনে। ওরা তখনও টের পায়নি হয়ত। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তখন বাংলার জনগণ উত্তাল। দেখতে দেখতে যেন কোনো সাইক্লোন দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে রাশি রাশি ক্রুদ্ধ ঢেউ হয়ে। ফেব্রুয়ারিতেই এমন একটা সময় এলো যখন ক্যান্টনমেন্টের খাদ্য সরবারহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়লো কর্তৃপক্ষের মধ্যে। কারণ তাজা রশদ সব সময়ই ঠিকাদার সরবরাহ করে থাকে এবং তারা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাঙালি অফিসারবৃন্দ অবশ্য এ ব্যাপারে একদমই শঙ্কিত হলেন না।

ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি অফিসারদের সাথে দরবারে মিলিত হলেন। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন গাম্ভীর্যের সাথে। তারপর বললেন – তারা আমাদের খানা পানি বন্ধ করে দিতে চায়। But I want to tell you that we can't die without food. If necessary we shall apply force to procure our food material.

এগুলো ফেব্রুয়ারি'র শেষের দিকের কথা। একদিন বাঙালি অফিসারবৃন্দ মেসে বসে খাচ্ছিলেন। সে সময় ২৪ এফ এফ রেজিমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হত অফিসার মেস। খাবারের সময় লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন এবং লেফটেন্যান্ট আকতার বাংলায় কথা বলতে শুরু করলেন যা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাদের বাধা দিল একজন পাকিস্তানি অফিসার। বললো – You should speak in a language understandable to all.



নবীন অফিসারবৃন্দ সে অফিসারের কথা মেনে নিলেন। একই দেশের অফিসার। একজন আর একজনার কথা বুঝতে পারা উচিৎ বৈকি। এরই মধ্যে হঠাৎ পাকিস্তানিদের মধ্যে দু'একজন উর্দুতে কথা বলতে শুরু করলো। সাথে সাথে বাঙালি একজন অফিসার একই ভাষায় প্রতিবাদ করলেন। টিট ফর ট্যাট। এর প্রয়োজনও ছিল। ওদের কথাই ওদের ফিরিয়ে দিলেন লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন। বললেন –You should speak in a language understandable to all.

উর্দুভাষী একজন অফিসার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো – Don't you understand Urdu? তার কথার ভঙ্গিতে মনে হলো উর্দু না জানাটা একটা অবাক ব্যাপার, অন্যায়ও বটে। এ যেন কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের কোলে শুয়ে মাকে চিনতে ভুল করার মতো অবস্থা!

'No' বাংলা ভাষাভাষী অফিসারদের সাফ জবাব। উর্দুভাষী অফিসারগণ অবশ্য কথা বাড়ায়নি, মেনে নিল এদের প্রতিবাদ। কথোপকথন ফিরে আসলো ইংরেজি ভাষায়।

দেখতে দেখতে ফেব্রুয়ারি'র শেষ রশ্মি অস্ত গেলো। শুরু হলো মার্চ। উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত বাঙালি, বাঙালির বাংলাদেশ। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সবাই যেন এক দেহ এক প্রাণ। এমন অশান্ত পরিবেশে ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে নতুন মুখের আগমন ঘটলো। ডা. খন্দকার নুরুল ইমাম। জয়েন করলেন তিনি। হয়ে গেলেন লেফটেন্যান্ট নুরুল ইমাম। হোসেনের মতো নবীন অফিসারগণ কিছুটা অবাক হলেন। বললেন – আরে, তুমি এখন জয়েন করেছ? এই যে এলে আর কিন্তু বেরুতে পারবে না – Until the situation improves.

তরুণ লেফটেন্যান্ট নুরুল ইমাম জবাবে বললেন – ঢাকার অবস্থা ভাল না। Army is a safer place. Better we join Army.

আসলেই কী তাই? Safer? দেখা যাক সময় কী বলে? ভাবলেন ওরা।

তখন পর্যন্ত এদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট নুরুল ইমামই সর্বকনিষ্ঠ, চাকরিতে এবং অভিজ্ঞতায়। প্রথমে তার দরকার এই চাকরির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। কাজেই আপাতত তাকে কোনো অস্থায়ী কর্তব্যে নিয়োগ করা হলো না।

তবে একটা অস্বস্তি সবার মধ্যেই বিরাজমান। ঘন অন্ধকারের কালো ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, বুঝতে কারোর কষ্ট হলো না। কিন্তু তার গভীরতা কতটা হবে তা ঠিক যেন স্পষ্ট নয়।

সেনানিবাসের অভ্যন্তরে পরিবেশ মনে হচ্ছে শান্ত। বিধিনিষেধের মাঝে কতটুকুই বা তথ্য সেদিনের যোদ্ধারা জানতে পেরেছিলেন। তবে দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকলো এমন ভাবে যে, সেদিনের দেশবাসী স্বাধিকার থেকে দ্রুত স্বাধীনতার আন্দোলনে চলে এলেন। স্বাধীনতার বিনিময়, তিরিশ লক্ষ লোকের আত্মাহুতি! অত্যন্ত দামি এ বিনিময়। তাছাড়া আরো যে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে

তার সত্যিকারের হিসেব তো আজও করা হয়নি। যে নির্বাচন এবং তার ফলাফল পুরো বাঙালি জাতিকে সাহস আর শক্তির সুউচ্চ সোপানে নিয়ে গেলো একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখা যাক, পাকিস্তানের পূর্ব পশ্চিমে কোনো দল কেমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

| | | |
|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ | - | ১৬৭ |
| পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি | - | ৮৮ |
| অল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইউম) | - | ৯ |
| মুসলীম লীগ (কাউন্সিল) | - | ৭ |
| জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভি গ্রুপ) | - | ৭ |
| মারকাজী-জামায়েত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (থানভী গ্রুপ) | - | ৭ |
| ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (ওয়ালি খান) | - | ৭ |
| জামায়েত-ই-ইসলাম | - | ৪ |
| মুসলীম লীগ (কনভেনশন) | - | ২ |
| পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি | - | ১ |
| স্বতন্ত্র প্রার্থী | - | ১৪ |
| মোট | - | ৩১৩ |

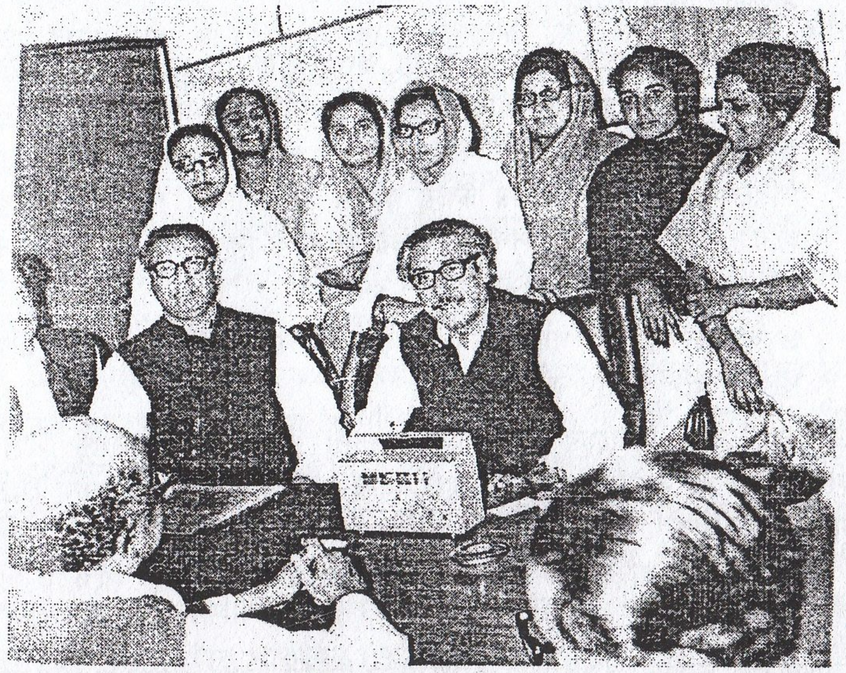
আর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় সর্বমোট বিজয়ী সিটের সংখ্যায় ঃ

| | | |
|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ | - | ২৯৮ |
| পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি | - | ২ |
| পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি | - | - |
| মুসলীম লীগ (কাউন্সিল) | - | - |
| মুসলীম লীগ (কনভেনশন) | - | - |
| অল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইউম) | - | - |
| ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি খান) | - | ১ |
| জামায়েত-ই-ইসলাম | - | ১ |
| নিজামে ইসলাম | - | ১ |
| জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (থানভী গ্রুপ) | - | - |
| মারকাজী-আহালি-হাদিস | - | - |
| জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভি গ্রুপ) | - | - |
| জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (নুরানি গ্রুপ) | - | - |
| সিন্দ-করাচি-পাঞ্জাবি-পাঠান | - | - |
| মুত্তাহিদা মাহাজ | - | - |
| বেলুচিস্তান ইউনাইটেড ফ্রন্ট | - | - |
| পাখ্‌তুন খাওয়া (এনএপি) | - | - |
| স্বতন্ত্র নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা | - | ৭ |
| মোট | - | ৩১০ |

(সূত্র : বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ভলিউম-১, পৃ. ১৩০)



যে পরিসংখ্যান দেয়া হলো এর মধ্যে নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যাও ধরা হয়েছে। অন্যথায় আসন সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই ৩০০ করে। এ হিসাবে জনগণের আওয়ামী লীগের প্রতি অকুণ্ঠ এবং অবারিত সমর্থনের কথাই প্রমাণ করে দেয়।



রেডিওতে নির্বাচনের ফলাফল শুনছেন বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ

৬ দফার উপর ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় ও ভোট যুদ্ধে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ এ ৬ দফার উপর ভিত্তি করেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে। তাহলে দেখা যাক ৬ দফায় কী কী ছিল।

১। প্রথম দফায় লাহোর রেজুলেশনের মূল কথা পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন করার কথাই ধ্বনিত হলো। বলা হলো বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary form of government) প্রতিষ্ঠা করবেন।

২। দ্বিতীয় দফায় বলা হলো কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র নিরাপত্তা এবং বিদেশ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করবে। বাকি সব কাজ ফেডারেশনের স্ব স্ব স্টেটগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে।

৩। দু'ধরনের মুদ্রার কথা বলা হলো তৃতীয় দফায় যা সহজেই বিনিময় যোগ্য হবে। তবে এটা সম্ভব না হলে একটি মাত্র মুদ্রার প্রচলনই থাকবে। আরো বলা হলো যে দেশের রাজধানী পূর্ব পাকিস্তানেই থাকবে। এ ছাড়াও পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জন্য ব্যাংকিং রিজার্ভ চালু করতে হবে এবং পূর্বাঞ্চলের জন্য আলাদা অর্থ এবং মুদ্রানীতি থাকতে হবে।

৪। চতুর্থ দফায় বলা হলো যে ফেডারেশনের নিজ নিজ অংশের উপর কর আরোপ এবং খাজনা আদায়ের দায়িত্ব থাকবে যা দিয়ে তারা বিভিন্ন খরচ মিটাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সেখান থেকে একটা অংশ নিয়ে তার ব্যয়ভার বহন করবে।

৫। পঞ্চম দফায় এলো দেশের উভয় অংশের জন্য বিদেশি অর্থ আয়ের হিসেব আলাদা আলাদা থাকার কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশি মুদ্রার খরচ দেশের উভয় অংশ সমান হারে অথবা একটা নির্ধারিত হারে পরিশোধ করবে। দেশের উভয় অংশে মালামালের পরিবহন করমুক্ত হবে। আর দেশের শাসনতন্ত্র উভয় অংশকে বিদেশের সাথে সরাসরি বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষমতা অর্পণ করবে।

৬। ৬ নং দফায় পূর্ব পাকিস্তানে আলাদা মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিশিয়া থাকবে বলে উল্লেখ করা হলো।

ডিসেম্বর ভোট বিজয়ের পরে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশি জনগণ সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল ৩ মার্চের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি'র বৈঠকের জন্য। প্রথম বৈঠক হবে ঢাকাতেই। সব ঠিকঠাক। পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টি এবং কাইয়ুম খানের মুসলিম লীগ ছাড়া সকল দলের এমপিরা তখন ঢাকায়, সংখ্যায় ওরা পঁয়ত্রিশ।

দি ডন করাচি মার্চ ১, ১৯৭১। এ পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে অনায়াসে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বেশ নমনীয় ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সবাই মিলে সংসদে বসবেন এবং একটা শাসনতন্ত্র গঠন করবেন। তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলেছেন, "Whatever rights and autonomy we want for Bangladesh we want for the people of the Punjab, the NWFP, Sind and Baluchistan also to enjoy." (বাংলাদেশ ডকুমেন্ট, ভলিউম-১, পাতা -১৮১)

জুলফিকার আলী ভুট্টো কিন্তু টলছেন না তার অবস্থান থেকে। তার ভাষায় আওয়ামী লীগের ৬ দফার উপর ভিত্তি করে খসড়া সংবিধানে তিনি রাবার স্ট্যাম্প হবার জন্য রাজি নন। প্রেসিডেন্টের বেঁধে দেয়া ১২০ দিন সময়ও তার পছন্দনীয় নয় (বাংলাদেশ ডকুমেন্ট, ভলিউম-১, পাতা -১৮৫)।

সত্তরের ১৮ ডিসেম্বরে করাচিতে প্রকাশিত দি ডন পত্রিকাতে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের জনগণের ৬ দফা কর্মসূচি আদায় করতে তিনি সক্ষম হবেন। ২০ ডিসেম্বর একই পত্রিকায় দেখা যায় বঙ্গবন্ধু পুনরায় বলেছেন, "I warmly thank the people for having given a historic verdict in favour of our six-point programme. We pledge to implement this verdict. There can be no constitution except one which is based on the six-points programme''. কথাবার্তায় বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় সিদ্ধান্ত আর প্রত্যয় ফুটে আছে।



কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথায় সহসাই কোনো সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া গেলো না। তিনি সত্তরের ২০ ডিসেম্বর, রবিবার, লাহোরে ঘোষণা করলেন যে কোনো শাসনতন্ত্র কিংবা কেন্দ্রে কোনো সরকার গঠন তার পার্টির সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হবে না। তিনি আরো বললেন যে পিপিপি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধীদলের আসনে বসতে প্রস্তুত নয় (দি পাকিস্তান টাইমস, ডিসেম্বর ২১, ১৯৭০)।

ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে এ দু'টি প্রধান দলে। পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি তাজউদ্দীন আহমেদ ভুট্টোর বক্তব্যের প্রতিবাদে বললেন যে তার পার্টির সহযোগিতা ছাড়া না শাসনতন্ত্র গঠন করা যাবে, না কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে (পাকিস্তান অবজারভার, ডিসেম্বর ২২, ১৯৭০)।

এবার ভুট্টো আসল কথায় আসলেন। একুশে ডিসেম্বর সোমবারে তিনি লাহোরে পুনরায় বললেন যে পিপিপিকে জোর করে বিরোধী আসনে বসান যাবে না। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং পিপলস পার্টির মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি থাকতে হবে যাতে তারা জনগণের দেয়া ম্যান্ডেট বাস্তবায়িত করতে পারেন (দি পাকিস্তান টাইমস, ডিসেম্বর ২২, ১৯৭০)। ২৭ ডিসেম্বর লাহোরে ভুট্টো পুনরায় বললেন যে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজের পছন্দমতো শাসনতন্ত্র করতে চায় তা হলে তিনি এর বাইরে থাকবেন। যদি এভাবে হয় তা হলে পিপলস পার্টি তার পরিণতির জন্য দায়ী থাকবে না (দি ডন, ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭০)।



পাকিস্তান ভেঙে দেয়ার নেপথ্য নায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টো

এরই মধ্যে গুঞ্জন উঠলো শেখ মুজিব হিন্দু ঘেঁষা। তাদের প্রতি দুর্বল। অর্থাৎ শুরু হলো ধর্ম বাণিজ্য। বঙ্গবন্ধু একে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা বলে উড়িয়ে দিলেন। তিনি ৩ জানুয়ারি, ১৯৭১, রোববার, রেসকোর্সের জনসভায় ঘোষণা করলেন যে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ৬ এবং ১১ দফার ভিত্তিতেই হবে। তবে তিনি এও বললেন যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাইবেন এ জন্য (দি পাকিস্তান অবজারভার, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১)।

কিছু আশার আলোও উজ্জীবিত হলো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তব্যে। তিনি ১৪ জানুয়ারিতে ঢাকায় বললেন যে শাসনতন্ত্র তৈরি হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে যত দ্রুত সম্ভব তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান। তবে শাসনতন্ত্র গঠন প্রক্রিয়া সংসদের বাইরে করতে তিনি জন প্রতিনিধিদেরই দায়িত্ব দিলেন। সেজন্য যতদিন লাগে। তবে তার মতে সে প্রক্রিয়া যদি ১০ দিনেও সমাপ্ত হয় অসুবিধা কী?

তার বক্তব্যে একটা কিন্তু রয়ে গেলো। শাসনতন্ত্র গঠন শেষ হওয়া সাপেক্ষে সংসদ অধিবেশন বসবে কিংবা ক্ষমতা হস্তান্তর। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৩ দিনের ভিজিট শেষ করে ইসলামাবাদ ফেরার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করলেন প্রেসিডেন্ট



বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার পর সাংবাদিকের মাঝে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। কিন্তু ভুট্টোর কথায় যেন কিছু বেসুরো ভাব থেকেই গেলো। তিনি ১৩ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে এক প্রেস কনফারেন্সে বললেন, "We face today is how to keep the country together; it is the supreme task and, therefore, constitution making has the top priority". (দি পাকিস্তান টাইমস, জানুয়ারি ১৪, ১৯৭১)।





বাংলার অবিসংবাদিত নেতা - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেষে ভুট্টো ঢাকায় এলেন। আলোচনা করলেন বঙ্গবন্ধুর সাথে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭১ ভুট্টো প্রেস কনফারেন্সে বললেন যে জাতীয় ঐক্যের জন্য তার পার্টি গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র তৈরিতে যা যা সম্ভব তা সব করবে। তিনি আরো বললেন, "We have genuine difficulties, and we need at least up to the end of February to make a comment on it." তিনি এও বললেন, "We understood each other's viewpoints and we would have to explain our viewpoints to our people and their representatives before we meet next time. The task was a challenging one and we will have to resolve many of our problems - a legacy of the past 23 years". (দি পাকিস্তান টাইমস, জানুয়ারি ৩১, ১৯৭১)।

জানুয়ারি পর্যন্ত আশার আলো দেখলেও ভুট্টোর মাঝে যে নৈরাশ্য বিরাজমান তা বোঝা যাচ্ছিল। যদি কখনো সমস্যা আসে তবে তা আসবে হয়ত পিপিপি'র তরফ থেকেই।

বঙ্গবন্ধু কি কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন! ৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদ ডাকায় দেরি দেখে হতাশা ব্যক্ত করলেন তিনি। শেষে খোলামেলাই বলে বসলেন যে তারা ৬ দফার উপর ভিত্তি করেই শাসনতন্ত্র গঠন করবেন। (দি ডন, ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৭১)

তবে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে ঘোষণা এসেছে, ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবে ঢাকায়। দুঃখের বিষয় ১৫ ফেব্রুয়ারি পেশাওয়ারে উক্ত বৈঠক বর্জনের কথা জানালেন ভুট্টো। তবে এটা শর্তসাপেক্ষ। যদি না সংখ্যাগরিষ্ঠ দল

অর্থাৎ আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো ছাড় দিতে রাজি হয়। ভুট্টোর ভাষায় বললে "We can't go there only to endorse the constitution already prepared by a party and to return humiliated. If we are not heard and even reasonable proposals put by us not considerable, I don't see the purpose to go there." (দি ডন, ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৯৭১)

জুলফিকার আলী ভুট্টোর আচরণে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আলামত বোঝা গেলো না। ১৫ ফেব্রুয়ারি পেশাওয়ার থেকে লাহোর বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। আলোচনাকালে জানালেন যে, জাতীয় পরিষদে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত পার্টির। একজন সাংবাদিক তার কাছে জানতে চাইলেন যে, তার দল পুরো পশ্চিম পাকিস্তানেরই প্রতিনিধিত্ব করে এ সম্পর্কে তার বক্তব্য কী ? জবাবে ভুট্টো বললেন, "This is not a claim. This is a fact and reality of life". (দি ডন, করাচি, ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৯৭১)।

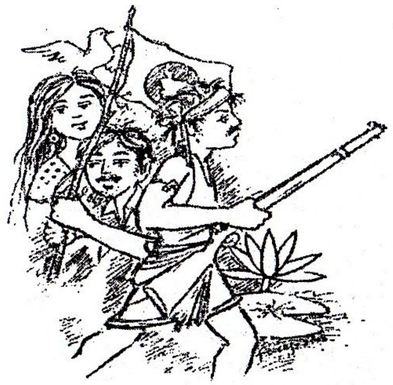
ভুট্টো অভিন্ন সুরে করাচিতে ১৬ ফেব্রুয়ারিতে সমাগত জাতীয় পরিষদে না বসার সিদ্ধান্তকে বললেন, "Unshakable and irrevocable" (দি ডন, করাচি-ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৯৭১)

এমনিতেই ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন প্রাণ লাভ করে বাঙালিরা। তার উপরে ভুট্টোর এলোপাথাড়ি কথায় ঘুমন্ত ডিনামাইটের ফিউজে না আগুন লেগে যায়!

কিন্তু ততদিনে মোটা মাথার পলিটিক্স শুরু করেছেন পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। ১ মার্চে দুপুর ১-০৫ এর বেতার ভাষণে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন এক খোঁড়া যুক্তি দিয়ে। ভাষণে বললেন – আমি আমাদের জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ ৩ মার্চ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত করেছিলাম। বিগত কয়েক সপ্তাহে অবশ্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, ঐকমত্যে পৌঁছার পরিবর্তে আমাদের কোনো কোনো নেতা অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক মোকাবিলা একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি (পিপিপি) এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। এ ছাড়া ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অতএব আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান পরবর্তী কোনো তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি (সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, করাচি এবং ঢাকা, মার্চ ২, ১৯৭১)।

সাথে সাথে তৎকালীন প্রশাসনে রদবদল করলেন সামরিক প্রশাসক। ভাইস অ্যাডমিরাল এসএম আহসানকে সরিয়ে বসালেন সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে।



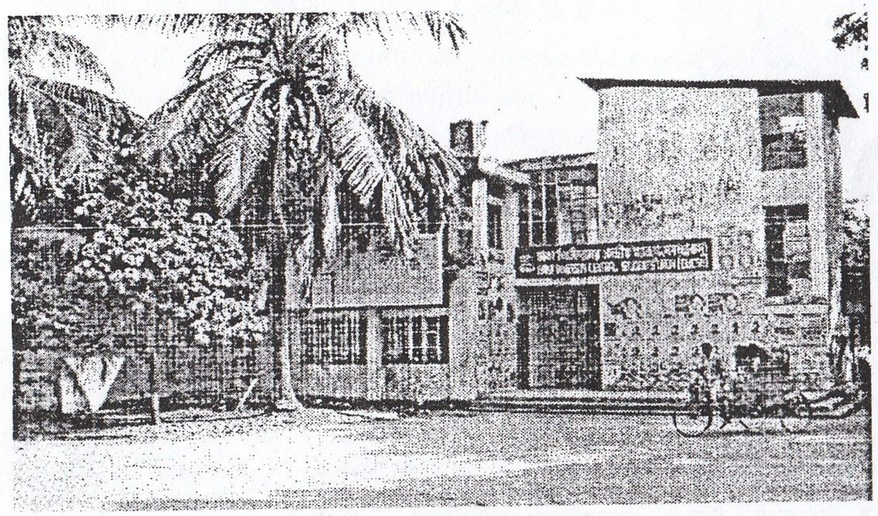


এ যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিকে উসকে দেয়া। ব্যাস, শুরু হয়ে গেলো গণআন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সৈকতে ছুটে আসা তরঙ্গের মতো দ্রুত সমবেত হলো ঐতিহাসিক বটতলায়। দেখতে দেখতে শান্ত ঢাকা নগরী পরিণত হলো অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, উত্তাল নগরীতে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, কলকারখানা সর্বত্রই আন্দোলনের ছোঁয়া। রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠলো স্লোগানে স্লোগানে। তখনকার দিনের প্রিয় স্লোগান : জাগো জাগো - বাঙালি জাগো, তোমার আমার ঠিকানা - পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেদিনের জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিকালে হোটেল পূর্বাণীতে সামরিক শাসকের এ হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন তীব্র ভাষায়। চলে এলো কর্মসূচি। ঐ সপ্তাহের মঙ্গলবার হরতাল হবে ঢাকায়। বুধবার সারা বাংলাদেশে এবং ৭ মার্চ পল্টনে জনসভা। ঐ সময় আওয়ামী লীগ নেতা এক দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিলেন। দলীয় সকল কর্মসূচি নিজ দলে সীমাবদ্ধ না রেখে বর্ষীয়ান নেতা মাওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য জননেতাদেরও সম্পৃক্ত করলেন।

ঐ সময় আওয়ামী লীগ নেতা ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ডেকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার নির্দেশ দিলেন। চার ছাত্রনেতা সর্বজনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ স ম আব্দুর রব এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন বৈঠকে গঠন করে ফেললেন স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।

একাত্তরের মার্চ। চেতনায় জেগে ওঠা এক বহ্নিশিখা। ছিলাম ছাত্র, ছোটো এক মহকুমা শহরে। কিন্তু সব কিছু স্মৃতিতে অম্লান এখনো। মনে পড়ে ২ মার্চের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাংলাদেশ ঠায় দাঁড়িয়ে গেলো। সকল সরকারি ও বেসরকারি অফিস আদালত বন্ধ, গাড়ির চাকা ঘুরছে না, কলকারখানায় বাজছে না সাইরেন। যেমন নিথর নদী, থমথমে আকাশ, মাল্লারা দেখছে আকাশে ঘন কালো মেঘের ছুটাছুটি। যেন এখনি সাগরের ঘুমন্ত ঘূর্ণিরা ডেবিট কিংবা অ্যানজেলা হয়ে ছুটে আসবে দ্রুত। ঐদিনই বেলা ১১টার দিকে বটতলায় ছাত্রদের বিশাল সমাবেশ হলো। সভাপতিত্ব করলেন নূরে আলম সিদ্দিকী। অন্য তিন ছাত্রনেতা



সফল আন্দোলনের সুতিকা গৃহ - ঐতিহ্যবাহী ডাকসু ভবন

উপস্থিত আছেন, পাশেই। শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রথমবারের মতো প্রস্তাবিত বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করলেন উপচে পড়া ছাত্রদের হাততালি আর হর্ষধ্বনির মাঝে। বিকালে পল্টনে ছিল লাখো মানুষের ঢল। ভেঙে দেবে সকল বাঁধ, ভাসিয়ে নেবে সব বাধা। এক সময় জানতাম দুঃসংবাদ দ্রুত ধায় কিন্তু সুসংবাদও দ্রুত ছড়ায়। মার্চের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের সব সংবাদ দ্রুত পৌঁছে যেতে থাকলো মফস্বল পর্যন্ত, ইথারে ভেসে ভেসে, দ্রুত এবং নিশ্চিত ভাবে।



জেগে উঠেছে ঘুমন্ত ব্যঘ্র– ওরা বাঙালি

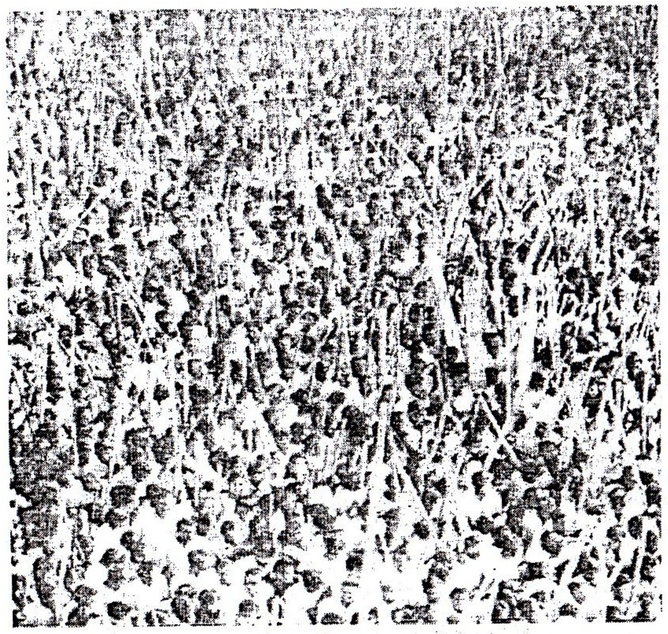


এ গণজাগরণ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের পছন্দ হলো না। বলা নেই কওয়া নেই সন্ধ্যা সাতটা থেকে পরের দিন ভোর সাতটা পর্যন্ত ঢাকায় জারি করা হলো সান্ধ্যআইন। অপরিণামদর্শী পাকিস্তানিদের ইচ্ছে হলো আন্দোলন থামাবে ধমকে, গুলিতে। তো চললো গুলি। রাজপথ আবার রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। বঙ্গবন্ধু মর্মাহত হলেন। এক বিবৃতিতে তিনি বললেন – যারা শক্তি দ্বারা জনগণের মোকাবেলা করতে চান তাদের এ ধরনের বেপরোয়া পথ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাঙালি আর নির্যাতিত হতে রাজি নয়। তারা তাদের অধিকার অর্জনে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে পরবর্তী কর্মসূচি এলো – ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল। সাথে সাথে ৩ মার্চকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

রক্তের হোলি খেলায় যেন মেতে উঠলো পাকিস্তানিরা। দিনকে দিন অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। অন্যদিকে ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের উর্দু ভাষীদের লেলিয়ে দেয়া হলো বাঙালি নিধনে। এরা এমনিতেই মুখিয়ে ছিল, যেন গোক্ষুরের লেজে পায়ের ছোঁয়া। হিস হিস শব্দে ছোবলের সতর্ক সংকেত, হলোও তাই। ইশারা পেতেই এলাকায় এলাকায় নরক গুলজার করে তুললো তারা। সে এক জঘন্য ব্যাপার। এদের নিষ্ঠুরতা হালাকুখানের তাণ্ডবতাকে ছাড়িয়ে যেতে লাগলো। চট্টগ্রামের অবস্থা হলো মারাত্মক। সারাদিন ব্যাপী আমবাগান, পাহাড়তলী, ওয়্যারলেস কলোনি, ফিরোজশাহ কলোনি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চললো। হতাহতের সংখ্যা হলো প্রায় চারশ'। হাসপাতালগুলো রোগীতে ভরে গেছে। কারফিউর ছোবলে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে লাগলো দ্রুত। একদিকে দৃঢ় প্রত্যয় আর অন্য দিকে কান্নার মিছিল। বাঙালির প্রতিবাদের কণ্ঠকে আরো প্রত্যয়ী আর সোচ্চার করে তুললো পাকিস্তানিদের নির্বিচার নিধনযজ্ঞ।

মনে পড়ে এ ক্রাইসিসের মধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পার্লামেন্টারি গ্রুপের ১২ জন নেতাকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রিত নেতারা হলেন বঙ্গবন্ধু ছাড়াও জুলফিকার আলী ভুট্টো, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, খান আব্দুল ওয়ালি খান, মাওলানা মুফতি মাহমুদ, আব্দুল গফুর আহমদ, মোহাম্মদ জামাল কোয়েফা, মাওলানা শাহ আহমদ নুরানী, মেজর জেনারেল জামালদার ও মালিক জাহাঙ্গীর খান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সামরিক জান্তার সে আমন্ত্রণ এই বলে প্রত্যাখান করলেন যে, যখন সামরিক শাসন অব্যাহত রয়েছে, কঠোর অস্ত্রের ভাষার ধ্বনি আমাদের কানের কাছে এখনও ধ্বনিত হচ্ছে, এই অবস্থায় একটি সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো বাস্তবপক্ষে বন্দুকের মুখে আমন্ত্রণ জানানোর শামিল। এ অবস্থায় এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। (সূত্র : ৭১ এর দশ মাস, পৃ. ১৪)।



নজীরবিহীন একাত্মতা – অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে বাংলাদেশ

সেদিনের তরুণ মুক্তিযোদ্ধা লে. হোসেন বললেন – ঐ সময় মানুষ দেশপ্রেমের কি রকম নজির স্থাপন করেছিল শুনলে অবাক হতে হয়। একবার গুজব রটলো পাকিস্তানিরা রাজারবাগ পুলিশ লাইন দখল করে নিচ্ছে। অমনি হাজার হাজার মানুষ ছুটলো রাজারবাগ রক্ষায়। পরে যখন জানলো এটা গুজব সবাই ফিরে গেলো, যে যার কাজে। সেদিনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ যারা তারাই শুধু জানেন অস্ত্রহীন মানুষ সশস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে কিভাবে রুখে দাঁড়ায়।

৩ মার্চ ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন – পল্টনের এই সভা আমার শেষ জনসভা হতে পারে। আমার অবর্তমানে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা থাকবে। তাঁরাই সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। তিনি স্পষ্ট করেই সামরিক জান্তাকে লক্ষ্য করে বললেন – সাত কোটি বাঙালিকে গুলি করে মেরে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আজ থেকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলবে। কোনো কর খাজনা দেয়া হবে না। অফিস আদালত বন্ধ থাকবে। কোনো সহযোগিতা করা হবে না।

জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিল। বন্ধ হয়ে গেলো অফিস, আদালত, কলকারখানা। কর দেয়া বন্ধ। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি দেয়া অব্যাহত রইলো। সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান এক বাক্যে শেখ মুজিবের আদেশ শিরোধার্য করে নিল।

বঙ্গবন্ধু নিজে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না বটে তবে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার করলো। এই ঘোষণাপত্রের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। স্বাধীনতা একটা মাত্র কথায়,



ঘোষণায় বা কাজে আসেনি। অনেক দিন, মাস, বছর এবং অনেক ঘটনা এবং বঞ্চনার ফলে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। কাজেই শুরু করলাম খোঁজা খুঁজি এবং খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু। পেলাম সেদিনের ছাত্রলীগের গৃহীত প্রস্তাবাবলি যা এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

**ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলি**

১। এই সভা পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালির উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালি ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ শক্তি সেনাবাহিনীর এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহবান জানাইতেছে।

২। এই সভা ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী বীর বাঙালি ভাইদের বাঁচাইয়া রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালি ভাইদেরকে ব্লাডব্যাংকে রক্ত প্রদানের আহবান জানাইতেছে।

৩। এই সভা পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সকল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫। এই সভা দল মত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান জানাইতেছে।

**(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি)**

**স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে :**

গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্যে বিদেশি পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বাঞ্চাল করে শেষবারের মতো বিদেশি পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে। ৫৪ হাজার ৫শ ৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত

ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে :

১। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

৩। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

**বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে :**

ক। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহলা থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন করতে হবে।

খ। সকল শ্রেণীর জনগণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

গ। শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।

ঘ। হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

ঙ। স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

**স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে :**

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোসক সরকার গণ্য করে বিদেশি সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনি বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পিবাহী পশ্চিমা অবাঙালি মিলিটারি বিদেশি ও হামলাকারী শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রু সৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশি উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।



(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে কোনো শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খতম করার জন্যে সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' সঙ্গীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

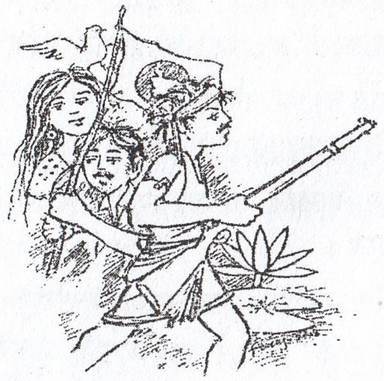
(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামরত বীর সেনানিদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ুন।

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক :**

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে -

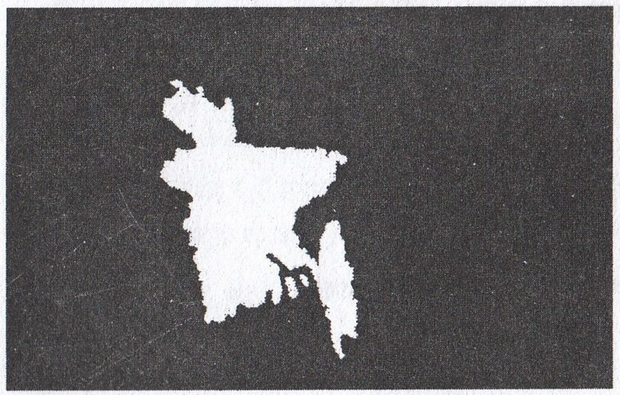
* স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ – দীর্ঘজীবী হোক।
* স্বাধীন কর স্বাধীন করো – বাংলাদেশ স্বাধীন করো।
* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
* গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়ো – মুক্তি বাহিনী গঠন করো।
* বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো – বাংলাদেশ স্বাধীন করো।
* মুক্তি যদি পেতে চাও – বাঙালিরা এক হও।
* বাংলার ও বাঙালির জয় হোক।
* জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। (সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৬৬ - ৬৮)



আসলে সে দিনগুলি ছিল পতাকা ও স্বাধীনতার। সামরিক দুঃশাসন আর মৃত্যু-ভয় জনতার আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি। বরং দেখতে দেখতে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির বিষ্ফোরণের মতো জনরোষ ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে, বাংলার প্রতিটি জনপদে। কি এক অবলীলায় শিশুর হাতেও উঠে এলো পতাকা, মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ চাই। বৃদ্ধের হাতেও পতাকা, আমরা স্বাধীন বাঙালি, স্বাধীনতা চাই। আন্দোলন এগিয়ে

জনগণ তখন এত বেপরোয়া যে চট্টগ্রাম পোর্টে আগত পাকিস্তানি জাহাজ এমভি সোয়াত থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ নামাতে পাকিস্তানি মিলিটারি ও নাবিকদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ফলে নিহত হয় শতাধিক শ্রমিক। তৎকালীন ইপিআর-এর একটি অংশ বাঙালি বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে এদের কোর্ট মার্শাল করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।



দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ - চোখে স্বপ্ন নতুন পতাকার

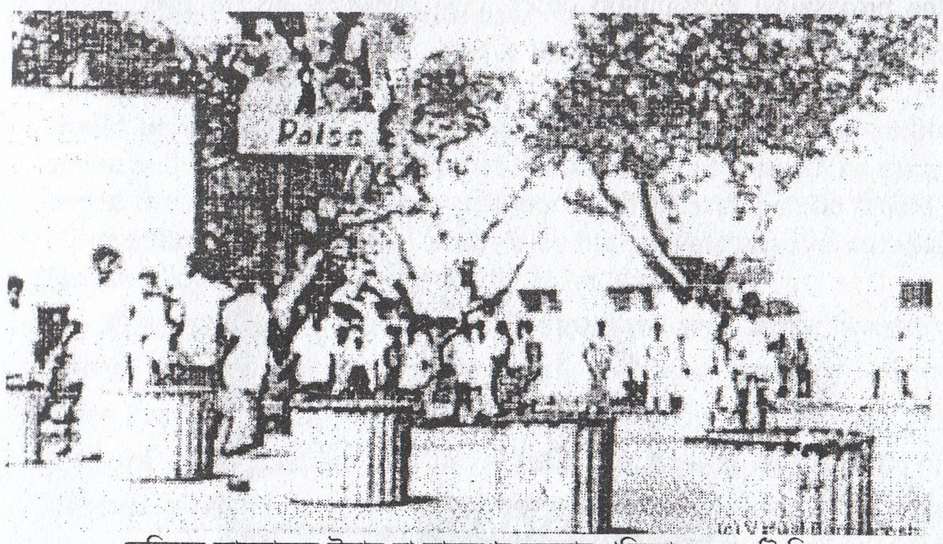
চললো দুরন্ত সাইক্লোনের ন্যায় প্রচণ্ড গতিতে। সামনে যাই আসুক ভয় নেই। দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় টপকে চল। দুস্তর প্রান্তরে ছুটে চল। ফুসে ওঠা সাগরে ভাসাও কিস্তি সেনাপতি মুসার মতো। যেন চলার নেশায় পেয়েছে পুরো জাতিকে। এবার ওরা দুরন্ত, দুর্নিবার। দিনকে দিন অবস্থার অবনতি হতে লাগলো। চট্টগ্রামের অবস্থা হলো বেহাল।



৩ ও ৪ মার্চ সেখানে গুলিতে ১২০ জন নিহত এবং ৩৩৫ জন আহত। খুলনায়ও সেনাবাহিনী গুলি করলে ২২ জন আহত এবং ৬ জন নিহত হয়। যেন পাকিস্তানিরা হত্যার খেলায় মেতে উঠেছে।

তখন এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। রাগ এবং অনুরাগে উদ্বেলিত হই অল্পতেই। দেশের চলমান গণআন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। প্রায়ই রেডিও নিয়ে বসি, কি হচ্ছে জানার জন্য। যোগাযোগ করি বন্ধুদের সাথে। সামরিক জান্তার কারফিউ আর গুলির খবরে আমরা উদ্বিগ্ন। দেখি উত্তেজিত আলোচনা পথে পথে, পাকিস্তানিরা যশোরে গুলি চালিয়েছে। গুলি হয়েছে সাভারে। এ সময় ৮৯ বছর বয়সে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবি জানালেন। বেতার এবং টেলিভিশন - শিল্পীরা শুধু বেঁকেই বসলেন না সামরিক জান্তাকে সহায়তা করতে বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনরত জনগণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেখতে দেখতে পাকিস্তান বেতার হয়ে গেলো ঢাকা বেতার কেন্দ্র। অজানা অসংখ্য শহীদের গায়েবেনা জানাজা অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন জায়গায়। এরই মধ্যে গুজব আসলো জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দান করা হচ্ছে।

৩ মার্চ জাতীয় সংসদ স্থগিত করার প্রতিবাদে বেলুচিস্তান ন্যাপ (ওয়ালি) ১২ মার্চ সারা পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেন। তিনিই একমাত্র পাকিস্তানি নেতা যিনি শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ঐ সময় টিক্কা খান



সেদিনের আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশের জনতার প্রতিরোধের একটি চিত্র

এক নিষ্ঠুর লোক নামে সকলের কাছে পরিচিতি। এ নামের সাথে মিশে আছে আমাদের আতঙ্ক আর ঘৃণা। গুজব ছিল সে আসলে ঢাকা ভার্সিটি মাটিতে মিশিয়ে দেবে। অথচ ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। একে মিটায় সাধ্য কার? শেষমেষ সকল



নিষ্ঠুর ঘাতক - জেনারেল টিক্কা খান

গুজবের অবসান ঘটিয়ে টিক্কা খান ঢাকায় আগমন করলেন। তাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েই ঢাকায় পাঠানো হলো। ৬ মার্চ ক্যাবিনেট ডিভিশনের নোটিফিকেশনে বলা হলো – The President and chief martial law administrator has been pleased to appoint Lt Gen Tikka Khan, S. PK, as governnor of East Pakistan in persuance of the proclamation of the 25th day of March 1969, read with the provisional constitution order. (সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ.৩৮৮)।




জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী খান

এই লোকের নামের সাথে বাঙালির ক্রোধ এবং ঘৃণা মিশ্রিত। তাকে পাঠানো হয় জেগে উঠা বিক্ষুব্ধ বাঙালিকে শৃঙ্খলে বাঁধতে। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো



পরিবর্তন হবে ভেবে থাকলে শাসক গোষ্ঠী ভুল করেছে। ঐ সময় সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ইস্তফা নিলেন নিজের দায়িত্ব থেকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ তারিখে এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের জনগণকে দুস্কৃতকারী হিসাবে আখ্যায়িত করলেন। তবে তার সাথে সাথে পুনরায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের ঘোষণা দিলেন। এ সম্পর্কে *কিসিংস কনটেম্পরারি আরকাইভস* লিখেছে : Broadcasting on March 6, President Yahya expressed his "sincere hope that this decision will elicit a patriotic and constructive response from our political leaders" (KCA, PP24566). পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির নেতা সম্পর্কে আর্কাইভস লিখছে : "Mr. Bhuto told a press conference in Rawalpindi on March 6, that the PPP would attend the National Assembly convened for March 25, and intimated that his party was ready to reopen a dialogue with the Awami League on the question of the constitution" (KCA. pp-24566)

এ সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও দু'একজন পাকিস্তানি পলিটিশিয়ান অবস্থা আয়ত্তে রাখার প্রয়াস পেলেন। যেমন এয়ার মার্শাল আসগর খান আসলেন ঢাকা ৫ মার্চ। দেখা করলেন বঙ্গবন্ধুর সাথে তার ৩২ নং বাস ভবনে। বঙ্গবন্ধুর সাথে তার যে আলোচনা হয় সে সম্পর্কে তিনি পরবর্তীতে আলোকপাত করেন *Generals in politics* নামক গ্রন্থে। সে আলোচনা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন – "I asked Sheik Mujibur Rahman what scenario he visualised and how the stalemate could be broken. He replied that the situation was very clear. Yahya Khan would come to Dhaka frist, followed by M M Ahmed (Head of the planning commission), who would be followed by Bhutto. Yahya Khan would then order military action and that would be the end of Pakistan. About himself, he said, he hoped that he would be taken prisoner for if he was not, he would be killed either by the Pakistan Army or by his own people. It is surprising that the sequence was almost exactly as his forecast."

মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে চলে এলাম মার্চের দিনগুলিতে। শুনলাম সেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের কথা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাই হয়ে গেলো সে দিনটিতে। স্লোগান আর পতাকায় পতাকায় ছেয়ে গেলো রেসকোর্স। পতাকাতো নয়, যেন টুকরো টুকরো সোনায় ঋদ্ধ, সবুজের পটভূমিতে উদীয়মান সূর্যের মাঝে ভেসে উঠেছে বাংলাদেশ। সেনানিবাসে থেকে সামান্য হলেও এর উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছিল। এ উদ্দাম, জনতার উত্তাল ঢেউ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। স্লোগানে সংযোজিত হলো নতুন কিছু শব্দ, কিছু বাক্য। যেমন : তোমার দেশ আমার দেশ–বাংলাদেশ বাংলাদেশ, পরিষদ না রাজপথ–রাজপথ রাজপথ, ঘরে ঘরে দুর্গ গড় – বাংলাদেশ স্বাধীন করো, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর – বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ভুট্টোর মুখে লাথি মারো – বাংলাদেশ স্বাধীন করো ইত্যাদি।




একাত্তরের মার্চে দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায় জেগে উঠে বাংলাদেশ

বাংলার পতাকা। সাথে সাথে বাঙালি সৈনিক, ইপিআর ও পুলিশকে পাকিস্তানিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আহবান জানানো হলো। যদিও সুশৃঙ্খল বাহিনীর জন্য চট করে দলত্যাগ করা ততোটা সোজা নয়। ফলে আহবানের সাথে সাথেই কোনো প্রকাশ্য সাড়া পাওয়া গেলো না। সিএসপি এবং ইপিসিএস অফিসারবৃন্দ জননেতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। বাঙালিরা সে দিনগুলোয় তাদের সত্যিকারের পথ চিনতে ভুল করেনি।

হালে বসা মাল্লার দিকে তখন সাতকোটি বাঙালির ভালোবাসার হাত প্রসারিত। শত বিপত্তির মাঝেও এগিয়ে চলেছে একটা জাতি, একটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে। কঠোর নিরাপত্তার মাঝে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসলেন। তার সাথে এলেন জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা, জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল খোদাদাদ খান, জেনারেল মিঠ্ঠা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর, এম এম আহমেদ, জি ডব্লিউ চৌধুরী প্রমুখ। বঙ্গবন্ধু ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর গাড়িতে কালো পতাকা উড্ডীন, শোভিত স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকায়। তাঁকে পাহারারত পুলিশের গাড়িতেও ছিল কালো পতাকা।





জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের মাঝে বঙ্গবন্ধু

পরের দিন ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আড়াই ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠকে মিলিত হলেন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাইফেল প্রশিক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। ঐ প্রশিক্ষণে হয়ত দেশ স্বাধীন হবে না – তবে বঞ্চিতরাও যে বড়োদের চোখ রাঙিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে এ তার এক উজ্জ্বলন্ত প্রমাণ। এর দু'দিন পরে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব অর্ডন্যান্স ফাক্টরি এবং জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাঙালিদের উপর গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিলেন। রক্তে রঞ্জিত হলো রাজপথ।

সেখানে তখন ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দায়িত্বে। ওদের অসন্তোষ বাড়লো। জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে হেড কোয়ার্টার হলেও এ ইউনিটের কোম্পানিগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। যেমন একটা কোম্পানি ময়মনসিংহে, একটা টাঙ্গাইলে। আলফা কোম্পানির তিন প্লাটুন তিন জায়গায়। ততোদিনে সতর্ক হয়ে গেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকরা। অস্ত্র সমর্পণ করে বোকার মতো গুলি হজমের কোনো মানে হয় না। তারা সতর্ক থাকলো। তাদের সাথে রইলো জয়দেবপুরের জনগণের একাত্মতা। এমনকি এ ব্যাটালিয়নের কাছে অতিরিক্ত যে পুরনো অস্ত্র ছিল জনগণের বাধার মুখেও তাও জমা দেয়া হলো না। এখানে ব্যর্থ হলো পাকিস্তানিদের সে চেষ্টা। আক্ষরিক অর্থে সূচনা হয়ে গেলো একটি সুদূর প্রসারী সশস্ত্র সংগ্রামের।

প্রায় রোজই ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক হচ্ছে। ২১ মার্চও বাদ গেলো না। সহাস্য বদনে সেদিন বঙ্গবন্ধু বললেন – সংকট সমাধানের পথে এগুচ্ছেন তাঁরা। ঐ দিন ভুট্টো ১২ জন সহকর্মীসহ ঢাকায় এসে হাজির। উঠলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। আলোচনা করলেন ইয়াহিয়ার সাথে। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হলো ভুট্টোর জন্য। পরে দৈনিক সংগ্রামের সাংবাদিককে তিনি বললেন – সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে এখন শুধু এটুকুই বলতে পারি। এ কথাটা যে কতোটা ইঙ্গিতবহ ছিল তা এদেশবাসী ক'দিন পরেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। আসলে তিনি এদেশবাসীকে ক্রীতদাস বানাবার সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে ফেলেছেন বলেই ধরে নিয়েছিলেন।



আলোচনা শেষে ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমান

২২ মার্চ ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমান আবার আলোচনায় মিলিত হলেন। বঙ্গবন্ধু মাঝে মাঝে যে আশাবাদী হয়ে উঠছেন তা তাঁর কথাতেই বোঝা গেলো। বললেন – আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ করেই আবার ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চে তাঁর ঘোষিত জাতীয় পরিষদের বৈঠকে স্থগিত ঘোষণা করলেন। ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নং বাসভবনে প্রত্যুষেই বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করলেন। সে-দিনের পূর্ব পাকিস্তানের কোথায়ও পাকিস্তানি পতাকা উড়েনি। স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন দূতাবাসেও। তখন বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ নেই, স্বাধীনতা পাগল এক দুর্জয় মহাসাগর। যেন যে কোনো সময় প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দেবার বাসনায় উদ্যত, উন্মুখ। ২৪ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে

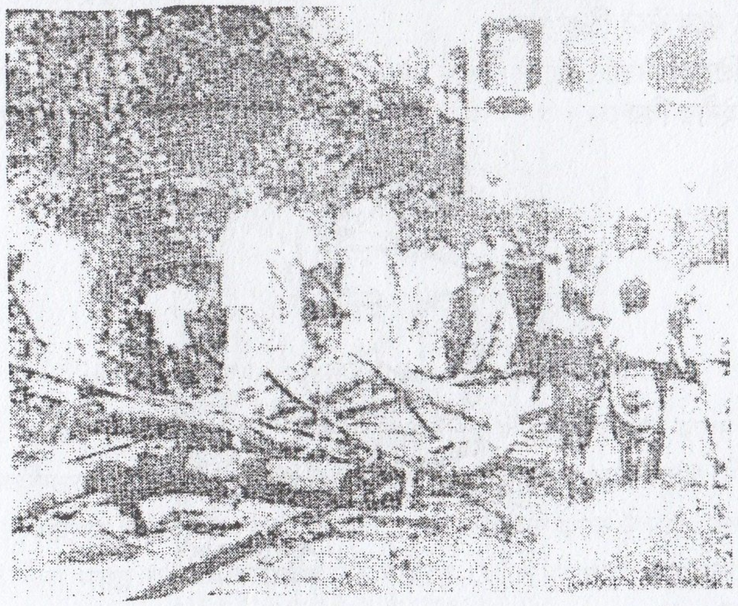




অপরিণামদর্শী সেনানায়ক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি মিলিটারি তাণ্ডব শুরু করে দেয়। ঢাকা হয়ে যায় অঙ্গারের মতো। উত্তপ্ত হয়ে উঠে স্লোগানে স্লোগানে। তখন উত্তপ্ত এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। মিছিলের স্রোত গড়িয়ে চলছে অলিতে গলিতে লাভার মতো। বাঙালি সেনারা হাত মেলাচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনতার সাথে।

জনতার স্বতঃস্ফূর্ততা আরো বাড়িয়ে দিল, তাদের আরো সাহসী হতে উদ্যম যোগাল বাঙালি বীর যোদ্ধাদের সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু পাঁক হানাদারদের সাথে হাত মিলালো অবাঙালিরা। ঘাতকের চোখে খুনের উন্মাদনা। আর সাত কোটি



হামলা হলে রুখতে হবে - একাত্তরের রাস্তায় রাস্তায় গড়ে উঠা গণপ্রতিরোধ

জনতার বঞ্চিত চোখে স্বাধীনতার ব্যাগ্র হাতছানি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আপামর জনতা। সব যেন এক দেহ, এক প্রাণ। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাদের বলিষ্ঠ সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়েছেন জনতার কাতারে। কাজেই ত্যাগের বিনিময়ে হলেও নিশ্চিত বিজয়ের আশায় ভয় মিশানো আনন্দের তরঙ্গে দুলছে পুরো জাতি, প্রতিটি অন্তর এবং বাংলার প্রতিটি প্রান্তর।



২৫ মার্চের সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলে গেলেও মিঠ্ঠা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যেতে হলো। তবে নিরপরাধ অস্ত্রহীন বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের উপর নিষ্ঠুরতার অপর নাম হয়ে উঠে টিক্কা খান। টিক্কা খানের নাম মুখে মুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার সর্বত্র। এককালে বাংলার দুষ্ট শিশুদের শান্ত করতে মা বর্গীদের ভয় দেখাতেন। কিন্তু একাত্তরের টিক্কা খান বর্গীদের হার মানিয়ে দেয়। হয়ে উঠে দস্যু টিক্কা। একাত্তরের এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ নিয়াজি এসে দায়িত্বে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত টিক্কা খান নামের প্রচারণা তুঙ্গে। তখন পর্যন্ত টিক্কা খানের বর্বরতার কথা ছড়ায় মুখে মুখে। এম আর আকতার মুকুলের চরমপত্রের মধ্যমণি হয়ে উঠে টিক্কা খান।

এপ্রিলে নিয়াজি এসে তৈরি করে রাজাকার। যাদের নিয়োগ করা হলো মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যেই মরুক দু'দিকেই



লে. জেনারেল আমির আব্দুলাহ খান নিয়াজি



বাঙালি নিধন। নিয়াজি এক সময় অহঙ্কার করে বলতেন, "Dhaka will fall one my dead body". কিন্তু সেই ঢাকাতেই তিনি যুদ্ধবন্দি হয়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হন। সেতো পরের কথা কিন্তু পঁচিশে মার্চের রাতে খোদ প্রেসিডেন্টের ঢাকা ছাড়ার আগে জন্ম নিয়েছে অপারেশন সার্চ লাইট। এদেশে জঘন্যতম গণহত্যার নীল নক্সা।

অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনার বিষয়টি ঘটে সাদা মাটা ভাবে যাতে কেউ টের না পায়। যখন নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে মিলিটারি অ্যাকশনের পরিকল্পনা করা হয় তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী কোনো কোনো সামরিক কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এদের মধ্যে পড়ে যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান।

তো পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেলো। বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনার পুরোভাগে থাকলেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, জিওসি ১৪ ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। মার্চের ১৭ তারিখে খাদিম হোসেন রাজাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে বলা হয়। অনুমোদনের হোতা ছিলেন



গণহত্যার অন্যতম নায়ক - মে. জে. খাদিম হোসেন রাজা

জেনারেল হামিদ। মার্চের ১৮ তারিখে দুষ্টের দোসরদের দেখা হলো চেয়ার টেবিলে অফিসকক্ষে। খাদিম হোসেন রাজা তার অফিস কক্ষে বসে বিস্তারিত পরিকল্পনা করলেন আর রাও ফরমান আলী তা নিজের হাতে লিখে ফেললেন। গণহত্যার নীল নক্সা যাতে কোনো ভাবে বাইরে যেতে না পারে সে জন্য এতো সতকর্তা। ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানের পর টিক্কা খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের

জনতার বঞ্চিত চোখে স্বাধীনতার ব্যাগ্র হাতছানি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আপামর জনতা। সব যেন এক দেহ, এক প্রাণ। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাদের বলিষ্ঠ সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়েছেন জনতার কাতারে। কাজেই ত্যাগের বিনিময়ে হলেও নিশ্চিত বিজয়ের আশায় ভয় মিশানো আনন্দের তরঙ্গে দুলছে পুরো জাতি, প্রতিটি অন্তর এবং বাংলার প্রতিটি প্রান্তর।



২৫ মার্চের সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলে গেলেও মিঠ্ঠা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যেতে হলো। তবে নিরপরাধ অস্ত্রহীন বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের উপর নিষ্ঠুরতার অপর নাম হয়ে উঠে টিক্কা খান। টিক্কা খানের নাম মুখে মুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার সর্বত্র। এককালে বাংলার দুষ্ট শিশুদের শান্ত করতে মা বর্গীদের ভয় দেখাতেন। কিন্তু একাত্তরের টিক্কা খান বর্গীদের হার মানিয়ে দেয়। হয়ে উঠে দস্যু টিক্কা। একাত্তরের এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ নিয়াজি এসে দায়িত্বে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত টিক্কা খান নামের প্রচারণা তুঙ্গে। তখন পর্যন্ত টিক্কা খানের বর্বরতার কথা ছড়ায় মুখে মুখে। এম আর আকতার মুকুলের চরমপত্রের মধ্যমণি হয়ে উঠে টিক্কা খান।

এপ্রিলে নিয়াজি এসে তৈরি করে রাজাকার। যাদের নিয়োগ করা হলো মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যেই মরুক দু'দিকেই



লে. জেনারেল আমির আব্দুলাহ খান নিয়াজি



বাঙালি নিধন। নিয়াজি এক সময় অহঙ্কার করে বলতেন, "Dhaka will fall one my dead body". কিন্তু সেই ঢাকাতেই তিনি যুদ্ধবন্দি হয়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হন। সেতো পরের কথা কিন্তু পঁচিশে মার্চের রাতে খোদ প্রেসিডেন্টের ঢাকা ছাড়ার আগে জন্ম নিয়েছে অপারেশন সার্চ লাইট। এদেশে জঘন্যতম গণহত্যার নীল নক্সা।

অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনার বিষয়টি ঘটে সাদা মাটা ভাবে যাতে কেউ টের না পায়। যখন নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে মিলিটারি অ্যাকশনের পরিকল্পনা করা হয় তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী কোনো কোনো সামরিক কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এদের মধ্যে পড়ে যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান।

তো পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেলো। বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনার পুরোভাগে থাকলেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, জিওসি ১৪ ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। মার্চের ১৭ তারিখে খাদিম হোসেন রাজাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে বলা হয়। অনুমোদনের হোতা ছিলেন



গণহত্যার অন্যতম নায়ক - মে. জে. খাদিম হোসেন রাজা

জেনারেল হামিদ। মার্চের ১৮ তারিখে দুষ্টের দোসরদের দেখা হলো চেয়ার টেবিলে অফিসকক্ষে। খাদিম হোসেন রাজা তার অফিস কক্ষে বসে বিস্তারিত পরিকল্পনা করলেন আর রাও ফরমান আলী তা নিজের হাতে লিখে ফেললেন। গণহত্যার নীল নক্সা যাতে কোনো ভাবে বাইরে যেতে না পারে সে জন্য এতো সতকর্তা। ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানের পর টিক্কা খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের

কোথায় ছিল এতো লোক, কোথাও তিল ধরনের ঠাঁই নেই। রেসকোর্স কানায় কানায় পূর্ণ। ঠিক ৩-২০ মি. বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উঠে এলেন। শুরু হলো ঐতিহাসিক ভাষণ। ভাষণে তিনি উপস্থিত জনসমুদ্রের কাছে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহবান জানালেন। ভাষণের শেষ বাক্য দুটি সুস্পষ্ট, ইঙ্গিতবহ এবং conclusive. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ চলার সময়



ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্সে উপচে উঠা জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু

টিক্কা খান এবং রাও ফরমান আলী ঢাকার মাটিতে। জেনারেল টিক্কাকে সামরিক শাসক ও গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দান করা হলেও তাকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে কোনো বিচারপতিকে পাওয়া গেলো না। কাজেই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের সময় দীর্ঘায়িত হতে থাকলো।

আমার স্মৃতিতে ৭ মার্চের কথা চিরদিন উজ্জ্বল ও শাশ্বত আলোকবর্তিকা হয়ে আছে এবং থাকবে। মনে পড়ে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ পরের দিন বেতারে প্রচার করা হয়। বেতার কর্মীদের চাপের মুখেই সরকার এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। কারণ কর্মীদের অসহযোগিতার কারণে পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে বেতারের প্রচার কার্যক্রম। জেগে গেলো বাংলাদেশ, যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে কোনো বিহঙ্গ। ফুলে



ফেঁপে বৈশাখের উন্মত্ত পদ্মার মতো বয়ে চললো গণজোয়ার। মানুষ দেহের শক্তিতে নয়, চলে মনের শক্তিতে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে উঠে দাঁড়ালো সাত কোটি




উত্তাল একাত্তর - একবাক্যে বঙ্গবন্ধুর আদেশ মেনে নিল বাংলাদেশ

বাঙালির বাংলাদেশ। সেই সময়টাতে শাসক গোষ্ঠী যাত্রীবাহী বিমানের সকল সাধারণ চলাচল বন্ধ করে মিলিটারি হার্ডওয়্যার এবং সৈন্যসামন্ত আনতে শুরু করলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। জাহাজে করে আসছে সেনাবাহিনী। সংলাপের কথা বলে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে ধোঁকা দিয়ে রণসজ্জায় সজ্জিত হতে থাকলো। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্রিটিশ ও জার্মানির ১৭৮ জন নাগরিক ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন। জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে কে-ই বা ভিন দেশে কাজ করতে চায়।

বাঙালি জেগে গেছে। তাদের কাছে আর কিছু লুকানো ছুপানো নেই। সদা সতর্ক তারা। কথায় কথায় শাসকের গুলিতে মাঝে মধ্যেই রঞ্জিত হচ্ছে রাজপথ। কিন্তু জেগে ওঠা তরুণ, কৃষক, পেশাজীবী, আর ছাত্রদের ঘুম পাড়াবার মতো অতো শত বুলেট শাসক গোষ্ঠীর নেই। বাংলাদেশ তখন চলেছে জননেতার ইচ্ছে মতো। সকল দপ্তর বন্ধ কিন্তু কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে ঠিকঠাক। সরকারের সকল কর পরিশোধ প্রক্রিয়া স্থগিত। সরকারি কর্মচারীরা চলছেন বঙ্গবন্ধুর হুকুমে।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে সকল বাড়ি এবং গাড়িতে কালো পতাকা ব্যবহার শুরু করেছে সবাই। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকার পাশাপাশি উত্তোলিত হলো বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন




একাত্তরের মার্চে দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায় জেগে উঠে বাংলাদেশ

বাংলার পতাকা। সাথে সাথে বাঙালি সৈনিক, ইপিআর ও পুলিশকে পাকিস্তানিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আহবান জানানো হলো। যদিও সুশৃঙ্খল বাহিনীর জন্য চট করে দলত্যাগ করা ততোটা সোজা নয়। ফলে আহবানের সাথে সাথেই কোনো প্রকাশ্য সাড়া পাওয়া গেলো না। সিএসপি এবং ইপিসিএস অফিসারবৃন্দ জননেতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। বাঙালিরা সে দিনগুলোয় তাদের সত্যিকারের পথ চিনতে ভুল করেনি।

হালে বসা মাল্লার দিকে তখন সাতকোটি বাঙালির ভালোবাসার হাত প্রসারিত। শত বিপত্তির মাঝেও এগিয়ে চলেছে একটা জাতি, একটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে। কঠোর নিরাপত্তার মাঝে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসলেন। তার সাথে এলেন জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা, জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল খোদাদাদ খান, জেনারেল মিঠ্ঠা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর, এম এম আহমেদ, জি ডব্লিউ চৌধুরী প্রমুখ। বঙ্গবন্ধু ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর গাড়িতে কালো পতাকা উড্ডীন, শোভিত স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকায়। তাঁকে পাহারারত পুলিশের গাড়িতেও ছিল কালো পতাকা।





জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের মাঝে বঙ্গবন্ধু

পরের দিন ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আড়াই ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠকে মিলিত হলেন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাইফেল প্রশিক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। ঐ প্রশিক্ষণে হয়ত দেশ স্বাধীন হবে না – তবে বঞ্চিতরাও যে বড়োদের চোখ রাঙিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে এ তার এক উজ্জ্বলন্ত প্রমাণ। এর দু'দিন পরে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব অর্ডন্যান্স ফাক্টরি এবং জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাঙালিদের উপর গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিলেন। রক্তে রঞ্জিত হলো রাজপথ।

সেখানে তখন ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দায়িত্বে। ওদের অসন্তোষ বাড়লো। জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে হেড কোয়ার্টার হলেও এ ইউনিটের কোম্পানিগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। যেমন একটা কোম্পানি ময়মনসিংহে, একটা টাঙ্গাইলে। আলফা কোম্পানির তিন প্লাটুন তিন জায়গায়। ততোদিনে সতর্ক হয়ে গেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকরা। অস্ত্র সমর্পণ করে বোকার মতো গুলি হজমের কোনো মানে হয় না। তারা সতর্ক থাকলো। তাদের সাথে রইলো জয়দেবপুরের জনগণের একাত্মতা। এমনকি এ ব্যাটালিয়নের কাছে অতিরিক্ত যে পুরনো অস্ত্র ছিল জনগণের বাধার মুখেও তাও জমা দেয়া হলো না। এখানে ব্যর্থ হলো পাকিস্তানিদের সে চেষ্টা। আক্ষরিক অর্থে সূচনা হয়ে গেলো একটি সুদূর প্রসারী সশস্ত্র সংগ্রামের।

প্রায় রোজই ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক হচ্ছে। ২১ মার্চও বাদ গেলো না। সহাস্য বদনে সেদিন বঙ্গবন্ধু বললেন – সংকট সমাধানের পথে এগুচ্ছেন তাঁরা। ঐ দিন ভুট্টো ১২ জন সহকর্মীসহ ঢাকায় এসে হাজির। উঠলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। আলোচনা করলেন ইয়াহিয়ার সাথে। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হলো ভুট্টোর জন্য। পরে দৈনিক সংগ্রামের সাংবাদিককে তিনি বললেন – সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে এখন শুধু এটুকুই বলতে পারি। এ কথাটা যে কতোটা ইঙ্গিতবহ ছিল তা এদেশবাসী ক'দিন পরেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। আসলে তিনি এদেশবাসীকে ক্রীতদাস বানাবার সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে ফেলেছেন বলেই ধরে নিয়েছিলেন।



আলোচনা শেষে ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমান

২২ মার্চ ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমান আবার আলোচনায় মিলিত হলেন। বঙ্গবন্ধু মাঝে মাঝে যে আশাবাদী হয়ে উঠছেন তা তাঁর কথাতেই বোঝা গেলো। বললেন – আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ করেই আবার ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চে তাঁর ঘোষিত জাতীয় পরিষদের বৈঠকে স্থগিত ঘোষণা করলেন। ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নং বাসভবনে প্রত্যুষেই বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করলেন। সে-দিনের পূর্ব পাকিস্তানের কোথায়ও পাকিস্তানি পতাকা উড়েনি। স্বাধীন বাংলার পতাকা শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন দূতাবাসেও। তখন বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ নেই, স্বাধীনতা পাগল এক দুর্জয় মহাসাগর। যেন যে কোনো সময় প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দেবার বাসনায় উদ্যত, উন্মুখ। ২৪ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে

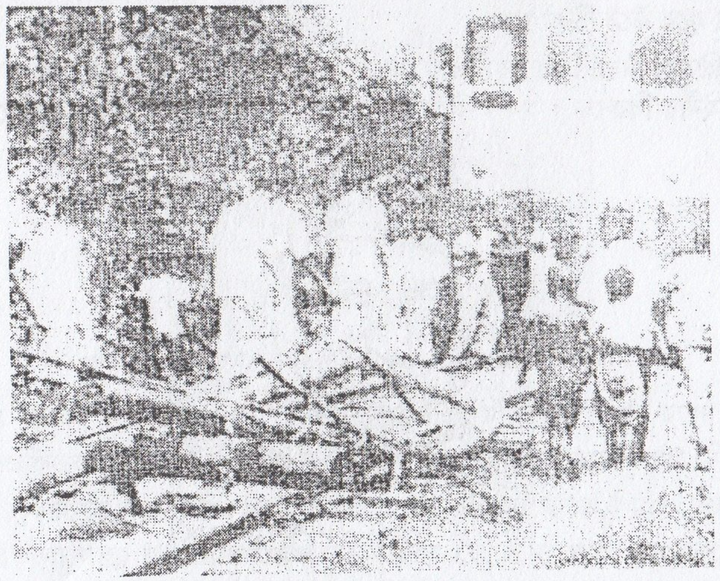




অপরিণামদর্শী সেনানায়ক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি মিলিটারি তাণ্ডব শুরু করে দেয়। ঢাকা হয়ে যায় অঙ্গারের মতো। উত্তপ্ত হয়ে উঠে স্লোগানে স্লোগানে। তখন উত্তপ্ত এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। মিছিলের স্রোত গড়িয়ে চলছে অলিতে গলিতে লাভার মতো। বাঙালি সেনারা হাত মেলাচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনতার সাথে।

জনতার স্বতঃস্ফূর্ততা আরো বাড়িয়ে দিল, তাদের আরো সাহসী হতে উদ্যম যোগাল বাঙালি বীর যোদ্ধাদের সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু পাঁক হানাদারদের সাথে হাত মিলালো অবাঙালিরা। ঘাতকের চোখে খুনের উন্মাদনা। আর সাত কোটি



হামলা হলে রুখতে হবে - একাত্তরের রাস্তায় রাস্তায় গড়ে উঠা গণপ্রতিরোধ

জনতার বঞ্চিত চোখে স্বাধীনতার ব্যাগ্র হাতছানি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আপামর জনতা। সব যেন এক দেহ, এক প্রাণ। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাদের বলিষ্ঠ সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়েছেন জনতার কাতারে। কাজেই ত্যাগের বিনিময়ে হলেও নিশ্চিত বিজয়ের আশায় ভয় মিশানো আনন্দের তরঙ্গে দুলছে পুরো জাতি, প্রতিটি অন্তর এবং বাংলার প্রতিটি প্রান্তর।



২৫ মার্চের সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলে গেলেও মিঠ্ঠা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যেতে হলো। তবে নিরপরাধ অস্ত্রহীন বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের উপর নিষ্ঠুরতার অপর নাম হয়ে উঠে টিক্কা খান। টিক্কা খানের নাম মুখে মুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার সর্বত্র। এককালে বাংলার দুষ্ট শিশুদের শান্ত করতে মা বর্গীদের ভয় দেখাতেন। কিন্তু একাত্তরের টিক্কা খান বর্গীদের হার মানিয়ে দেয়। হয়ে উঠে দস্যু টিক্কা। একাত্তরের এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ নিয়াজি এসে দায়িত্বে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত টিক্কা খান নামের প্রচারণা তুঙ্গে। তখন পর্যন্ত টিক্কা খানের বর্বরতার কথা ছড়ায় মুখে মুখে। এম আর আকতার মুকুলের চরমপত্রের মধ্যমণি হয়ে উঠে টিক্কা খান।

এপ্রিলে নিয়াজি এসে তৈরি করে রাজাকার। যাদের নিয়োগ করা হলো মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যেই মরুক দু'দিকেই



লে. জেনারেল আমির আব্দুলাহ খান নিয়াজি



বাঙালি নিধন। নিয়াজি এক সময় অহঙ্কার করে বলতেন, "Dhaka will fall one my dead body". কিন্তু সেই ঢাকাতেই তিনি যুদ্ধবন্দি হয়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হন। সেতো পরের কথা কিন্তু পঁচিশে মার্চের রাতে খোদ প্রেসিডেন্টের ঢাকা ছাড়ার আগে জন্ম নিয়েছে অপারেশন সার্চ লাইট। এদেশে জঘন্যতম গণহত্যার নীল নক্সা।

অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনার বিষয়টি ঘটে সাদা মাটা ভাবে যাতে কেউ টের না পায়। যখন নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে মিলিটারি অ্যাকশনের পরিকল্পনা করা হয় তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী কোনো কোনো সামরিক কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এদের মধ্যে পড়ে যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান।

তো পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেলো। বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনার পুরোভাগে থাকলেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, জিওসি ১৪ ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। মার্চের ১৭ তারিখে খাদিম হোসেন রাজাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে বলা হয়। অনুমোদনের হোতা ছিলেন



গণহত্যার অন্যতম নায়ক - মে. জে. খাদিম হোসেন রাজা

জেনারেল হামিদ। মার্চের ১৮ তারিখে দুষ্টের দোসরদের দেখা হলো চেয়ার টেবিলে অফিসকক্ষে। খাদিম হোসেন রাজা তার অফিস কক্ষে বসে বিস্তারিত পরিকল্পনা করলেন আর রাও ফরমান আলী তা নিজের হাতে লিখে ফেললেন। গণহত্যার নীল নক্সা যাতে কোনো ভাবে বাইরে যেতে না পারে সে জন্য এতো সতকর্তা। ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানের পর টিক্কা খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের

জনতার বঞ্চিত চোখে স্বাধীনতার ব্যাগ্র হাতছানি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আপামর জনতা। সব যেন এক দেহ, এক প্রাণ। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাদের বলিষ্ঠ সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়েছেন জনতার কাতারে। কাজেই ত্যাগের বিনিময়ে হলেও নিশ্চিত বিজয়ের আশায় ভয় মিশানো আনন্দের তরঙ্গে দুলছে পুরো জাতি, প্রতিটি অন্তর এবং বাংলার প্রতিটি প্রান্তর।



২৫ মার্চের সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলে গেলেও মিঠ্ঠা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যেতে হলো। তবে নিরপরাধ অস্ত্রহীন বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের উপর নিষ্ঠুরতার অপর নাম হয়ে উঠে টিক্কা খান। টিক্কা খানের নাম মুখে মুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার সর্বত্র। এককালে বাংলার দুষ্ট শিশুদের শান্ত করতে মা বর্গীদের ভয় দেখাতেন। কিন্তু একাত্তরের টিক্কা খান বর্গীদের হার মানিয়ে দেয়। হয়ে উঠে দস্যু টিক্কা। একাত্তরের এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ নিয়াজি এসে দায়িত্বে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত টিক্কা খান নামের প্রচারণা তুঙ্গে। তখন পর্যন্ত টিক্কা খানের বর্বরতার কথা ছড়ায় মুখে মুখে। এম আর আকতার মুকুলের চরমপত্রের মধ্যমণি হয়ে উঠে টিক্কা খান।

এপ্রিলে নিয়াজি এসে তৈরি করে রাজাকার। যাদের নিয়োগ করা হলো মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যেই মরুক দু'দিকেই



লে. জেনারেল আমির আব্দুলাহ খান নিয়াজি



বাঙালি নিধন। নিয়াজি এক সময় অহঙ্কার করে বলতেন, "Dhaka will fall one my dead body". কিন্তু সেই ঢাকাতেই তিনি যুদ্ধবন্দি হয়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হন। সেতো পরের কথা কিন্তু পঁচিশে মার্চের রাতে খোদ প্রেসিডেন্টের ঢাকা ছাড়ার আগে জন্ম নিয়েছে অপারেশন সার্চ লাইট। এদেশে জঘন্যতম গণহত্যার নীল নক্সা।

অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনার বিষয়টি ঘটে সাদা মাটা ভাবে যাতে কেউ টের না পায়। যখন নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে মিলিটারি অ্যাকশনের পরিকল্পনা করা হয় তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী কোনো কোনো সামরিক কর্মকর্তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এদের মধ্যে পড়ে যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান।

তো পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেলো। বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনার পুরোভাগে থাকলেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, জিওসি ১৪ ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। মার্চের ১৭ তারিখে খাদিম হোসেন রাজাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে বলা হয়। অনুমোদনের হোতা ছিলেন



গণহত্যার অন্যতম নায়ক - মে. জে. খাদিম হোসেন রাজা

জেনারেল হামিদ। মার্চের ১৮ তারিখে দুষ্টের দোসরদের দেখা হলো চেয়ার টেবিলে অফিসকক্ষে। খাদিম হোসেন রাজা তার অফিস কক্ষে বসে বিস্তারিত পরিকল্পনা করলেন আর রাও ফরমান আলী তা নিজের হাতে লিখে ফেললেন। গণহত্যার নীল নক্সা যাতে কোনো ভাবে বাইরে যেতে না পারে সে জন্য এতো সতকর্তা। ভাইস অ্যাডমিরাল আহসানের পর টিক্কা খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের

গভর্নর। সশস্ত্র বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিরস্ত্রীকরণসহ কয়েকটা বিষয় ইয়াহিয়া খান অনুমোদন দিলেন না। কিন্তু গণহত্যার বিষয়ে তার কোনো আপত্তি রইলো না। ২৪ এবং ২৫ মার্চের দিবাভাগে অনুমোদিত পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন গ্যারিসনে পৌঁছে দেয়া হয়। এ কাজটি সরাসরি করেন জেনারেল হামিদ, জেনারেল মিঠ্ঠা, কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এবং কর্নেল ছানাউল্লাহ। দ্রুত কাজ



দুষ্টের দোসর - মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী

সারতে পরিকল্পনাকারীরা ব্যবহার করেন হেলিকপ্টার। তারা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে বিষয়গুলি প্রত্যেক গ্যারিসন কমান্ডার এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের বুঝিয়ে দেন। গণহত্যা বা মিলিটারি ক্র্যাক ডাউন যা-ই বলা হোক, শুরু হবে পঁচিশে মার্চের রাতের ঢাকায়। অন্যান্য গ্যারিসনকে তখন সতর্ক করা হবে। ঢাকায় পুরো অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করবে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।

এক নজরে দেখে নেয়া যাক পূর্ব পাকিস্তানে তখনকার সামরিক শক্তির উপস্থিতি :

ডিভিশন মাত্র ১টি-১৪ পদাতিক ডিভিশন এর অধীনস্ত ৪টি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড। যেমন :



৫৭ পদাতিক ব্রিগেড, ঢাকা, কমান্ডার - ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব

৫৩ পদাতিক ব্রিগেড, কুমিলা, কমান্ডার - ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি

২৩ পদাতিক ব্রিগেড, রংপুর, কমান্ডার - ব্রিগেডিয়ার আব্দুলাহ খান মালিক

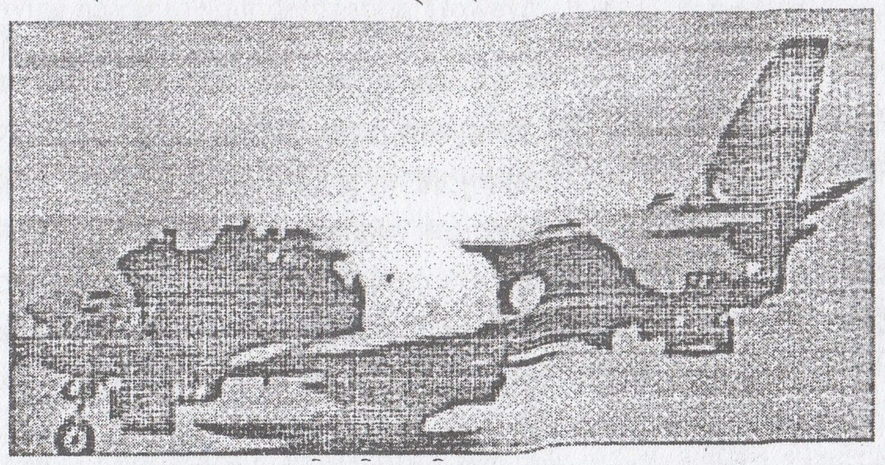
১০৭ পদাতিক ব্রিগেড, যশোর, কমান্ডার - ব্রিগেডিয়ার এস এম দুর্‌রানী

আর কোয়েটায় ১৬ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনকে পূর্ব পাকিস্তানে যাবার জন্য প্রস্তুতির আদেশ দেয়া হয়েছে ইতোমধ্যে।

নেভীর মাত্র ৪টি গানবোট যা রাজশাহী, যশোর, কুমিলা এবং সিলেটে অবস্থান করছে। বাগেরহাটে আছে একটা পেট্রোল বোট। আর যুদ্ধ জাহাজ পিএনএস জাহাঙ্গীর।

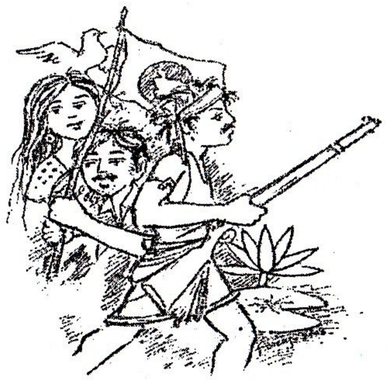
পরিকল্পনায় থাকল অপারেশন শুরু হবার পরে পূর্ব পাকিস্তান সফর করবে পিএনএস বাবর।

বিমান বাহিনীর ছিল মাত্র ২০টি এফ-৮৬ স্যাবর জেট, ৩টি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান। আর্মি এভিয়েশন উইং-এর আছে এক স্কোয়াড্রন হেলিকপ্টার আর ১টা সি-১৩০ হারকিউলিস বিমান যার অবস্থান হলো ঢাকায়।



একাত্তরের পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান এফ - ৮৬ স্যাবর জেট

ঠিক এ সময় ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যশোরে, ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জয়দেবপুরে, ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈয়দপুরে আর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান চট্টগ্রামে। এ ছাড়াও ইবিআরসি'র অবস্থান তখন চট্টগ্রামে যেখানে আছে ২০০০ বাঙালি সৈনিক আর নতুন জন্ম লাভকারী ৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। ট্রেনিং ইউনিট ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন ঢাকায়। ১, ২ এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল বাদে বাকি সব ইউনিটের কমান্ডিং অফিসারগণ পাকিস্তানি।



আমার মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা। ঐ দিনগুলোয় আমাদের সেনাবাহিনী কিভাবে রিঅ্যাক্ট করেছিলেন জানার প্রবল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি। নগর জীবনের ব্যস্ততার সাথে তাল রেখে স্মৃতি রোমন্থনের মতো সময় অনেকেরই নেই। ব্যক্তিগত স্মৃতিও আমাকে নিয়ে যায় বার বার একাত্তরের মার্চে। চারদিকে টান টান উত্তেজনা। আলোচনা ভেঙে পড়ার পর কী ঘটে। ঐ বয়সে রাজনীতি তেমন বুঝি না। তবে এটা বুঝেছিলাম যে, ওরা সহজে ছাড়বে না আমাদের। ওরা মানে পাকিস্তানিদের কথাই বলছি। স্বাভাবিক ভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রাত দশটার মধ্যে। কিন্তু মধ্যরাতের ঘুম ভাঙলো মাইকের কাঁপা কাঁপা ঘোষণায়। পাকিস্তানিরা ঢাকায় বাঙালিদের উপর মরণ ছোবল হেনেছে। নির্বিচারে গণহত্যা করছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পিরোজপুরের মতো ছোট্ট শহরের অলিতে গলিতে রিকশায় করে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছিল আমারই এক সহপাঠী। তার নাম এতোদিনে আর মনে করতে পারছি না। সে রাতের অনেক কথাই পড়েছি বইতে, শুনেছি লোকমুখে, কথায় কথায় দীর্ঘশ্বাসের সাথে শুনেছি কল্পকাহিনীর মতো। ঢাকা থেকে পালানো আত্মীয়-স্বজনের কাছে শুনেছি বহুবার। কুমিল্লায় হারিয়েছি আমার এক আপনজনকে। সেনাবাহিনীতেই ছিলেন তিনি। আর কোনোদিন ফিরে আসেননি। পরে, বহুপরে শহীদদের কাতারে তার নাম সমক্তি করা হয়েছে বি.বাড়িয়া কসবা উপজেলার ইউনিয়নের কোল্লা পাথরে। ওখানকার কথা জানতে মন চায় বৈকি? আমাদের চেতনায় পঁচিশের দুঃখময় বিভীষিকা প্রায় সব সময়ই জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো উত্তাপ ছড়ায়, বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে মন।

কিন্তু সেদিন অন্যান্য যে কোনো সাধারণ দিনের মতোই লেফটেন্যান্ট হোসেন বসে আছেন অফিসে। তাকে উপ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন বদিউল বললেন– তোমাকে বি.বাড়িয়া টেম্পরারি ডিউটিতে যেতে হবে, ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে। তোমার দায়িত্ব বহ route medical cover. অর্থাৎ পথে পথে প্রয়োজনে অসুস্থ সেনা সদস্যের চিকিৎসা।



আর্মিতে আদেশ পেলে আমরা না বলি না। তবে হোসেন সেদিন ডিউটিতে যেতে অনীহা প্রকাশ করলেন। তিনি আগেই উপ-অধিনায়ককে জানিয়ে রেখেছিলেন যে তার বড় ভাইয়ের বিয়ে, এপ্রিলের ৪ কিংবা ৮ তারিখে। সেখানে তার থাকাটা জরুরি। সবাই আশা করবে তাকে সেখানে।

উপ-অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনের প্রয়োজনের কথা শুনলেন। কিন্তু তাঁর তেমন কিছুই করণীয় নেই। তাই সোজা সাপটা বললেন - Don't oppose the duty now. But inform the commanding officer about your requirement when he calls you. কিছুক্ষণ পর ঠিক ঠিকই সিও'র রুমে ডাক পড়লো নবীন অফিসার আবুল হোসেনের। অধিনায়ক তাকে দু'একটা ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন- Ok, you go. I hope you will enjoy your stay at Brahmonbaria.

হোসেন ভাবলেন, এখনই সময়। তুললেন বড় ভাইয়ের বিয়ের কথা। বললেন - স্যার, ঐ সময়টাতে আমার ক'দিনের ছুটির দরকার হবে। কথাটা আপনাকে জানিয়েছিলাম।

সিও তার দিকে তাকালেন আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে। বললেন - You are moving nearer to your destination. However, if necessary, I shall talk to your Commanding Officer so that you can avail few days of leave at that time.

তিনি সিও'র রুম থেকে বের হয়ে এলেন ফুর ফুরে মন নিয়ে । তারপর ডায়াল করলেন ৪ ইস্ট বেঙ্গলে। ধরলেন অ্যাডজুটেন্ট। তিনি হোসেনকে বললেন - You comfortably come by 3 o'clock in the afternoon.

অস্থায়ী কর্তব্যে যাবার প্রস্তুতি ছাড়া সেদিন আর কোনো কাজ নেই হোসেনের হাতে। তাই ফিরে এলেন মেসে। হালকা কিছু জিনিসপত্র নিলেন সাথে। বেশির ভাগই রয়ে যাচ্ছে হানিমুন লজে। ফিরে আসার পর আবার এখানেই তো উঠতে হবে! এক সময় লেফটেন্যান্ট ইমামের সাথে দেখা হলো। দু'জনে কথা হলো কিছুক্ষণ। ইমাম কখনোই পাকিস্তানিদের কথা সহ্য করতে পারতেন না। কারণ নিশ্চয় ছিল। অসহিষ্ণুতা এক দিনে হয় না। হোসেন ক্যান্টনমেন্টে বলতে গেলে নতুন। তাছাড়া পাকিস্তানিদের সাথে তার Interaction তেমন একটা হয়নি। অত অল্প সময়ে সুযোগও তেমন একটা ঘটেনি। কাজেই ইমাম যেটা অনুভব করতে পেরেছেন সেদিনের লেফটেন্যান্ট হোসেন তা পারেননি। কথায় কথায় একাত্তরের তরুণ লেফটেন্যান্ট ইমামকে বললেন – ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাচ্ছি টেম্পরারি ডিউটিতে। কথাটা শুনে খুশি হলেন ইমামুজ্জামান। তাঁর অভিব্যক্তি স্পষ্ট। বললেন : ভালই হলো। আপনি ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে বাইরে যাচ্ছেন, ভাল থাকবেন ।

ইমামের দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন নবীন অফিসার। জিজ্ঞেস করলেন – একথা কেন বললেন?

না এমনিতেই। আসলে কখন যে কি হয় বলা যায় না। ক্যাজুয়ালি জবাব দিলেন ইমামুজ্জামান। তার কথায় কী আসলে কোনো ঝড়ের পূর্বাভাস লুকানো ছিল।

দেখতে দেখতে হোসেনের যাবার সময় হয়ে এলো। অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে হানিমুন লজে। এবার যেতে হবে তাকে। সাথে নিলেন নিত্য ব্যবহার্য সামান্য কিছু জিনিসপত্র, যা গুছিয়েছিলেন। তারপর সোজা গিয়ে উঠে বসলেন অপেক্ষমাণ অ্যাম্বুলেন্সে। গাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করলো। চলতে চলতে একবার ফিরে দেখলেন ছায়া অরণ্য ঢাকা হানিমুন লজ। একদম নিরিবিলি, এখানে পাখির ডাকে ভোর দু'হাত বাড়ায় দিনের প্রথম আলোর দিকে। A sweet home. আসলে তখন তিনি একদমই ভাবতে পারেননি যে এ এক দীর্ঘ যাত্রার সবে মাত্র শুরু।

অ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে চললো। অল্প একটু জায়গা। কয়েক মিনিটেই তিনি ৪ ইস্ট বেঙ্গলের লোকেশনে পৌঁছে গেলেন। সেখানে দেখলেন সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কনভয়। লোকজনও বসে গেছে গাড়িতে। সবাই প্রস্তুত যাত্রার জন্য। বাকি শুধু শেষ আদেশের। যে কোনো সময় শুরু হবে এগিয়ে চলা। লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন নামলেন অ্যাম্বুলেন্স থেকে। নেমে হাঁটতে শুরু করলেন অ্যাডজুটেন্টের অফিসের দিকে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে দেখলেন ইউনিটের সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত খান এবং ব্রিগেড মেজর (বিএম) মেজর সুলতান জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন, উভয়েই, হাপুস হুপুশ শব্দে। এ যেন সিনেমার যবনিকপাতের পূর্বের কোনো দৃশ্য।

বলতে বলতে মাথা নাড়ালেন মুক্তিযোদ্ধা হোসেন। খানিকটা থেমে বললেন – Yes Mahmud, actually they were crying.

এ দৃশ্য তাকে বেশ অবাক করলো। তবে তিনি দাঁড়ালেন না। পৌঁছে গেলেন অ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন গাফফারের কাছে। আসলে হোসেন তার উপস্থিতি জানাতেই অ্যাডজুটেন্টের কাছে উপস্থিত হলেন। অ্যাডজুটেন্ট তাকে বললেন - এসেছো, ভাল হয়েছে। Just wait, বলে আবার তড়িঘড়ি করে বেড় হয়ে গেলেন তিনি। ফিরে এলেন চক্কর শেষ করে। এটা তাঁর কনভয় মুভ করার আগের শেষ চেকিং। কাজেই অ্যাডজুটেন্ট ব্যস্ত। তিনি ফিরে আসতে হোসেন জিজ্ঞেস করলেন – সিও আর বিএম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন, কি ব্যাপার? অ্যাডজুটেন্ট আবেগহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন- There must be some reasons. পরে বুঝবে। তিনি আর কিছু খোলাসা করে বললেন না। আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করার সময়ও এটা নয়।

মার্চের শেষ লগ্নে কুমিল্লা সেনানিবাসের অবস্থা কেমন ছিল তা জানা দরকার। প্রশ্নের জবাবে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা জানালেন যে তার কাছে তেমন কোনো পরিবর্তন মনে হয়নি। সেনানিবাসের অভ্যন্তর একদম শান্ত। যেমন মার্চের



প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তারা বাই-রোটেশন ব্রিগেডে ডিউটি অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে একদিনের কথা তাঁর বেশ মনে পড়ে। যথারীতি ডিউটি রুমে বসে ছিলেন তিনি। টেলিফোনে রিং বাজতেই রিসিভার তুললেন। ওপাশ থেকে কেউ একজন তাঁর কাছে জানতে চাইলো - Who is speaking ? তিনি বললেন - I am Lt Abul Hossain. ওপাশ থেকে আবার কেউ জানতে চাইলো - What are you doing there? স্বাভাবিক ভাবে তিনি বললেন - I am doing my duty as the duty officer of the day. ওপাশ থেকে জবাব এলো - এইছা বলনা চাহিয়ে।

হোসেন অবশ্য পরে জেনেছেন উনিই ব্রিগেড কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার শফি। বিএম মেজর সুলতান পরের দিন এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন। উপদেশ দিয়েছেন কি ভাবে প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

তবে হ্যাঁ, ক্যান্টনমেন্টের সিকিউরিটি বাড়ানো হয়েছে বেশ। নবীন অফিসারবৃন্দ রাতে মেস থেকে হানিমুন লজে ফেরার পথে সেটা স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছে তাদের। দেখেছেন মোবাইল পেট্রোল। তাছাড়া আর তেমন কোনো কিছু আর চোখে পড়েনি তাদের। এমনকি মনেও আসেনি। কথায় কথায় জানলাম একাত্তরের বি. বাড়িয়ার এ মুভে পুরো ব্যাটালিয়ন ছিল না।

৪ ইস্ট বেঙ্গলকে ইতোমধ্যেই বিভাজন করে বিশাল এলাকা জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে। যেমন এক কোম্পানি বি.বাড়িয়া পাঠানো হয়েছে আগেই মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে। ওদের সাথে মেডিকেল কভারে ছিল লেফটেন্যান্ট আকতার। অন্য কোম্পানিকে (আলফা কোম্পানি) পাঠানো হয়েছে সিলেটের শমশেরনগরে উপ-অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে। সামান্য রিয়ার ইলিমেন্ট রইলো কুমিল্লায়। বাইরের কোম্পানিগুলি আর রিয়ার ইলিমেন্ট ছাড়া বাকি ব্যাটালিয়নই সেদিনের মুভে ছিল। রিয়ার ইলিটমেন্টের দায়িত্বে রাখা হলো কোয়ার্টারমাস্টার (কিউএম) ক্যাপ্টেন মেহমুদকে।

ক্যাপ্টেন মেহমুদ পাকিস্তানি। ব্রিগেড মেজর (বিএম)-ও পাকিস্তানি। আর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক খিজির হায়াৎ খান; তিনিও পাকিস্তানি। প্রথমে আমার ধারণা ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টে আগা গোড়া নির্ভেজাল সবাই বাঙালি।

প্রায় ১৫৩০ ঘটিকার দিকে গাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করলো অর্থাৎ যাত্রা হলো শুরু ক্যান্টনমেন্ট থেকে। বিএম মেজর সুলতান এবং কিউ এম ক্যাপ্টেন মেহমুদ এ কনভয়কে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

রাস্তায় ওদের কোনো অসুবিধা হয়নি। টিপরা বাজার পার হলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওয়ার সিমেট্রি, বাম দিকে। সেই ভয়াল যুদ্ধের একটা ছোট চিহ্ন রয়ে গেছে কুমিল্লা সেনানিবাসের এদিকটায়। এখানে কোনো গোলমাল নেই, নেই কোনো শ্রেণি এবং শ্রেণি যুদ্ধ, নেই পূর্ব-পশ্চিমের মতানৈক্য বা অন্যকে নিষ্পেষণের চেষ্টা। সাদা এবং কালো চামড়ার সৈনিকরা পরম বন্ধুর মতো যুগের পর যুগ শুয়ে আছে ঠায়। আর থাকবেও অনন্ত কাল...।

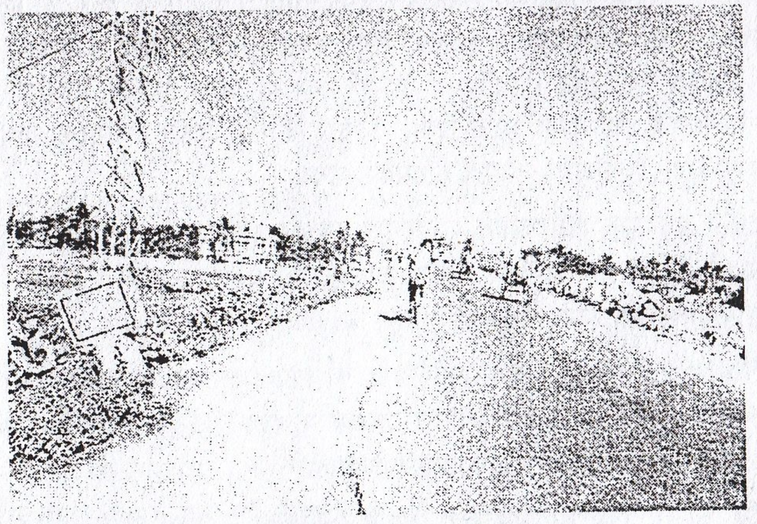
রাস্তা প্রায় ফাঁকা। গাছের দীর্ঘ ছায়ায় পড়ন্ত সূর্যের তেজ আড়াল হয়ে গেছে। দু'পাশে ধান ক্ষেত, তবে ধান নেই সেখানে। আছে কেবল ফাঁকা মাঠ আর বিধাতার উজাড় করে দেয়া সবুজের ছড়াছড়ি।

সময় গড়িয়ে চললো। এগিয়ে চললো কনভয়। একসময় গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন ওরা।

সন্ধ্যা নামছে। নিরিবিলি ছিমছাম প্রকৃতি। মৃদুমন্দ বাতাস মন প্রফুল্ল করে তুলছে। দেখতে এবং অনুভব করতে ভাল লাগছে গোধুলির শেষ আভা, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যের বিদায়ী চুম্বন।

লেফটেন্যান্ট হোসেন নিয়ম মোতাবেক অ্যাম্বুলেন্সে একদম শেষের দিকে। হঠাৎ দেখলেন থেমে গেছে কনভয়। ভাবলেন থেমেছে হয়ত কোনো কারণে। আবার এখুনি চলতে শুরু করবে। তাই নড়লেন না নিজের অবস্থান থেকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষমেষ নেমে এলেন বাহন থেকে। হাঁটতে লাগলেন সামনের দিকে।

কারণটা জানা দরকার কেন থেমেছে কনভয়। সামনের দিকে হাঁটতে থাকলেন। ক্যাপ্টেন গাফ্ফার এবং মেজর শাফায়াত জামিলের সাথে সিও কথা বলছেন। কমান্ডিং অফিসারকে একটু অধৈর্য মনে হলো। তিনি বললেন – How long shall we wait here? Ask those people to remove the barricades; otherwise we shall have to remove those. তখনই হোসেন জানতে পারলেন সামনে অ্যান্ডারসন ব্রিজ, পার হলেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সেনাবাহিনীর চলাচল বন্ধের



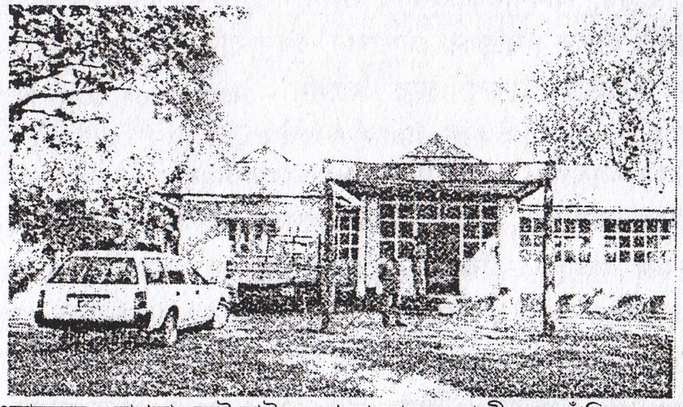
একাত্তরের এ্যান্ডারসন ব্রিজ

জন্য জনগণ রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে রেখেছে। এ হলো জাগ্রত জনতার প্রতিবাদের ভাষা। বেশকিছু লোকজন বসে আছে বেরিকেডের কাছে। তারা চাচ্ছে না পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চলাচল ছড়িয়ে পড়ুক দেশের বিভিন্ন স্থানে। তাই এই বেরিকেড।

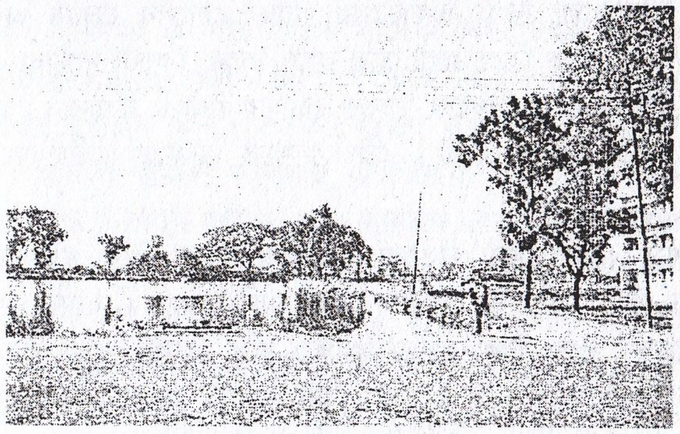


তবে ক্যাপ্টেন গাফ্ফার কিংবা মেজর শাফায়াত জামিল, দু'জনার কেউ সিওকে বললেন - Let us try again, let us talk to the people. সিও হেঁটে গেলেন তাঁর জিপের দিকে। মেজর জামিল এবং ক্যাপ্টেন গাফ্ফার লোকজনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কথা বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিকেড উঠিয়ে নেয়া হলো। চলতে শুরু করলো কনভয়। শেষমেষ বি.বাড়িয়া পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা পার। সিও'র জন্য ব্যবস্থা হলো ওয়াপদা রেস্ট হাউজে। আর অন্যান্য অফিসারদের জন্য লাগান হলো টেন্ট, রেস্ট হাউজের সামনে ফাঁকা জায়গায়। সামনেই বিশাল দিঘি। সামান্য দূরে দিঘির পাশ ঘেঁষে খোলা জায়গায় পড়লো ট্রুপ্স এর ছাউনি।

এর ফাঁকে ক্যাপ্টেন গাফ্ফারকে লেফটেন্যান্ট হোসেন জিজ্ঞেস করলেন – এতো তাড়তাড়ি কিভাবে ব্যারিকেড সরালেন? হাসলেন অ্যাডজুটেন্ট। বললেন-আমরা বাংলায় কথা বলতেই জনতা খুশি। ওদের বলেছি - What you want, we also want the same thing. ওরা তো খুশিতে বাগবাগ। সাথে সাথে সরিয়ে নিলো বেরিকেড। রাতে খাবারের অয়োজন শেষ। সব অফিসার চলে গেলেন রেস্ট হাউজে। ক'কদম হাঁটলেই রেস্ট হাউজ। কাজেই পৌঁছতে কালক্ষেপণ হলো না কারো। কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াৎও উপস্থিত সবার সাথে। একজন অফিসার রেডিও অন করলো ঢাকার সংবাদ



একাত্তরের ওয়াপদা রেস্ট হাউজ এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে



ওয়াপদা রেস্ট হাউজের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সুবিশাল দিঘি

শোনার জন্য, বোধহয় আটটার দিকে। ইংরেজি খবর, এরা সবাই শুনলেন এবং জানলেন – ঢাকায় নতুন করে আর্মি মোতায়েন করা হয়েছে।

খবর শেষ হয়ে যেতেই কেউ একজন এগিয়ে এসে রেডিওটা বন্ধ করলো। চারদিকে সুনসান নীরবতা, কোনো মন্তব্য ছাড়াই। শেষে নীরবতা ভাঙলো একজন পাকিস্তানি অফিসার। বললো – ওকে ভাই, খানা লাগাও।

পরিচ্ছন্ন পরিবেশন। খাবার খেলেন সবাই। কেউ মন্তব্য না করলেও পরিষ্কার বোঝা গেলো ঢাকায় গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। রাত দশটা কি সাড়ে দশটা হবে। টেন্টে ফিরছেন ওরা খাবার শেষে। অফিসারদের মধ্যে কেউ একজন মন্তব্য করলেন – People must be in the street now.

সে অফিসারের মন্তব্যে এক ধরনের অহঙ্কারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত লুকানো রেশ। দেশপ্রেমের এ লুকান সুগন্ধ আমার ভাল লাগল। জাতি হিসাবে আমরা ভীরু নেই। প্রয়োজনে প্রতিবাদে মুখর হতে পারি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি। পারি রাস্তায় নেমে আসতে নিজের ঘর ছেড়ে।

রাত অনেক। তবে ক'টা বাজে বোঝা যাচ্ছিল না। ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো অফিসারদের, অধিনায়ক জরুরি তলব করেছেন। ওরা সবাই আবার রেস্ট হাউজে সমবেত হলেন। ঘড়িতে দেখলেন তখন রাত তিনটা। কমান্ডিং অফিসার খিজির হায়াৎ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন - Army has been deployed in Dhaka in aid of civil power. But we are expecting civil unrest. I have been asked to impose curfew here. So let us do it.

এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাঙালি অফিসারবৃন্দ ঘটনার অবনতি আঁচ করতে পারলেন। কিন্তু কতটুকু ! কিছুই বোঝা গেলো না। কমান্ডিং অফিসার মেজর শাফায়াত জামিলকে দায়িত্ব দিলেন কারফিউ বলবতের জন্য। মেজর সাদেক নেওয়াজকে দায়িত্ব দেয়া হলো কারফিউর বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের জন্য। ঐ রাতে বাকি আলাপ ছিল ডেপ্লয়মেন্ট নিয়ে। কোথায় এবং কি ভাবে ডেপ্লয় করা হবে সেনাবাহিনী। সেগুলো নিয়ে একাত্তরের যোদ্ধা হোসেন তেমন একটা মাথা ঘামালেন না। কারণ এ বিষয়গুলো তার কাছে নতুন, কিছুটা দুর্বোধ্য এবং সত্যি কথা বলতে কি তিনি এ বিষয়ের ভিতর ঢোকার চেষ্টাও করেননি। মিটিং শেষ হতে ফের ফিরে এলেন টেন্টে। এবং দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে হারিয়ে গেলেন।

২৬ শে'র ভোরে ঘুম ভাঙলো। একটা নতুন দিনে পদার্পণ করলেন এখ'নকার ৪ ইস্ট বেঙ্গলের জোয়ান এবং অফিসারগণ। ক্যাম্প থেকে উঠে যথারীতি হাতমুখ ধুয়ে তারা ড্রেসড্ আপ। চলে এলেন নাস্তা করতে, রেস্ট হাউজে। শাফায়াত জামিল কাক ডাকা ভোরে উঠেই ডেপ্লয়মেন্ট এলাকায় চলে গেছেন তাঁর কোম্পানি নিয়ে, কারফিউ বলবতের জন্য।



এরা ক'জন রেস্ট হাউজে বসে গল্প করছিলেন। কাজ নেই, যোগাযোগ নেই বাইরের কারো সাথে। এক ধরনের অনিশ্চয়তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন সবাই। তখনও নাস্তার টেবিলে বসা ওরা। নাস্তা শেষ করেছেন আগেই। ভোর আটটা হবে হয়ত। অফিসারদের সামনে দিয়ে এক বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাগ হাতে পার হচ্ছিলেন। খিজির হায়াৎ তাকে হাতের ইশারায় থামালেন। জিজ্ঞেস করলেন – হ্যাঁ ভাই, ইসমে কেয়া হায়?

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সহজ সরল জবাব – বাজারমে গিয়া থা। ইসকে আন্দার থোরাসা চিজ হায়, খানেকে লিয়ে।

মনে হলো সিও অবাক হয়েছেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বললেন – ঠিক হ্যায়, তোম যাও।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চলে যেতেই মেজর জামিল আসলেন। তিনি অধিনয়াককে উদ্দেশ্য করে বললেন – Everything has been done as per plan. Curfew is imposed properly.

মনে হলো কমান্ডিং অফিসার সামান্য অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জামিলের দিকে তাকালেন। বললেন – তোমতো করফিউ ইমপোজ কিয়া। মগর ইঞ্জিনিয়ার সাহাব কুছ সামান খরিদ করকে আয়া। ক্যায়সে হুয়া ?

জবাবে জামিল বললেন – Might be he has purchased it from some roadside shop. But I have imposed curfew in the town.

সিও তখন মেজর জামিলকে বললেন – Look, any living object may be hostile to you. Even a flying bird can throw something to injure you. So, if necessary, shoot a flying bird.

জামিল নির্বিকার জবাব দিলেন – ঠিক হ্যায়, স্যার। আর বসলেন না তিনি। তখনই আবার বের হয়ে গেলেন তাঁর কোম্পানির ডেপ্লয়মেন্ট চেক করতে।

কমান্ডিং অফিসার একবার মেজর সাদেক নেওয়াজকে বললেন – Go to check the deployment. আবার কি যেন ভেবে বললেন – Ok, you stay back. কী যেন দ্বিধায় ভুগছেন তিনি। দ্বন্দ্ব তাঁর চোখে মুখে স্পষ্ট। কিন্তু প্রকাশ করলেন না কিছুই। আসলে বাঙালি অফিসার যারা বি.বাড়িয়ায় তারা ঢাকায় কি ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সাধারণ বেসামরিক লোকজন যা জানে তাও জানেন না এরা। এমন কি কোনো সংবাদ সংগ্রহ করার অবকাশও নেই এদের। তবে জানেন কমান্ডিং অফিসার। জানে অবাঙালি অন্যান্য অফিসার। কারণ তাদের ওয়্যারলেস সেটে যোগাযোগ আছে কুমিল্লার সাথে। আর কুমিল্লার আছে ঢাকার সাথে। কিন্তু ওগুলোয় যারা সেই মুহূর্তে দায়িত্বে নিয়োজিত তারা সবাই পাকিস্তানি।

শাফায়াত জামিল মাইকিং করেছেন শহরে। কাউকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। জনগণের সাহায্য কামনা করেছেন তাঁর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য। বলেছেন যে, আমরা তাদেরই অংশ। কাজেই কেউ যেন কোনো গোলমাল না করে।

মেজর জামিলের মটিভেশন ক্ষমতা ভাল। Language is forceful and convincing. যথাসময়ে তিনি সেটা কাজে লাগালেন। আসলে মটিভেশন যখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা সহজেই কাজ দেয়। সারাদিন নিদারুণ ব্যস্ত তায় কাটছে সবার। চোখের সামনে দিয়ে ঘর ঘর আওয়াজ তুলে ট্রুপ্‌সসহ গাড়ি যাচ্ছে টাউনের দিকে। আবার অন্য দলকে নিয়ে ফেরত আসছে। সৈনিকের পেটা শরীরে ধুলোর আস্তরণ। তবে লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনের কোনো কাজ নেই। সারাদিনে একটা রোগীও পেলেন না। তার সময় কাটলো প্রায় শুয়ে বসে আর কল্পনা করে। তবে সত্যি বলতে কি – ঐ সময় কল্পনাও ছিল সীমিত। কোনো

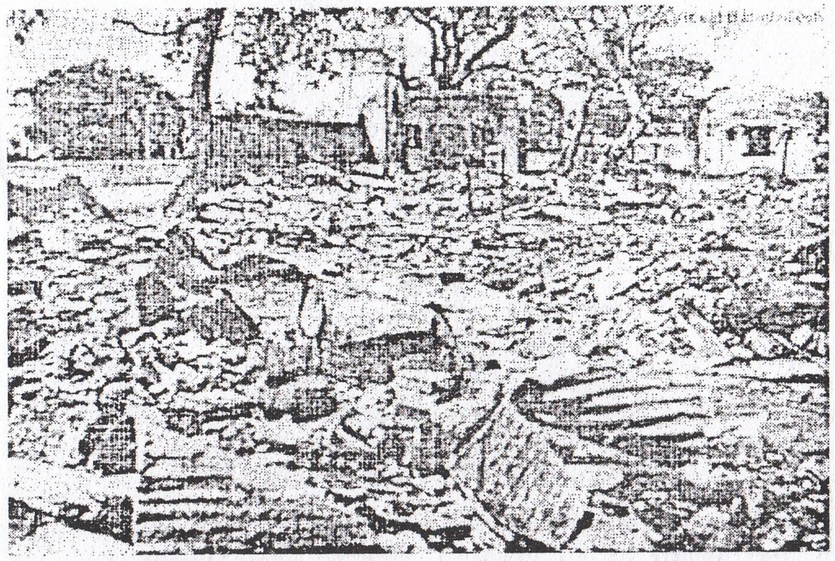


একাত্তরের ঘাতকদের নির্দয়তার নিষ্ঠুর শিকার বাংলার সরল নারী-পুরুষ

সরকার তার নিরস্ত্র লোকদের উপর সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেননি তিনি। শুধু তিনি কেন, আমরাও ভাবিনি, ভাবেনি বিস্মিত বিশ্ববাসীও। বাঙালি অফিসারদের কেউ কেউ ভাবলেন – ঢাকায় কোন লোক ঘরে নেই। প্রতিবাদের জন্য নিশ্চয়ই তারা ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছে। আসলে তখনও কি তারা জানতেন সাধারণ নিরস্ত্র মানুষ কি অসহায় ভাবে বিনা কারণে প্রাণ দিচ্ছে! তাদের টাকায় কেনা তাদেরই অস্ত্রে ! ঘাতকের



দল দক্ষ শিল্পীর নিপুণতায় নিষ্ঠুর ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হামলে পড়েছে! হামলে পড়েছে সর্বত্র স্বাধিকার সচেতন সাধারণ মানুষের উপর ! যার নাম ওরা দিয়েছে অপারেশন সার্চ লাইট ।

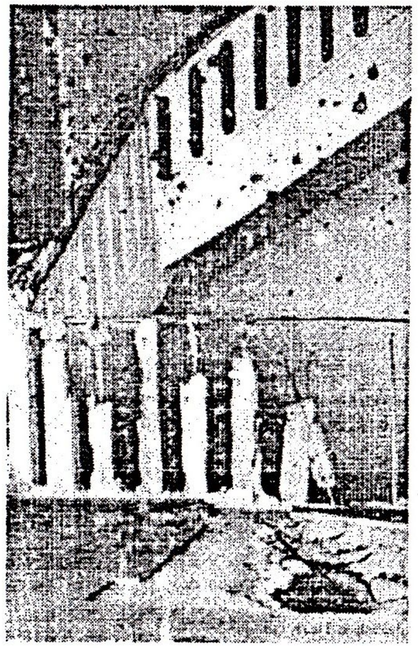


বিস্মিত মানবতা - ২৫ মার্চের ঢাকা, পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতার নীরব স্বাক্ষী

রাত নেমেছে। ওরা সবাই শুনল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বক্তৃতা দেবেন। খানার টেবিলে রেডিও নিয়ে অফিসারগণ সবাই গোল হয়ে বসেছেন। শুনছেন ইয়াহিয়ার ভাষণ।

তিনি শুরু করলেন সালাম দিয়ে। উল্লেখ করলেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের কথা। বললেন তার উদ্যোগ এবং পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার কথা। বললেন তাঁর ১৫ মার্চ ঢাকায় এসে পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য শেখ মুজিব ও পরবর্তীতে ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় পৌঁছলেন তাঁর সাথে আলাপ আলোচনার কথা। একপর্যায় তিনি বললেন - Sheikh Mujibur Rahman's action of starting his non-co-operation movement is an act of treason. He and his party have defied the lawful authority for over three weeks. They have insulted Pakistan's flag and defied the photograph of the Father of the Nation. They have tried to run a parallel Government. They have created turmoil, terror and insecurity.

A number of murders have been committed in the name of movement. Millions of our Bangali brethren and those who have settled in East Pakistan are living in a state of panic, and a very large number had to leave that Wing out of fear for their lives.



একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতে ক্ষত বিক্ষত ঢাকা

The Armed Forces, located in East Pakistan have been subjected to taunts and insults of all kinds, I wish to complement them on the tremendous restraint that they have shown in the face of grave provocation. Their sense of discipline is indeed praiseworthy. I am proud of them.

I should have taken action against Sheikh Mujibur Rahman and his collaborators weeks ago but I had to try my utmost to handle the situation in such a manner as not to jeopardise my plan of peaceful transfer of power. In my keenness to achieve this aim I kept on tolerating one illegal act after another. And at the same time I explored every possible avenue for arriving at some reasonable solution. I have already mentioned the efforts made by me and by various political leaders in getting Sheikh Mujibur Rahman to see reason. We have left no stone unturned. But he has failed to respond in any constructive manner; on the other hand, he and his followers kept on flouting the authority of the Government even during my presence in Dhaka. The proclamation that he proposed was nothing but a trap. He knew that it would not have been worth the paper it was written on and in the vacuum created by the lifting of Martial Law he could have done anything with impunity. His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sense can lead to but one conclusion-the man and his party is enemies of Pakistan and they want East Pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of this country – this crime will not go unpunished..



এর পর প্রেসিডেন্ট দেশপ্রেমের অবতার হয়ে আর্বিভূত হলেন তাঁর বক্তব্যে। শেষের দিকে যা বললেন তা তো শুধু ঘোর অন্যায় নয় নির্জলা মিথ্যাও বটে। বললেন – We will not allow some power hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 million people.

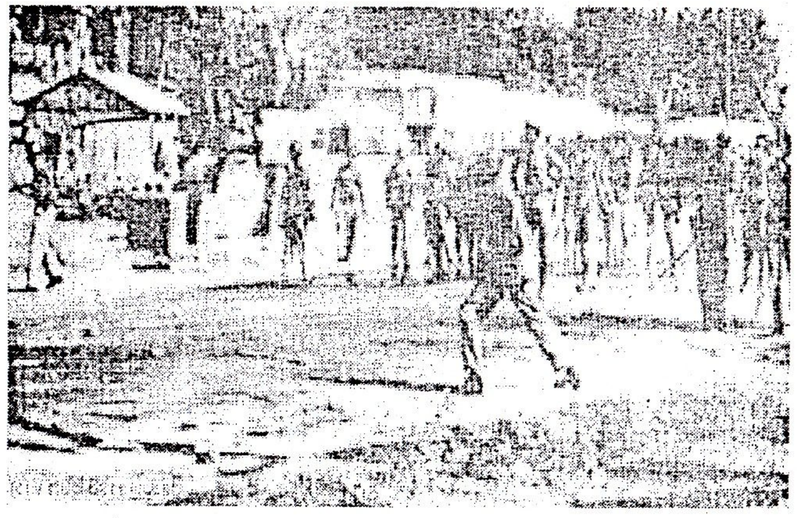
In view of the grave situtation that exists in the country today I have decided to ban all political activities throughout the country. As for the Awami League it is completly banned as a political party. I have also decided to impose complete press censorship. Martial Law regulations will very shortly be issued in persuance of these decisions. (সূত্র : Bangladesh Documents, Volume One, pp-275-277) (বক্তৃতায় কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে)। শেষে গণতন্ত্রে উত্তরণের আশ্বাস দিয়ে বক্তৃতা শেষ করলেন প্রেসিডেন্ট।

মন খারাপ হয়ে গেলো বাঙালি অফিসারদের। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জনগণের উপর ফুল স্কেলে চাপিয়ে দিলেন সামরিক শাসন। আসলে কি তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে একটা জাতিকে নির্মূল করার নির্দেশ দিলেন!



ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটে ধংসের কিছু চিহ্ন

ভাষণ শেষ হলো থমথমে নীরবতার মধ্যে। যথারীতি রেডিও বন্ধ করা হলো, গতকালের মতোই। বক্তৃতার উপর কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। খানা পরিবেশন করা হলো টেবিলে। খেলেন সবাই মিলে। দু'চারটে টুকটাক কথাবার্তা হলো, খাপছাড়া। যেন হারমনিয়ামের ভাঙা রিডে বেসুর তরঙ্গ ধ্বনি। প্রাণবন্ত সরেস কোনো আলোচনায় কেউ গেলো না। এক ধরনের থমথমে চাপা আক্রোশে আক্রান্ত বাঙালি সব অফিসার। বিস্ফোরককে বিস্ফোরণের আগে ডেটোনেট করতে হয়। তখন এরা সবাই যেন এক একটা ডিনামাইট, ডেটোনেট হবার সংকেতের অপেক্ষা মাত্র। শেষে রাত বাড়তে এরা ফিরলেন যে যার টেন্টের দিকে।



ঢাকার ব্যস্ত এলাকায় সামরিক জান্তার বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি মিশে আছে আমার মস্তিস্কে, আমাদের প্রতি রক্তবিন্দুতে। আমি হারিয়ে গেলোাম মুক্তিযুদ্ধের সে-ই দিনগুলিতে যে দিনগুলো আজও আমাদের অনেকের কাছে অজানা। অবিস্মরণীয় সেই দিন, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের নিধনের জন্য, নিজেদের ক্ষমতা ও স্বার্থ কায়েম রাখতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাধারণ লোকজনকে হত্যা করতে লেলিয়ে দিলো সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে উত্তেজনার ছোঁয়া। এক সময় বললেন – মাহমুদ, নাম মনে নেই। তবে টেন্টের কাছাকাছি পৌঁছতে একজন নায়েব সুবেদার আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো – স্যার, আপনারা কিছু একটা সিদ্ধান্ত দেন। সবাই ব্যস্ত, সৈনিকদের কিন্তু আর বশে রাখা যাচ্ছে না। আপনি অ্যাডজুটেন্টকে আমাদের কথা বলেন।

লেফটেন্যান্ট হোসেন অ্যাডজুটেন্টকে খুঁজে বের করলেন। বললেন তাকে ঘটনাটা। অ্যাডজুটেন্ট সত্যিই ব্যস্ত। এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছেন। কিন্তু হোসেনের কথা শুনলেন মন দিয়ে। তার পর বললেন – Ok, Ok. We are in full control of the situation. আপনার সাথে কথা হলে বলবেন ওদেরকে।

ফিরে গেলেন হোসেন টেন্টে। তার সাথে একই টেন্টে সঙ্গী হিসাবে ছিল একজন পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট। নাম সম্ভবত আমজাদ সাঈদ। সে অফিসারকে কখনো লেফটেন্যান্ট হোসেনের উদ্বিগ্ন মনে হয়নি। কথাবার্তাও সাধারণ ও সীমিত। আজকেও তেমন কোনো কথা হলো না। তার উপর এক ধরনের অনিশ্চয়তা, অজানা টেনশন। তারপরও ঘুম কি এক অদ্ভুত প্রয়োজন মানুষের। তাই যথারীতি ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে বিছানায় ছেড়ে দিলেন এ নবীন অফিসার।



কখন যে সূর্য দিগন্তে উঁকি দিয়ে ২৭শে মার্চকে বরণ করে নিয়েছে বুঝতে পারেননি হোসেন। জেগে উঠলেন অ্যাডজুটেন্টের ডাকে। তাঁর কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যা তাকে তাড়াতাড়ি উঠতে সাহায্য করলো। তিনি অ্যাডজুটেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন - What has happened, Sir?

জবাবে তিনি বললেন – Nothing. তারপর প্রায় ফিস ফিস করে তাকে বললেন– আসার সময় সাথে করে নিয়ে আসবেন। অ্যাডজুটেন্ট ইঙ্গিতে পাকিস্তানি অফিসারকে দেখালেন। হোসেন বাথরুম সেরে লেফটেন্যান্ট আমজাদকে ডেকে তুললেন। বললেন– Finish your job quickly. Commanding Officer is waiting for us in the dining room. Let us go for breakfast.

এক ফাঁকে টেন্টের বাইরে উঁকি দিলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। দেখলেন প্রায় সবাই ইউনিফর্মে। মনে হলো কোথাও যেন যাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে এরা সবাই।

অফিসার দু'জন তৈরি হলেন দ্রুত। তারপর রেস্ট হাউজে চলে এলেন কালক্ষেপণ না করে। তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির ব্রেকফাস্ট করছিলেন। মেজর সাদেক নেওয়াজও সেখানে উপস্থিত। আরো আছেন লেফটেন্যান্ট আকতার। অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনকে দেখে বললেন – আইয়ে, আইয়ে ডাক্তার সাব। কেয়া খায়গা তোম? কোনো জবাব ছাড়াই হোসেন বসলেন খাবার টেবিলে। নাস্তা পরিবশেন করলো মেস ওয়েটার। সবার সাথে বসে খেলেন স্বাভাবিক ভাবেই।

লেফটেন্যান্ট হোসেনের তখন সিগারেটের অভ্যাস। সবে ধরিয়েছেন একটা। কিন্তু অ্যাসট্রে না পেয়ে মেস কাঠিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইচ্ছে এটা বাইরে ফেলে দেবেন। এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। যেই দরজার পর্দা সরিয়েছেন, দেখলেন সশস্ত্র অবস্থায় তিন কি চার জন সেখানে দাঁড়ানো, ব্যাটালিয়নেরই বাঙালি সৈনিক। পর্দা সরাবার সাথে সাথে ওরা এসএমজি কক করলো। যদিও তিনি পর্দা টেনে দিয়ে হেঁটে এসে চেয়ারে বসলেন কিন্তু ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে গেলেন যেন।

অধিনায়ক সবই দেখতে পেলেন। মেজর সাদেক নেওয়াজ এবং তরুণ লেফটেন্যান্ট আমজাদও দেখলো সব। তখন আর লুকানোর কিছু ছিল না। কেউ একজন দরজার বাহির থেকে উচ্চৈঃস্বরে বললেন – (মেজর শাফায়াত জামিল) Lt Col Khijir Hyat Khan, Sir, Pakistani Army is not trusting us. So, we have revolted. You are under arrest.



সেদিনের বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখালেন - মেজর শাফায়াত জামিল

একাত্তরের যোদ্ধার শরীরের পেশি টান টান হয়ে গেলো। খানিকটা উত্তেজনার ছোঁয়া তাঁর মাঝে। যতদূর তার মনে পড়ে লেফটেন্যান্ট হারুন (পরবর্তীকালে লে. জেনারেল এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান) এবং লেফটেন্যান্ট কবিরও (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল (অব.) সেদিন ছিলেন সেখানে, অন্য দরজায়। ঘটনার সময় অ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন গাফ্ফারও উপস্থিত। মেজর সাদেক নেওয়াজের অস্ত্র সম্ভবত ডাইনিং টেবিলের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায়। যদি ভুলেও সে ওটার দিকে হাত বাড়ায় তাহলে তখনি মৃত দেহ দেখতে হবে সবাইকে। ওখানে বসা যে কেউই হতে পারে মৃত্যুর শিকার। গোলাগুলি শুরু হলে শত্রুদের সাথে সহযোদ্ধাদের শরীরে গুলি লাগা অসম্ভব কিছু নয়। তবে সে রকম কিছু ঘটলো না। পাকিস্তানিরা নির্বোধের মতো আর দুঃসাহস দেখাবার চেষ্টা করলো না কেউ। বাহির থেকে আবার হুকুম আসলো – Please get out of the room.

লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াৎ খান উঠে লেফটেন্যান্ট হোসেনের বাম হাত ধরলেন, প্রায় খামচে। তাঁর আচরণে শিশুর অসহায় নম্রতা, যেন কিছু একটা ধরে বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা। খিজির হায়াত তার হাত ধরেই বের হলেন রুম থেকে। পিছনে পিছনে অন্য দুই পাকিস্তানি অফিসার।

কিছুক্ষণ আগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বন্দি। তারা এখন চিহ্নিত শত্রু, দেশের অস্তিত্বের লড়াইয়ে। বন্দিদের নিয়ে আসা হলো টেন্টে। সাথে সাথে টেন্টের চারদিকে মোতায়েন করা হলো গার্ড।



খিজির হায়াৎ যেভাবে ধরে রেখেছেন লেফটেন্যান্ট হোসেনের হাত, তিনি ছুটতে পারলেন না। বন্দিদের সাথে তাকেও বসতে হলো। কিছুক্ষণ পর তিনি হোসেনকে অনুরোধ করে বললেন – Doctor, please don't leave us. অগত্যা তিনি বসলেন খিজির হায়তের পাশে। আর পায়ের কাছে অনুগত ভৃত্যের মতো বসলো সুবেদার মেজর ইদ্রিস। যদিও সে বাঙালি কিন্তু দীর্ঘ সময়ের আনুগত্য বিসর্জন দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে তার কিছুটা সময় লাগছিল। এক্স সিও খিজির হায়াত লেফটেন্যান্ট হোসেনের বাহু ধরে আছেন নাছোড়বান্দার মতো। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার তাকে বললেন – আমার কামরায় কোরান শরীফ আছে, তুমি কি নিয়ে আসবে ?

হোসেন তখন মেজর জামিলের কাছে জানতে চাইলেন কি করবেন তিনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছুটা হতবাক এবং বিমূঢ়। জীবনের কঠোরতার অভিজ্ঞতা এখনো তার হয়নি। খিজির হায়াত কোরান শরীফ পড়তে চান। মেজর জামিল ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। তিনি যেয়ে খিজির হায়াতের রুম থেকে কোরান শরীফ এনে দিলেন তার হাতে। খিজির হায়াৎ আবার আগের মতোই এক হাত দিয়ে তার হাত ধরলেন এবং পবিত্র কোরান তেলাওয়াত শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর খিজির হায়াত পুনরায় বললেন – I want to talk to Shafayat Jamil. তার এই তথ্য আদান-প্রদানের কর্ম চলতে থাকলো। হোসেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

শেষ পর্যন্ত তরুণ লেফটেন্যান্ট হোসেন মেজর জামিলকে খুঁজে বের করলেন। জানালেন তাঁর সাথে খিজির হায়াৎ কথা বলতে চান। জামিল বললেন – Go and tell him that you have not met me. তারপর আবার বললেন – I can't go and see this man. You go and look after him.

সেনাবাহিনীতে আনুগত্য বিসর্জন দেয়া খুবই মুশকিল, দিলেও চোখের লজ্জা কাজ করে। এ তার প্রমাণ। সম্ভবত বাংলার বিশুদ্ধ আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো এমনই। রুক্ষতা এদের স্পর্শ করতেই চায় না যেন। কিন্তু পাকিস্তানির সেনারাও তো মানুষ। কিন্তু ওরা কি কোনো মানবিক গুণাবলির পরিচয় রেখে যাচ্ছে ওদের কাজ কর্মে!

এরই মধ্যে এক অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ঘটে গেছে। যেখানে খিজির হায়াৎসহ অন্য দু'জন পাকিস্তানি অফিসার বন্দি করে রাখা হয়েছিল তা ছিল রেস্ট হাউজের ঠিক সামনে। গার্ড ছিল সেখানে। তাই বাইরের কোনো লোক আসতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেলো অন্যান্য এলাকায় অর্থাৎ পুরো ট্রুপ্স্ এরিয়ায় লোকে লোকারণ্য। কোথায় যে এতো লোক ছিল, কোথায় যে তাদের বুকে বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর জন্য এতো ভালবাসা লুকানো ছিল, কোনো দিন প্রকাশ পায়নি। না দেখলে বোঝা যায় না। শত শত নয়, হাজার হাজার লোক ছুটছে, হাসছে, চিৎকার করছে, স্লোগান দিচ্ছে জয় বাংলা বলে। উপড়ে ফেলছে টেন্ট কেউ কেউ। ফুর্তিতে কিছু গোলাগুলিও শুরু হলো, তবে তা আপৎকালীন সময়ে

ব্যবহারের জন্য অফিসারদের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে গেলো। এককথায় সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। লোকে লোকারণ্য। যেন বুনো পাখির অভয়ারণ্য, যেন বন্য হস্তি রা খেলায় মেতেছে। যেন এক ঝাঁক শঙ্খচিল সরবে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর তাদের ছুটাছুটিতে ধুলায় ঢেকে গেছে পুরো এলাকা। যেন ধুলি ঝড়ে আছন্ন হয়ে আছে পৃথিবী। চিৎকার, হইচই, আনন্দ আর সীমাহীন উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা। বাঙালি সেনাদের জন্য মানুষের বুকে এতো ভালোবাসা ! স্বাধীনতার প্রথম উদ্যোগে এতো আনন্দ! মানুষের হৃদয়ের দাবি বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হবার কথা নয় কারো। সম্ভবত সোনার ছেলেদের ঘরে ফেরার প্রত্যাশায়ই এতোদিন আমাদের জনগণ উদগ্রীব হয়ে বসে ছিল।

ভিড় ঠেলে ঠেলে শাফায়াত জামিলের কাছ থেকে আবার টেন্টে ফিরে এলেন আবুল হোসেন। দেখলেন খিজির হায়াত পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করছেন। তিনি খিজির হায়াতকে বললেন - I have not found Shafayat Jamil.

খিজির হায়াৎ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাকে বললেন – Doctor, another request. We are also army officers. We expect respect from you. Whatever you like to do, do. Please don't handover us to the civilians.

আবার হোসেন বের হলেন টেন্ট থেকে। এবার শাফায়াত জামিলকে খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো তাঁর। তবে খুঁজে পেয়ে এক সময় তাঁকে জানালেন খিজির হায়াতের অনুরোধের কথা। মেজর জামিল জবাবে বললেন – Ok, Ok. We shall not hand over them to civilians. We shall look after them well.

এরই মধ্যে অন্য আর এক ঘটনা ঘটে গেছে। ল্যান্স নায়েক কিংবা নায়েক পদবির একজন পাকিস্তানি সিগন্যালম্যান ছিল। তাকে মৃত পাওয়া গেলো তার টেন্টে। জনতার এতো ভিড়ের মধ্যে কার আঘাতে সে ধরাশায়ী হলো বোঝা যায়নি। তবে তখন বাংলাদেশিদের দীর্ঘ বঞ্চনার প্রতিবাদের গনগনে আগুনের উত্তাপে সব বিরূপকে পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো, পাকিস্তানি অফিসারদের যদি কোনোভাবে জনগণের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, মুহূর্তেই টুকরো টুকরো করে ফেলবে তারা। এ ব্যাটালিয়নে অন্য যারা উর্দুভাষী সৈনিক কর্মরত ছিল তাদের সবার ভাগ্যে কি ঘটেছে আবুল হোসেন তা আর জানতে পারেননি। হয় বন্দি নয় মৃত্যু, দু'টোর যে কোনো একটা ভাগ্য বরণ করেছে তারা।

যা হোক, আবার তিনি ফিরে এলেন বন্দি অফিসারদের টেন্টে। এবার তিনি ঠিক করলেন খিজির হায়াতের কাছে আর বসবেন না। এবং ঠিক তা-ই করলেন। দূরে দাঁড়িয়ে তাকে মেজর জামিলের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে টেন্ট থেকে বের হয়ে এলেন। নিজেকে ভারমুক্ত এবং স্বাধীন স্বাধীন মনে হতে লাগলো। জনগণের সাথে উচ্ছ্বাসের পাবনে গা ভাসালেন তিনিও। আহ ! মুক্তির যে কি আনন্দ!



কিন্তু নতুন নেতৃত্ব নেয়া অফিসারদের দায়িত্ব আর কাজ বহুগুণে বাড়লো। হঠাৎ এই পরিবর্তনের প্রবল থাক্কা সাথে সাথেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না তারা। এক্সাটলি কোনো কাজটা কখন করতে হবে এ ব্যাপারে যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়লো অনেকের মাঝে। হঠাৎ পাওয়া পরিস্থিতির সাথে অভ্যস্ত নয় কেউ, দীর্ঘ সময়ের মানসিক প্রস্তুতিও নেই, নেই নেতৃত্বদানের উপযুক্ত পদমর্যাদার লোক।

ওদের প্রাথমিক এই সিদ্ধান্তহীনতা একদম স্বাভাবিক। একসময় বাঙালিরা যাদের আপন মনে করতেন তাদের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে এ জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না কেউ। তবুও পরিস্থিতি সামাল দিতে ২৭ মার্চের শুরুতেই ব্যাটালিয়নের পুনর্গঠনের পালা শুরু হলো । ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ তখন বি.বাড়িয়ার পথে। সিলেটের শমশেরনগর ছেড়ে মুভ করেছেন আগেই। এখন অপেক্ষার পালা। কখন এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তাঁকে জানানো হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতি। প্রকৃতপক্ষে মেজর জামিল সার্বক্ষণিক ভাবেই তাঁর সাথে বেতার মারফত তথ্য আদান-প্রদান করছিলেন। প্রয়োজনে নিচ্ছিলেন নির্দেশ এবং পরামর্শ ।

কিন্তু মেজর খালেদ মোশাররফ পৌঁছার আগেই সিদ্ধান্ত হলো স্থান ছাড়তে হবে। কারণ ৪ ইস্ট বেঙ্গল কোথায় আছে পাকিস্তান আর্মি তা জানে। এ রেজিমেন্টের উপর যে কোনো সময় পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে বসতে পারে। এর সাথে প্রশ্ন আসলো আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষা। সিদ্ধান্ত হলো, কোম্পানিগুলো বিভিন্ন স্ট্রাটেজিক পয়েন্টে ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিরক্ষা অবস্থান করতে হবে সুদৃঢ়।

লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনের প্রধান কাজ চিকিৎসা সেবা। তার এ অবস্থায় কি করণীয় জানতে চাইলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। এটা ভোর বেলার কথা। সবাই যেহেতু জায়গা ছাড়ছে, তাকেওতো এমন একটা স্থানে থাকতে হবে যেখানে সবাই সহজেই উপস্থিত হতে পারে চিকিৎসার জন্য। ইন্ডিভিজুয়্যাল কোনো কোম্পানির সাথে যাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে অন্যদের জন্য তার সেবা পাওয়া কঠিন হবে। তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু না বলে দায়িত্বটা তার উপরই রাখলেন কর্তৃপক্ষ। বললেন – তোমার সুবিধা মতো একটা স্থান দেখে নাও।

তিনি ঠিক করলেন, তৎকালীন সদর হাসপাতালে তিনি অবস্থান করবেন। কর্তৃপক্ষ মৌখিক অনুমোদনও দিলেন তাতে। তিনিও সানন্দে তার কাছে মওজুদ ঔষুধপত্র, অ্যাম্বুলেন্স, ড্রাইভার ও মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্টসহ মোট চার কি পাঁচ জন, সদর হাসপাতালে চলে গেলেন। তখন সকাল ন'টা কিংবা সাড়ে ন'টা হবে।

আসলে মুক্তিযুদ্ধ যারা দেখেছেন এবং লড়েছেন তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে সে সব স্মৃতি, কঠোর এবং মধুর, কখনো বা বৈশাখি ঝড়ের মতো। সে দিনগুলোর ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি এখনো তাদের কর্ণজগতে পদ্মার তরঙ্গের মতো সরবে আঘাত করে, মনের গভীরে ফুটিয়ে চলে অফুরন্ত শক্তি। সে দিনগুলোর

কথা ভাবতেও আনন্দ, কণ্ঠে ফোটে উৎসাহের ছোঁয়া। সে উৎসাহ প্রাপ্তির, সে উৎসাহ ভালোবাসার।

আমার ভিতরও টগবগে উত্তেজনা। সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা, কোনো গল্প নয়। এ যেন এক ছোঁয়াছে রোগ। যখন ছড়ায়, ছড়ায় দ্রুত এবং অবলীলায়, জ্যান্ত ছবির মতো। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সে দিনটাকে। কি দৃপ্ত ভঙ্গি, মুখে কঠোর প্রতিজ্ঞা, সিদ্ধান্তে অবিচল আমাদের সেনাবাহিনী। সাথে লাখো জনতার ঢল। লক্ষ একই, আমরা লড়বো, আমরা স্বাধীন হবো।

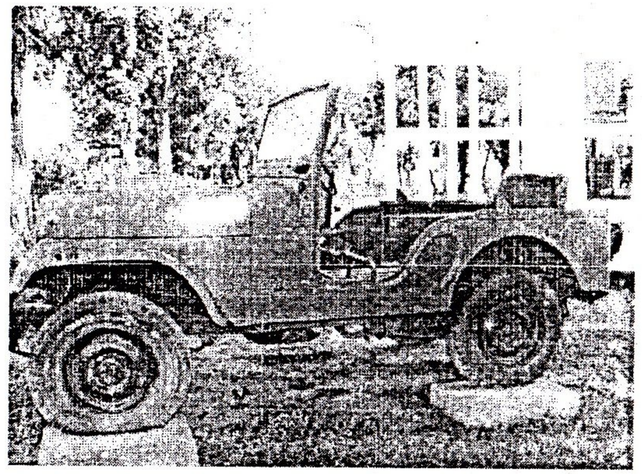
এই ছোট্ট মেডিকেল টিম যখন হাসপাতালে পৌঁছল দেখা গেলো কোনো ডাক্তার নেই সেখানে। আছে শুধু কিছু পুরুষ এবং মহিলা নার্স। রোগীরাও হাসপাতাল ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ দলটি হাসপাতালে অবস্থান নিল। টিম লিডার হিসেবে লেফটেন্যান্ট হোসেন খোঁজ নিলেন ডাক্তারদের সম্পর্কে। পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনকে পাওয়া গেলো। এক জনের নাম শফিকুর রহমান। আর একজন হিন্দু। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জনের নাম আর স্মৃতিতে ফিরে এলো না। আগের কিছু কিছু ঘটনা এবং নাম পৌষের সকালের পুরু কুয়াশার চাদরে যেন ঢাকা পড়ে গেছে।

শেষে উপস্থিত ডাক্তারদের নিয়ে কনফারেন্স করা হলো। সভাপতিত্ব করলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। সিদ্ধান্ত নিলেন হাসপাতাল কার্যক্রম সচল থাকবে। চলতে থাকবে সকল বিভাগের কাজ, রোগীদের চিকিৎসা ব্যাহত হবে না। যদি হাসপাতাল ছাড়তেই হয় সিদ্ধান্ত নিয়ে জানানো হবে। সেনাবাহিনী জনতার পক্ষে এবং সব সময়ই তারা জনতার পাশে থাকবে।

এই সিদ্ধান্তে কাজ হলো। মনে হয় শেষ কথাটা সবার মনে ধরেছিল। ওরা এ ছোট চিকিৎসা দলটির নেতৃত্ব মেনে নিয়ে সহযোগিতা শুরু করলো। রোগীরাও আস্থা পেলো থাকার এবং থাকলো।

হঠাৎ করেই কুমিল্লার দিকে ব্রিজের কাছ থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো এক ঝাঁক, হৃদয় কাঁপানো। শব্দটা এলো অ্যান্ডারসন ব্রিজের দিক থেকে। ওটাই এ ছোটো শহরে ঢোকার পথ, কুমিল্লা থেকে এলে। সাথে সাথে লেফটেন্যান্ট হোসেন ছুটলেন অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে। তার মাথায় কাজ করছে শুধু একটা কথা। হ্যা, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে আহতদের নিয়ে আসতে হবে। তিনি কতদূর যেতে পারবেন বা যাওয়া উচিৎ সে চিন্তা তার মাথায় এলো না। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের পিছনে এনে মেডিক্যাল টিমের কাছে পৌঁছে দেয়াই বিধান। মেডিকেল অফিসার কোনো পর্যন্ত যাবেন রোগীর স্বার্থে তার একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু তিনি তার তোয়াক্কা করলেন না। সে দিনের ঐ ব্যাটালিয়নে ঐ রকম শৃঙ্খলাও ছিল না। কেননা তাদের তখন পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনা স্থলে পৌঁছে দেখা গেলো





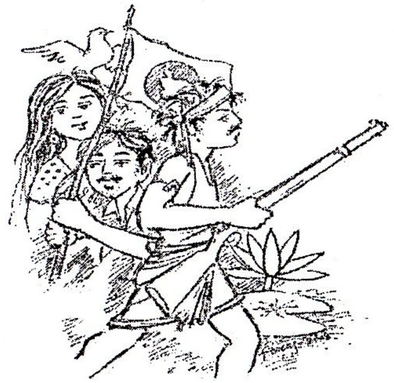
একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত সিজে-৫ জিপ

আমাদের সৈনিকদের সাথে বহু সাধারণ লোকজন জড় হয়েছে সেখানে। হোসেন ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন সামনে। হেঁটে হেঁটে ব্রিজের অপর পারে হাজির হলেন তিনি। দেখলেন ৪ ইস্ট বেঙ্গলের পাকিস্তানি কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন মেহমুদ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। সিজে-৫ জিপের উইন্ডশীল্ড ভেঙে চুরমার। ড্রাইভার বাঙালি, তার সিটে অনড়, যেন স্ট্যাচু। জিপটা ব্রিজের মুখেই দাঁড়ানো। আরও দু'জন গুলিবিদ্ধ। একজনার ইনজুরি বেশ খারাপ মনে হলো। ক্যাপ্টেন মেহমুদ ফর্সা, চওড়া। কুমিল্লা ছেড়ে আসার সময় থেকেই ন্যাড়া মাথা। কেন ন্যাড়া মাথা হয়েছিল জানা নেই। ওকে দেখেই চেনা গেলো। অফিসার ব্রিগেড মেজরের সাথে দাঁড়িয়ে এদের বিদায় জানিয়েছিল। ক্যাপ্টেন মেহমুদের ডেডবডি রাস্তায়ই পড়ে থাকলো। লেফটেন্যান্ট হোসেন ড্রাইভারের কাছে যেয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন তোমার কোনো অসুবিধা হয়েছে ? আঘাত পেয়েছো?

কথা বললো সে। জানালো কোনো অসুবিধা হয়নি। অবাক হবার মতোই ঘটনা। রাখে আল্লাহ মারে কে? ঝাঁক ঝাঁক গুলি আর বিধ্বস্ত গাড়ির মাঝে দিব্যি বসে আছে ড্রাইভার। কোনো আঘাত লাগেনি তার শরীরের কোথাও। আমারই ভুল হয়েছে। আমার ধারণা বেঙ্গল রেজিমেন্টে তো কেবল বাঙালি সৈনিকই থাকবে। এরা ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রিয়ার ইলিমেন্ট থেকে এসেছে সে কথা ভুলে বসে আছি। ধারণা করেছিলাম সে হয়ত অন্য কোনো অবাঙালি হবে যেহেতু মেহমুদের সাথে এসেছে। তবে দু'চারজন অবাঙালি অফিসার যে ছিল তার অভিজ্ঞতা আছে। যেমন কমান্ডিং অফিসারসহ আরো ক'জন অবাঙালি অফিসারের নাম আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। যারা সেদিন বি.বাড়িয়ায় ক্যাপ্টেন মেহমুদের সাথে এসেছিল ওরা সব ৪ ইস্টবেঙ্গলের বাঙালি জোয়ান, শুধু মাত্র কোয়ার্টার মাস্টার বাদে। ক্যাপ্টেন মেহমুদের সাথে অন্য যে দু'জন সৈনিক ছিল একজন গুলিতে সাথে সাথেই মারা গেলো। অন্য জনের আঘাত গুরুতর, তবে বেঁচে আছে তখনো। তাই তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। ওকে উপস্থিত

চিকিৎসকরা খুব উৎসাহ নিয়ে চিকিৎসার জন্য এগিয়ে এলেন। সবার আন্তরিক চেষ্টায় ক্রাইসিস থেকে উৎরে গেলো উক্ত সৈনিক। বেঁচে গেলো বেচারা।

যে ক'জন বেসামরিক ডাক্তার ছিলেন তারা লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনকেই হাপসাতালের ইনচার্জ হিসেবে মেনে নিলেন। সব কাজে তাকে সাহায্যের হাত বাড়াতে লাগলেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। চাপের মাঝে একতা এবং একাত্মতা হয় দ্রুত। কথাটা ঠিক। প্রমাণও হয়ে গেলো একাত্তরের এ কঠিন দিনগুলিতে।



এ সময় স্থানীয় নিরপেক্ষ এবং রাজনীতির সাথে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মেডিকেল টিমের সাথে পরিচিত হতে হাসপাতালে আসতে শুরু করলেন। তখন বারোটা কি একটা বাজে। ভর দুপুর। ওদেরই কোনো একজনকে অনুরোধ করা হলো ডেডবডির ব্যবস্থা করতে, যদি সম্ভব হয়। মুসলমান হিসেবে ক্যাপ্টেন মেহমুদের যাতে জানাজা হয় সে কথাও উল্লেখ করলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। খরচের ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করলেন স্থানীয়দের। কারণ দাফন-কাফনের জন্য কাপড়, বাঁশ, এটাসেটা কিনতে কিছু খরচ আছে বৈকি।

ওরা রাজি হলেন খুশি হয়ে। বললেন – আপনি যখন বলেছেন, ঠিক আছে, আমরা করবো। খরচ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। বিকালের দিকে ওরা জানিয়ে গেলো – জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। কাছেই একটা সরকারি গোরস্থান। সেখানেই সব ব্যবস্থা করেছে ওরা। আপৎকালীন অবস্থায় হসপিটাল ইনচার্জ টাকা দিতে চাইলেও তারা তা নিলেন না। বাঙালির মন, চিরকালই উদার।

আর অন্য বাঙালি সৈনিকের লাশের জন্য লেফটেন্যান্ট হোসেনের উদ্যোগ নিতে হয়নি। যেহেতু সে ব্যাটালিয়নেরই সৈনিক তাই ওর দায়িত্ব ব্যাটালিয়ন গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে তার অন্তেষ্টিক্রিয়ার কোনো ঘাটতি হয়নি। আপনজনদের মধ্যেই ছিল সে। তার আত্মাহুতি ছিল ইনসিডেন্টাল। বুঝে তার দিকে কেউ গুলি ছোড়েনি।



একটা প্রশ্ন বারবারই তাড়া করছে আমাকে। কুমিল্লা থেকে ক্যাপ্টেন মেহমুদ শুধুমাত্র একটা জিপ আর দু'জন সৈনিক নিয়ে কেন আসলো বি.বাড়িয়া পর্যন্ত। না এটা কোনো রেকি, না কোনো আক্রমণ। তা হলে কেন? শেষপর্যন্ত জানা গেলো ঘটনাটা। লেফটেন্যান্ট হোসেন শুনেছেন, দেখেন নি, কারণ তিনি পৌঁছেছেন ঘটনা ঘটার পরে। পাকিস্তানি সামরিক জিপ আসতে দেখে ব্রিজ রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনিকরা গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। ক্যাপ্টেন মেহমুদ গাড়ি ব্রিজের উপারে দাঁড় করিয়ে রাস্তায় নেমে এদিক-সেদিক তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। সে কাউকে না দেখতে পেয়ে হাতের স্টেনটা তুলে দু'এক রাউন্ড ফায়ার করেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে, আকাশে। সেটাই হলো তার কাল। আর যায় কোথা ! সাথে সাথে ব্রিজের এপার থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুটে যায় তাকে লক্ষ্য করে। আসলে তখন আমাদের প্রতিটি সৈনিকের অবস্থা ছিল ছিলে টানা ধনুকের মতো। যে কোনো মুহূর্তেই মরণ আঘাত হানতে প্রস্তুত।

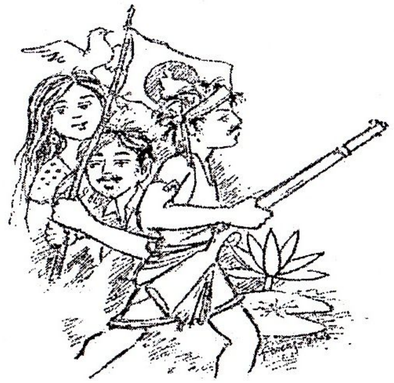
সময় যেন বহমান স্রোত। আর সেদিনকার বি.বাড়িয়ার ঘটনা যেন খরস্রোতা ঝর্ণা। সময় যেন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেলো, কোনো খাবার নেই। ৪ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার ফিল্ড মেস বন্ধ। কোম্পানি হিসেবে সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। কাজেই তিনটা, সাড়ে তিনটার দিকে বিস্কুট আর কলা খেয়েই এ ছোট দলের সবাইকে ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করতে হলো। কিন্তু হাসপাতালের অন্য ডাক্তার সাহেবরা বাসায় গেলেন খেতে। ওরা লেফটেন্যান্ট হোসেনকে বাসায় যাবার জন্য বললেন ঠিকই কিন্তু তিনি গেলেন না। তিনি তার অন্য সৈনিকদের অভুক্ত রেখে একা একা খাবেন কি করে?

একই ব্যস্ততায় রাত নামলো এবং রাত বাড়লো। এবারেও এ ছোট দলটির খাবারের বন্দোবস্ত হলো না। তবে এলাকার গণ্যমান্য যারা-আসা যাওয়া করছিলেন তাদের একজন জানতে চাইলেন ওরা খেয়েছেন কিনা। না জবাব শুনে বিনা বাক্য ব্যয়ে চলে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর টিফিন ক্যারিয়ার ভরে খাবার নিয়ে হাজির হলেন। ড্রাইভার এবং মেডিকেল অ্যাসিসটেন্টদের খোঁজ নিয়ে জানা গেলো ওরা খেয়েছে। ওরা কোথায় কি ভাবে খেয়েছে সে ব্যাপারে দলনেতা আর মাথা ঘামালেন না। এ ডামাডোলে খেয়েছে এও যেন এক বড় সংবাদ।

ধীরে ধীরে খবরের বলয় স্ফীত হতে লাগলো। ৪ ইস্ট বেঙ্গলই কেবলমাত্র বিদ্রোহ করেনি। পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে সেদিনের আশপাশের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর)-এর বাঙালি অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ? বাঙালি সেনাবাহিনী হয়ত অন্যান্য সেনানিবাসেও বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু বি.বাড়িয়ায় অফিসারদের কাছে সে সব তথ্য এ মুহূর্তে নেই। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সেই প্রাথমিক দুর্যোগের মাঝে চমক সৃষ্টি করা এক ঝলক আলোর বৃষ্টির মতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে ২৭ মার্চের সন্ধ্যায় ভেসে এলো মেজর জিয়াউর

চিকিৎসকরা খুব উৎসাহ নিয়ে চিকিৎসার জন্য এগিয়ে এলেন। সবার আন্তরিক চেষ্টায় ক্রাইসিস থেকে উৎরে গেলো উক্ত সৈনিক। বেঁচে গেলো বেচারা।

যে ক'জন বেসামরিক ডাক্তার ছিলেন তারা লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনকেই হাপসাতালের ইনচার্জ হিসেবে মেনে নিলেন। সব কাজে তাকে সাহায্যের হাত বাড়াতে লাগলেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। চাপের মাঝে একতা এবং একাত্মতা হয় দ্রুত। কথাটা ঠিক। প্রমাণও হয়ে গেলো একাত্তরের এ কঠিন দিনগুলিতে।



এ সময় স্থানীয় নিরপেক্ষ এবং রাজনীতির সাথে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মেডিকেল টিমের সাথে পরিচিত হতে হাসপাতালে আসতে শুরু করলেন। তখন বারোটা কি একটা বাজে। ভর দুপুর। ওদেরই কোনো একজনকে অনুরোধ করা হলো ডেডবডির ব্যবস্থা করতে, যদি সম্ভব হয়। মুসলমান হিসেবে ক্যাপ্টেন মেহমুদের যাতে জানাজা হয় সে কথাও উল্লেখ করলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। খরচের ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করলেন স্থানীয়দের। কারণ দাফন-কাফনের জন্য কাপড়, বাঁশ, এটাসেটা কিনতে কিছু খরচ আছে বৈকি।

ওরা রাজি হলেন খুশি হয়ে। বললেন – আপনি যখন বলেছেন, ঠিক আছে, আমরা করবো। খরচ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। বিকালের দিকে ওরা জানিয়ে গেলো – জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। কাছেই একটা সরকারি গোরস্থান। সেখানেই সব ব্যবস্থা করেছে ওরা। আপৎকালীন অবস্থায় হসপিটাল ইনচার্জ টাকা দিতে চাইলেও তারা তা নিলেন না। বাঙালির মন, চিরকালই উদার।

আর অন্য বাঙালি সৈনিকের লাশের জন্য লেফটেন্যান্ট হোসেনের উদ্যোগ নিতে হয়নি। যেহেতু সে ব্যাটালিয়নেরই সৈনিক তাই ওর দায়িত্ব ব্যাটালিয়ন গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে তার অন্তেষ্টিক্রিয়ার কোনো ঘাটতি হয়নি। আপনজনদের মধ্যেই ছিল সে। তার আত্মাহুতি ছিল ইনসিডেন্টাল। বুঝে তার দিকে কেউ গুলি ছোড়েনি।



একটা প্রশ্ন বারবারই তাড়া করছে আমাকে। কুমিল্লা থেকে ক্যাপ্টেন মেহমুদ শুধুমাত্র একটা জিপ আর দু'জন সৈনিক নিয়ে কেন আসলো বি.বাড়িয়া পর্যন্ত। না এটা কোনো রেকি, না কোনো আক্রমণ। তা হলে কেন? শেষপর্যন্ত জানা গেলো ঘটনাটা। লেফটেন্যান্ট হোসেন শুনেছেন, দেখেন নি, কারণ তিনি পৌঁছেছেন ঘটনা ঘটার পরে। পাকিস্তানি সামরিক জিপ আসতে দেখে ব্রিজ রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনিকরা গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। ক্যাপ্টেন মেহমুদ গাড়ি ব্রিজের উপারে দাঁড় করিয়ে রাস্তায় নেমে এদিক-সেদিক তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। সে কাউকে না দেখতে পেয়ে হাতের স্টেনটা তুলে দু'এক রাউন্ড ফায়ার করেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে, আকাশে। সেটাই হলো তার কাল। আর যায় কোথা ! সাথে সাথে ব্রিজের এপার থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুটে যায় তাকে লক্ষ্য করে। আসলে তখন আমাদের প্রতিটি সৈনিকের অবস্থা ছিল ছিলে টানা ধনুকের মতো। যে কোনো মুহূর্তেই মরণ আঘাত হানতে প্রস্তুত।

সময় যেন বহমান স্রোত। আর সেদিনকার বি.বাড়িয়ার ঘটনা যেন খরস্রোতা ঝর্ণা। সময় যেন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেলো, কোনো খাবার নেই। ৪ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার ফিল্ড মেস বন্ধ। কোম্পানি হিসেবে সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। কাজেই তিনটা, সাড়ে তিনটার দিকে বিস্কুট আর কলা খেয়েই এ ছোট দলের সবাইকে ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করতে হলো। কিন্তু হাসপাতালের অন্য ডাক্তার সাহেবরা বাসায় গেলেন খেতে। ওরা লেফটেন্যান্ট হোসেনকে বাসায় যাবার জন্য বললেন ঠিকই কিন্তু তিনি গেলেন না। তিনি তার অন্য সৈনিকদের অভুক্ত রেখে একা একা খাবেন কি করে?

একই ব্যস্ততায় রাত নামলো এবং রাত বাড়লো। এবারেও এ ছোট দলটির খাবারের বন্দোবস্ত হলো না। তবে এলাকার গণ্যমান্য যারা-আসা যাওয়া করছিলেন তাদের একজন জানতে চাইলেন ওরা খেয়েছেন কিনা। না জবাব শুনে বিনা বাক্য ব্যয়ে চলে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর টিফিন ক্যারিয়ার ভরে খাবার নিয়ে হাজির হলেন। ড্রাইভার এবং মেডিকেল অ্যাসিসটেন্টদের খোঁজ নিয়ে জানা গেলো ওরা খেয়েছে। ওরা কোথায় কি ভাবে খেয়েছে সে ব্যাপারে দলনেতা আর মাথা ঘামালেন না। এ ডামাডোলে খেয়েছে এও যেন এক বড় সংবাদ।

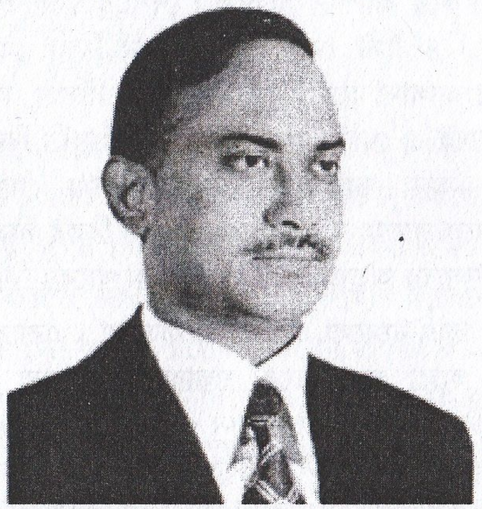
ধীরে ধীরে খবরের বলয় স্ফীত হতে লাগলো। ৪ ইস্ট বেঙ্গলই কেবলমাত্র বিদ্রোহ করেনি। পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে সেদিনের আশপাশের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর)-এর বাঙালি অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ? বাঙালি সেনাবাহিনী হয়ত অন্যান্য সেনানিবাসেও বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু বি.বাড়িয়ায় অফিসারদের কাছে সে সব তথ্য এ মুহূর্তে নেই। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সেই প্রাথমিক দুর্যোগের মাঝে চমক সৃষ্টি করা এক ঝলক আলোর বৃষ্টির মতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে ২৭ মার্চের সন্ধ্যায় ভেসে এলো মেজর জিয়াউর

রহমানের দৃপ্তকণ্ঠ ঘোষণা। তিনি বললেন :

Major Zia Provisional Commander-in-Chif of the Bangladesh Liberation Army hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independance of Bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic Government is committed to a policy of non - alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and serve for international peace. I appeal to all Government to mobilige public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

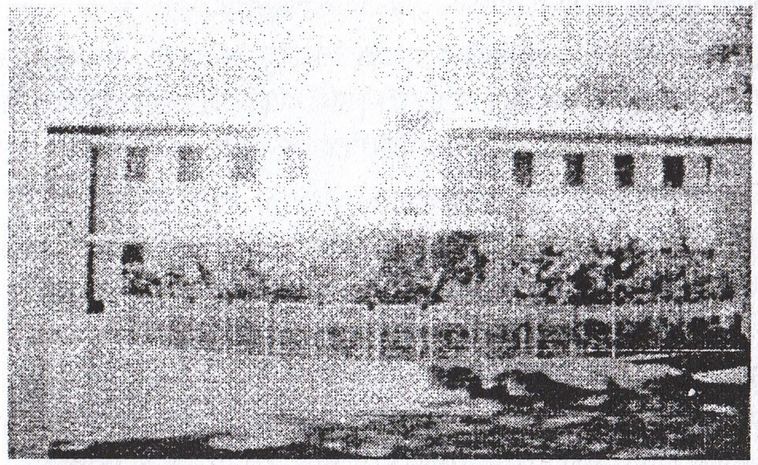
The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangeladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world. (সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৪)।



স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অকুতোভয় ব্যাঘ্র - মেজর জিয়াউর রহমান

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বার বার প্রচার করা হলো জিয়াউর রহমানের ভাষণ। আর সেই ভাষণ উত্তাল তরঙ্গ হয়ে শক্তি সঞ্চালন করে চললো পুরো জাতির অস্তিত্বের মাঝে দূরন্ত টগবগে ঘোড়ার মতো। পাকিস্তানি নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের মাঝে এ যেন এক নতুন পথের দিশা। বি.বাড়িয়ায় ৪ ইস্ট বেঙ্গল গুছিয়ে উঠতে শুরু করেছে। তারা ওখানে বন্দি পাকিস্তানি অফিসারদের ভোরেই পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে দিল সঙ্গত কারণেই। সাথে সাথে থানার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও যথেষ্ট জোরদার করা হলো। এসডিও রকিব সাহেব সেনাবাহিনীকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করলেন।





মুক্তিযুদ্ধে অবিরাম প্রেরণাদায়ী - ঐতিহাসিক কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র

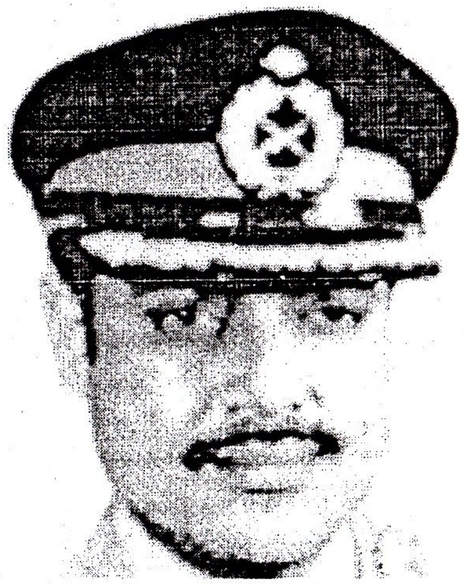
সেদিনের ৪ বেঙ্গলের মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি তিন বন্দি অফিসারকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করতে চাইলো। এ ক'দিনেই ভারতের সাথে যোগাযোগ শুরু হয়ে গেছে। যদিও তা নিতান্ত প্রাথমিক পর্যায়। যখন যুদ্ধবন্দি হস্তান্তরের প্রশ্ন আসল আগরতলার ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সায়গল সাহেব বললেন তাকে তাঁর কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করতে হবে। আলাপ করে তিনি যে ফয়সালা দিলেন সেটাও নাটকীয়। যেহেতু বাংলাদেশ তখনো আনুষ্ঠানিক ভাবে অস্তিত্ব লাভ করেনি কাজেই নিয়ম মাফিক যুদ্ধবন্দি হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। এপ্রিলের ২ তারিখে আগরতলার ডিসি ভারতের অংশে তাদের চা বাগানে আসলেন। এপারে মেজর জামিল তিন পাকিস্তানি বন্দি অফিসারসহ উপস্থিত। বন্দি পাকিস্তানি অফিসারেরা পায়ে হেঁটে ভারতে ঢুকলো। আর ওপারে অপেক্ষমাণ ডেপুটি কমিশনার বর্ডার ক্রসের অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন নিরাপত্তা হেফাজতে। এ ভাবেই নিয়মের ফাঁক দিয়ে হয়ে গেলো বন্দি পারাপার। তা না হলে এদের বয়ে বেড়ানো একটা কঠিন কাজ তখন ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্য।

আমার হৃদয় মুক্তিযুদ্ধ জ্যান্ত ছায়াপট যেন। কিছু কিছু স্মৃতি ভয়াবহ, বেদনায় ভারাক্রান্ত। চোখের সামনে জ্যান্ত মানুষকে অতি সাধারণ গো মড়কের মতো সাদামাটা লাশ হয়ে ভেসে যেতে দেখেছি। পুত্রহারা বৃদ্ধা মায়ের কান্নার ধ্বনিতে এখনো চমকে উঠি। বিধবার আহাজারি দেখেছি আপন এবং দূরের বলয়ে। মুক্তির উলাসের আগে ত্যাগের আর বেদনার বোঝা বইতে হয় নি সে রকম পরিবারের সংখ্যা নাম মাত্র হতে পারে। জীবনের নিরাপত্তার জন্য সব ছেড়ে পালানো হতো বিহবল মানুষের কথা মনে হলে জহির রায়হানের মতো চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে - **স্টপ জেনোসাইড**।

সময়ের কাঁটা ধরে শুরু হলো ২৮ মার্চ ১৯৭১ সালের ভোরের কথা। এ যেন বরফ ভেঙে বের হওয়া এক শ্বেত ভালুকের গল্প। যার ক্ষমতা সে নিজেই জানে না যে সে কত ক্ষমতাধর। যার থাবার আঘাতে বরফের বড়ো চাই ভেঙে গুড়িয়ে যায়।

এবার জেগে উঠেছে ৪ ইস্ট বেঙ্গল। ওরা সংগঠিত হয়ে গেলো দ্রুত, ভোরের আলো দিগন্ত ছুঁয়ে বের হতেই দেখা গেলো এ রেজিমেন্টের অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে ভয়ের লেশমাত্র নেই। বরং দেশের জন্য লড়াই করার উন্মাদনায় যেন পেয়ে বসেছে ওদের। ছোট মেডিকেল টীমটা হাসপাতালে ব্যস্ত রোগীদের চিকিৎসায়। এলোমেলো অবস্থায়

লোকজনের শৃঙ্খলা বজায় রাখাও কঠিন। তবে এর মাঝেও রয়েছে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত শৃংখলা। প্রশিক্ষণের এ একটা মস্ত গুণ। চাপের মুখে ভেঙে পড়ে না। সবল বৃক্ষের মতো প্রবল ঝড়েও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। আর এ অস্তিত্বের লড়াইয়ের নেতৃত্বে গ্রহণ করলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। তিনি ফিরে এসেছেন দুপুর নাগাদ সিলেটের শমশের নগর থেকে, ২৭ মার্চেই। সাথে তার আলফা কোম্পানির সকল জোয়ান। মেজর শাফায়াত জামিলকে বিদ্রোহ করার নির্দেশ তিনি অয়্যারলেসে আগেই দিয়েছিলেন। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের চোখ এড়িয়ে সহজেই চলে এসেছেন তিনি এখানে।



একাত্তরের একজন অকুতোভয় যোদ্ধা - মেজর খালেদ মোশাররফ

দরবার নিলেন মেজর খালেদ। উপস্থিত জোয়ান ও অফিসারদের মধ্যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে অভিযানের দৃঢ় প্রত্যয়। উত্তেজনার জোয়ার বইছে সগর্জনে, হঠাৎ বেরিয়ে আসা গলিত লাভার মতো। উত্তেজিত একজন এনসিও জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। দরবারে খালেদ যেটা বললেন তা সঠিক ছিল। তিনি ছিলেন অতি দূরদর্শী সামরিক কমান্ডার। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, ৪ ইস্ট বেঙ্গলকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে যেতে হবে। অ্যাটাকে শক্তি কমে যাবে, সংগঠিত হবার আগেই দুর্বল হয়ে পড়া চলবে না। এখন দরকার শক্তির সংরক্ষণ, সঞ্চয় এবং সময়ে বুঝে শত্রুকে আঘাত করা।



সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যাটালিয়ন ডেপ্লয় করা হলো বিভিন্ন দিকে, পরিকল্পিত ভাবে। ক্যাপ্টেন গাফ্ফারকে ব্রাভো (বি) কোম্পানির দায়িত্ব দিয়ে ঢাকা-বি.বাড়িয়ার পশ্চিম দিকে গোকন ঘাটে পাঠানো হলো। ঢাকা থেকে নদী পথে আগত শত্রুর যে কোনো আক্রমণকে তারা প্রতিহত করবে। তারা সেখানে মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুললো। লেফটেন্যান্ট হারুনকে দেয়া হলো ডেলটা (ডি) কোম্পানির দায়িত্ব। কুমিল্লা থেকে সাম্ভাব্য যে কোনো আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য ব্রিজের এপারে শক্ত অবস্থান নিলেন তাঁরা। আলফা (এ) কোম্পানি এবং চারলি (সি) কোম্পানি বি.বাড়িয়া - সিলেট অ্যাপ্রোচ রোডে অবস্থান নিলো। যেহেতু সিলেটে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট অবস্থান করছে কাজেই তাদের হঠাৎ আক্রমণের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। 'সি' কোম্পানির কমান্ডার শাফায়াত জামিল অত্যন্ত তৎপরতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে শুরু করলেন।

বি.বাড়িয়ার সদর হাসপাতাল ডায়েটারি অর্থাৎ রোগীদের পথ্য, খানা সরবরাহ হাসপাতালই করে থাকে। ৪ ইস্ট বেঙ্গলের মেডিকেল টিমের সদস্যরা চা-নাস্তা এখানেই সারলেন। এ ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্পও নেই। তা না হলে হাসপাতাল ছেড়ে কোনো না কোনো কোম্পানির লোকেশনে যেয়ে এদের খেয়ে আসতে হবে। সেটা সম্ভব নয় উপযুক্ত কারণেই। বিভিন্ন স্থানে ভাগ ভাগ হয়ে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে আছে তারা। এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানির দূরত্বও বেশ খানিকটা।

বিমান হামলার আশঙ্কায় ইতোমধ্যে হাসপাতাল কমপেক্সে ট্রেঞ্চ করে নিয়েছে যোদ্ধারা। পাকিস্তানি অফিসার ক্যাপ্টেন মেহমুদের মৃত্যুর পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আঘাত হানবে তা ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো। পাকিস্তানি দু'টো স্যাবর জেট খুব নিচু দিয়ে উড়ে এলো। ধীরলয়ে উড়তে উড়তে ওরা মেশিনগানের ট্রিগার চেপে ধরে রাখলো। ঝরঝর করে বর্ষার ধারায় নেমে এলো উত্তপ্ত সীসার বন্যা, লাইন ধরে। আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলে গেলো জেট দু'টো। আত্মরক্ষার জন্য মেডিকেল টিমের সদস্যরা ট্রেঞ্চগুলো কাজে লাগালেন এ সময়।

পাকিস্তানি এ বিমান হামলায় আতঙ্ক সৃষ্টি হলো ঠিকই কিন্তু ৪ ইস্ট বেঙ্গলের কোনো সদস্য কিংবা বেসামরিক লোকজনের কোনো ক্ষতি হলো না। ক্ষতি হয়নি তা মাথায় এলো সঙ্গত কারণেই। কারণ এ হামলার পরে আহত একজন লোকও হাসপাতালে আসেনি চিকিৎসার জন্য। অ্যাম্বুলেন্সটা ছিল রাস্তার পাশে, খোলামেলা জায়গায়। অক্ষত থাকলো ওটাও। হাফ ছেড়ে বাঁচা গেলো এ যাত্রা। কারণ আহত রোগী বহনের জন্য একমাত্র অ্যাম্বুলেন্সটি অত্যন্ত জরুরি। ওটা না থাকলে সমস্যা বাড়ত বইকি।

তবে পাকিস্তানি বিমান হামলার ফলশ্রুতিতে যা হলো তা খুব সুখকর নয়। সাধারণ জনগণ দলে দলে এই ছোট্ট শহরটা ছাড়তে শুরু করলো নিরাপদ

আশ্রয়ের সন্ধানে। রোগীর সংখ্যাও কমতে শুরু করলো দ্রুত। বেসামরিক ডাক্তারদেরও কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলো না কাজের জন্য। কিন্তু কিছু কিছু নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারী রয়ে গেলো। হয়ত যেতে পারেনি তাই। চলে যাবে, না কি হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করবে। তবে যে কোনো সাধারণ বেসামরিক লোকের কাছেই বি.বাড়িয়া তখন রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ। যারা পাখি দেখে অভ্যস্ত, যারা একে অন্যের সুখ-দুঃখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যায়, হঠাৎ তাদের কাছে বিমান আক্রমণ অনেক বড়ো ব্যাপার।

লেফটেন্যান্ট হোসেন অবশ্য একদম হাসপাতাল-কেন্দ্রিক হয়ে গেলেন না। মাঝে মধ্যে হুট করেই দেখতে গেলেন ব্যাটালিয়নের জোয়ানরা কে কোথায় কেমন আছে। গেলেন ব্রিজ পাহারারত ডেলটা কোম্পানির কাছে। তাদের মনোবল ছিল আকাশ ছোঁয়া। গেলেন গোকন ঘাটে। সেখানে ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের নেতৃত্বাধীন ব্রাভো কোম্পানিরও একই অবস্থা। আমাদের সোনার ছেলেদের মনে লুকিয়ে থাকা এ অসীম সাহসের কথা এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। ওরা সবাই এখন লড়াকু, ব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতা চলায়, থাবায় শক্তি সিংহের ওদের কথা ভাবলে। আজও আনন্দ আর অহঙ্কারে ভরে উঠে প্রতিটি বাঙালি হৃদয়।

প্রথমে ডেলটা কোম্পানির অফিসার সাদেক নেওয়াজ ছিল এ কোম্পানির দায়িত্বে। তার বন্দিত্বের পরে লেফটেন্যান্ট হারুনকে কোম্পানি কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

মার্চের শেষ লগ্নে একটা প্রশাসনিক সমস্যা খাড়া হলো হাসপাতালে। বেতন দিতে হবে কর্মচারীদের। কিন্তু দেবেটা কে? বৈধ অধিকার কার? বেতন ছাড়া লোকজন চলবেইবা কি করে? লেফটেন্যান্ট হোসেন পরামর্শ করলেন সেদিনের ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের সাথে (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল)। জবাবে তিনি বললেন – দেখেন কিভাবে বেতনের ব্যবস্থা করা যায়।

সোনালি ব্যাংক হাসপাতালের কাছেই – কেবল মাত্র প্রায় একশো গজ দূরে। তিনি দেখা করলেন ম্যানেজারের সাথে। ম্যানেজার বললেন – আপনি চেকে সই করলে আমি টাকা দেবো। যে কথা সেই কাজ। হাসপাতালের অ্যাকাউনটেন্টকে ডেকে সবার বেতনের কাগজপত্র প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন তিনি।

এরই ফাঁকে একদিন তিনি গেলেন শাহবাজপুর। সেখানে ৪ ইস্ট বেঙ্গলের একটা কোম্পানি আগে থেকেই ছিল। এই ব্যাটালিয়নকে ক্ষমতাহীন ও অকেজো করার অভিপ্রায়ে পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চের আগেই তিন তিনটা কোম্পানি বিভিন্ন অজুহাতে কুমিল্লার বাইরে পাঠায়। যেমন চারলি কোম্পানি মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে পাঠানো হয় বি.বাড়িয়ায়। এ কোম্পানিতে লেফটেন্যান্ট কবির



তখন কোম্পানি অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন। ২৫ মার্চ অবশিষ্ট ট্রুপ্‌স্‌ও চলে আসে বি.বাড়িয়ায়, যার কথা আগেই বলেছি। মেজর খালেদ মোশাররফ আলফা কোম্পানি নিয়ে সিলেটের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা সেনানিবাস ছাড়েন ২৪ মার্চ সন্ধ্যার দিকে, বাধ্য হয়েই, পাকিস্তানিদের পরিকল্পনা মাফিক।

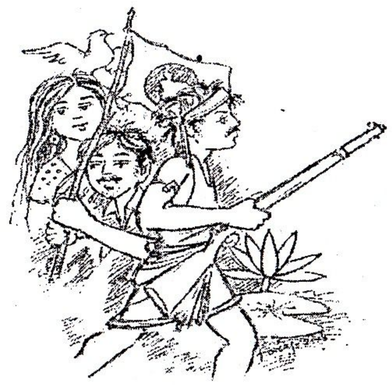
মেজর খালেদকে কিভাবে তাড়াহুড়া করে সেনানিবাস থেকে বের করা হয় জানলে সহজেই বোঝা যাবে এই রেজিমেন্টকে বিভক্ত ও শক্তিহীন করতে পাকিস্তানিরা কতোটা তৎপর ছিল। মেজর খালেদ ঢাকা থেকে বদলি হয়ে আসেন কুমিল্লায়। ঢাকায় তিনি ছিলেন ৫৭ ব্রিগেডের বিএম। তাঁর নিযুক্তি এমননই গুরুত্বপূর্ণ যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র তিনি টের পাচ্ছিলেন সঙ্গত কারণেই। অপারেশনাল সকল নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত তাঁর হাত হয়েই পার হচ্ছিল। কাজেই ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে এই জাতিকে মরণ আঘাত হানার আগে তাকে সরানোটা পাকিস্তানিরা জরুরি মনে করে। তা না হলে অপারেশন সার্চ লাইটের সংবাদ তিনি অবগত হয়ে যেতেন। ২২ মার্চ ৪ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক নিযুক্তি দিয়ে তাঁকে তড়িঘড়ি করে কুমিল্লায় নতুন কর্মস্থলে পাঠানো হয়।

আসার পরের দিনই তাঁকে সিলেটের শমশেরনগরে যাবার জন্য অধিনায়ক খিজির হায়াত নির্দেশ দেন। কারণ হিসাবে সেখানে নকশালদের অপতৎপরতা রোধের কথা জানানো হয় তাঁকে। খালেদের ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে যেতে হবে। এটাই সেনাবাহিনীর নিয়ম। ব্রিগেড কমান্ডারের হস্তক্ষেপে নিয়ম মানাটা প্রায় অবধারিত হয়ে পড়ে তাঁর জন্যে। তিনি গেলেন এবং যাবার আগে যতোটা সম্ভব অস্ত্র, গোলাবারুদ, গাড়ি এবং যোগাযোগের যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলেন সাথে করে। যেহেতু তিনি ২৪ মার্চের দিন শেষে কুমিল্লা থেকে যাত্রা শুরু করেন কাজেই তাঁকে বি.বাড়িয়া নাইট হল্ট করতে হয়।

সেখানে তাঁর কোম্পানিসহ তিনি মেজর শাফায়াতের লোকেশনে থাকেন এবং দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সাথে মত বিনিময় করেন। পরের দিন ভোরে খালেদ মোশাররফ তাঁর জোয়ানদের নিয়ে শমশেরনগরের পথে বি.বাড়িয়া ত্যাগ করেন। লেফটেন্যান্ট আকতার মধ্য মার্চের দিকে এই ইউনিটের অন্য কোম্পানির সাথে বি.বাড়িয়া পৌঁছেন। ক্যাপ্টেন মুক্তার কামালও অস্থায়ী দায়িত্ব নিয়ে আগেই চলে গেছেন জয়দেবপুর, ২ ইস্ট বেঙ্গলকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করতে।

এরই মধ্যে লেফটেন্যান্ট আকতার বেশ চৌকষ হয়েছেন। কাঁধে একটা স্টেন নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লেফটেন্যান্ট হোসেনের সাথে এখানেই দেখা হলো ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন, লেফটেন্যান্ট কবির ও লেফটেন্যান্ট হারুনের সাথে। সবাই দুর্দান্ত সাহসী যোদ্ধা। কেবল সাহসীই নয়, পণ করে আছেন, হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু! জীবনের তোয়াক্কা করছেন না কেউ। সবার ভাবনা কিভাবে স্বাধীন হবে দেশ। কিভাবে হানাদারদের মেরুদণ্ড ভেঙে বিজয় অর্জিত হবে।

লে. হোসেন ফিরে এলেন ডেরায়, বি.বাড়িয়া সদর হাসপাতালে। পিস্তল সাথে থাকলেও এটার ব্যবহারের চেয়ে রোগীর যত্নের কথাই বারবার ঘুরেফিরে সামনে এলো তাঁর। অস্ত্র ব্যবহারের সময় এখনো হয়নি। সুযোগটা সময়েই দেখা যাবে। সৈনিকের প্রস্তুতি আর মনোবল তো সঙ্গী হয়েই রইলো।



দেখতে দেখতে চলে এলো ৩০ মার্চ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সক্রিয় যথারীতি। এদেশের সাহসী যোদ্ধাদের মনোবল শুধু ধরেই রাখছে না বরং করছে আকাশচুম্বী। এ যেন ক্লান্ত রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চালনে সজীব করে তোলা। নিরস মাটিতে ছড়িয়ে দেয়া পানির অমৃত ধারা। ঐ দিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র জিয়াউর রহমানের স্বহস্তে লিখিত আবেদন প্রচার করা হলো। এ আবেদন করা হয়েছে জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তির প্রতি। সেখানে তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের বর্বতার উল্লেখ করে আবার সাহায্য কামনা করলেন। তিনি বললেন--

From Major Zia

Declaration:

Punjabis have used 3rd Commando Battalion in Chittagong city area to subdue the valliant freedom fighters of Swadhin Bangla. But they have been thrown back. Many of them have been killed.

The Punjabis have been extensively using F-86 aircrafts to kill the civilian strongholds and vital points. They are killing the civilians, men, women and children brutally. So far at least ..... thousand of Bengali civilians have been killed in Chittagong area alone.

The Swadin Bangla Liberation Army is pushing the Punjabis..... from one place to the other. At present Punjabis have utilized at least two Brigades of Army, Navy and Air Force. It is in fact a combined operation. I once again request the United Nations and the big powers to intervene and physically come to our aid. Delay will mean massacre of additional millions. (সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস ও দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৫)



এখানে উল্লেখ্য যে, ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের সময় জিয়াউর রহমান ভুলক্রমে ৩০শে মার্চের পরিবর্তে ৩১শে মার্চ লিখেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পুরো জাতিকে একাত্ম করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বার বার প্রচার করা হচ্ছে মেজর জিয়ার আহবান। এ যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পথহারা জাহাজ, হঠাৎ দেখতে পেয়েছে সবুজ তটরেখা। শ্যামল বৃক্ষরাজি, দূর আকাশে একঝাঁক উড়ন্ত সাড়স। তাঁর এই আহবানের মাঝে, অফুরন্ত আশার আলো। বেঁচে থাকার আশ্বাস। এখন আমরা আর কাণ্ডারিবিহীন নই।

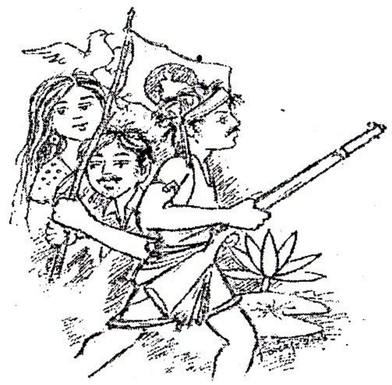


রক্তের হলি খেলায় হিংস হায়ানা

৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ২৫ মার্চের রাতেই বিদ্রোহ করে। এই রেজিমেন্টের পশ্চিম পাকিস্তানে বদলির আদেশ জারি করা হয়েছিল আগেই। সে সুবাদে দু'জন পাকিস্তানি অফিসারসহ মোট ১৩০ জনের একটি কোম্পানি অগ্রবর্তী দল হিসেবে খারিয়ায় চলে গেছে। অবশিষ্ট যারা আছে তাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে পাকিস্তানি রণনায়করা। তাদের ব্যাটালিয়ন ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। মেজর জিয়ার সাথে বাঙালি অফিসার যারা ছিলেন তারা হলেন ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ, কোয়ার্টার মাস্টার, লেফটেন্যান্ট শমশের মবিন চৌধুরী, অ্যাডজুটেন্ট, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন সাদেক, লেফটেন্যান্ট মাহফুজ ও লেফটেন্যান্ট আজম। পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া ৮ ইস্ট বেঙ্গলকে নির্মূলের উদ্যোগ নেয়।

২৫ মার্চের ভোরে কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া ৮ ইস্ট বেঙ্গলকে ষোলো শহর থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত রাস্তার সকল বেরিকেড সরাবার কাজে লাগান। রাত

লে. হোসেন ফিরে এলেন ডেরায়, বি.বাড়িয়া সদর হাসপাতালে। পিস্তল সাথে থাকলেও এটার ব্যবহারের চেয়ে রোগীর যত্নের কথাই বারবার ঘুরেফিরে সামনে এলো তাঁর। অস্ত্র ব্যবহারের সময় এখনো হয়নি। সুযোগটা সময়েই দেখা যাবে। সৈনিকের প্রস্তুতি আর মনোবল তো সঙ্গী হয়েই রইলো।



দেখতে দেখতে চলে এলো ৩০ মার্চ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সক্রিয় যথারীতি। এদেশের সাহসী যোদ্ধাদের মনোবল শুধু ধরেই রাখছে না বরং করছে আকাশচুম্বী। এ যেন ক্লান্ত রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চালনে সজীব করে তোলা। নিরস মাটিতে ছড়িয়ে দেয়া পানির অমৃত ধারা। ঐ দিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র জিয়াউর রহমানের স্বহস্তে লিখিত আবেদন প্রচার করা হলো। এ আবেদন করা হয়েছে জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তির প্রতি। সেখানে তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের বর্বতার উল্লেখ করে আবার সাহায্য কামনা করলেন। তিনি বললেন--

From Major Zia

Declaration:

Punjabis have used 3rd Commando Battalion in Chittagong city area to subdue the valliant freedom fighters of Swadhin Bangla. But they have been thrown back. Many of them have been killed.

The Punjabis have been extensively using F-86 aircrafts to kill the civilian strongholds and vital points. They are killing the civilians, men, women and children brutally. So far at least ..... thousand of Bengali civilians have been killed in Chittagong area alone.

The Swadin Bangla Liberation Army is pushing the Punjabis..... from one place to the other. At present Punjabis have utilized at least two Brigades of Army, Navy and Air Force. It is in fact a combined operation. I once again request the United Nations and the big powers to intervene and physically come to our aid. Delay will mean massacre of additional millions. (সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস ও দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৫)



এখানে উল্লেখ্য যে, ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের সময় জিয়াউর রহমান ভুলক্রমে ৩০শে মার্চের পরিবর্তে ৩১শে মার্চ লিখেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পুরো জাতিকে একাত্ম করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বার বার প্রচার করা হচ্ছে মেজর জিয়ার আহবান। এ যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পথহারা জাহাজ, হঠাৎ দেখতে পেয়েছে সবুজ তটরেখা। শ্যামল বৃক্ষরাজি, দূর আকাশে একঝাঁক উড়ন্ত সাড়স। তাঁর এই আহবানের মাঝে, অফুরন্ত আশার আলো। বেঁচে থাকার আশ্বাস। এখন আমরা আর কাণ্ডারিবিহীন নই।

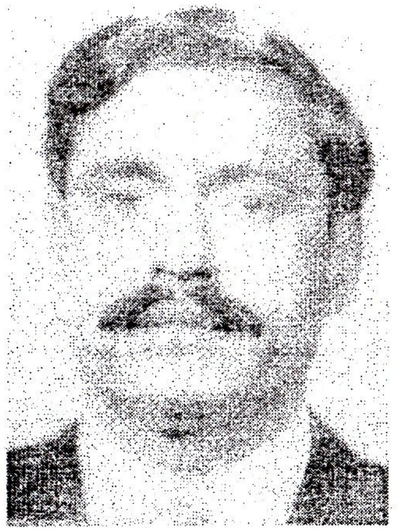


রক্তের হলি খেলায় হিংস হায়ানা

৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ২৫ মার্চের রাতেই বিদ্রোহ করে। এই রেজিমেন্টের পশ্চিম পাকিস্তানে বদলির আদেশ জারি করা হয়েছিল আগেই। সে সুবাদে দু'জন পাকিস্তানি অফিসারসহ মোট ১৩০ জনের একটি কোম্পানি অগ্রবর্তী দল হিসেবে খারিয়ায় চলে গেছে। অবশিষ্ট যারা আছে তাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে পাকিস্তানি রণনায়করা। তাদের ব্যাটালিয়ন ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। মেজর জিয়ার সাথে বাঙালি অফিসার যারা ছিলেন তারা হলেন ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ, কোয়ার্টার মাস্টার, লেফটেন্যান্ট শমশের মবিন চৌধুরী, অ্যাডজুটেন্ট, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন সাদেক, লেফটেন্যান্ট মাহফুজ ও লেফটেন্যান্ট আজম। পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া ৮ ইস্ট বেঙ্গলকে নির্মূলের উদ্যোগ নেয়।

২৫ মার্চের ভোরে কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া ৮ ইস্ট বেঙ্গলকে ষোলো শহর থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত রাস্তার সকল বেরিকেড সরাবার কাজে লাগান। রাত

ন'টার মধ্যে জোয়ানরা বেরিকেড সরানোর কাজ সমাপ্ত করে। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশে মেজর শওকত চারলি কোম্পানিকে নিয়ে চট্টগ্রাম পোর্টের দিকে রওয়ানা করলেন। তাদের সংগে রইলেন স্বয়ং অধিনায়ক জানজুয়া। এ কোম্পানিকে ট্রানজিট ক্যাম্পে রেখে মেজর শওকত ফেরত চলে এলেন ষোলো শহরে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন অধিনায়ক। ফিরে এলেন নৌবাহিনীর ক'জন অবাঙালি সশস্ত্র গার্ডসহ। জানজুয়া ষোলোশহরে পৌঁছেই মেজর জিয়াউর রহমানকে নৌবাহিনীর ঐ ট্রাকেই বন্দরে যেতে আদেশ দিলেন। তাঁর সাথে নিতে বললেন লেফটেন্যান্ট আজমকে। আর ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে নির্দেশ দিলেন ডেলটা কোম্পানি নিয়ে বন্দরে যেতে। ঠিক এই সময় ক্যাপ্টেন অলি যিনি সেদিনের ডিউটি অফিসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন শুনলেন টেলিফোনের রিং। দ্রুত তুললেন রিসিভার। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ম্যানেজার তাকে পাকিস্তানিদের গণহত্যা শুরুর খবর দিলেন এবং সাথে সাথে তাদের সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করলেন।



একাত্তরের দুর্বিনীত যোদ্ধা - ক্যাপ্টেন অলি

ক্যাপ্টেন অলি মেজর জিয়াকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে ঘটনা সুবিধার নয়। কিন্তু লে. কর্নেল জানজুয়া সামনে দাঁড়িয়ে। তাই কোনো কথাই স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হয়নি। জানজুয়া সামনে দাঁড়িয়ে থেকে মেজর জিয়াকে বন্দরের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েই তবে জায়গা ছাড়লেন। এরই মধ্যে ইবিআরসিতে পাকিস্তানিদের মরণ কামড় শুরু হয়েছে। লেফটেন্যান্ট শমশেরের মাধ্যমে খবরটা পৌঁছল ডিউটি অফিসার ক্যাপ্টেন অলির কাছে। তিনি মেজর শওকতকে বিষয়টি অবহিত করলেন দেরি না করেই। মেজর শওকত ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে ট্রানজিট ক্যাম্পে যেতে নিষেধ করলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন দ্রুত মেজর জিয়াকে ফিরিয়ে আনতে। আর শহরে কর্তব্যরত লেফটেন্যান্ট মাহফুজ ও লেফটেন্যান্ট



শমশের মুবিনকে শহর থেকে লোকজনসহ ব্যাটালিয়নে চলে আসার নির্দেশ দিলেন তিনি। মেজর শওকতের এই ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন অলি দেরি না করে পাকিস্তানি অফিসার ক্যাপ্টেন আহামুদ্দিন এবং লেফটেন্যান্ট হুমায়ুনকে অ্যারেস্ট করলেন। পথে পথে বেরিকেড থাকায় মেজর জিয়া ধীর গতিতে বন্দরের দিকে যাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান জিয়াকে পেলেন আগ্রাবাদের কাছে। তাঁকে অবহিত করলেন সব ঘটনা।

মেজর জিয়া তাৎক্ষণিকভাবেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন – We revolt. যুগান্তকারী এ সিদ্ধান্ত। কালের সোপানে লেখা হলো সাহসী যোদ্ধাদের সাহসী নেতৃত্বের ইতিহাস। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হয় সেই অসম সাহসী সিদ্ধান্ত। ব্যাটালিয়নে ফিরেই জিয়া বন্দি করলেন কমান্ডিং অফিসারকে। নিজ কাঁধে তুলে নিলেন গুরু দায়িত্ব। রাতেই সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন তিনি। আর লুকোচুরি নয়। এবার শুরু হলো স্বাধীনতার বলিষ্ঠ সংগ্রাম।

ব্যাটালিয়ন নিয়ে রাতেই মুভ করলেন মেজর জিয়া। যখন কালুরঘাটে পৌঁছলেন তখন ভোর হয়ে গেছে। ঐ সময় ক্যাপ্টেন হারুনের নেতৃত্বে তার ইপিআর বাহিনী প্রচুর গোলাবারুদ নিয়ে কালুরঘাটে উপস্থিত। অন্যান্য এলাকার ইপিআর বাহিনীও এখানে এসে জমায়েত হতে থাকলো।

পরের দিনগুলি ঘটনাবহুল। শুরু হয় হানাদারদের সাথে সংঘর্ষ। ক্রমান্বয়ে সারা চট্টগ্রাম শহরে ছড়িয়ে পড়ে তা। এ সময় পাকিস্তানিদের সাথে গোলাগুলিতে বেশ কিছু বাঙালি সৈনিকও হতাহত হয়। মার্চের শেষ প্রান্তের ঘটনা এগুলো। ঘটে চলে দ্রুত।

দেখতে দেখতে চলে এলো এপ্রিল।

এদিকে, বি.বাড়িয়ায় হাসপাতালের অ্যাকাউন্টেন্ট বিলের কাগজপত্র নিয়ে উপস্থিত লে. হোসেনের কাছে। মওকা বুঝে যার যতো এরিয়ার, টিএ ডিএ পাওনা ছিল সব বিল বানিয়ে এনেছেন ভদ্রলোক। সরল বিশ্বাসে লেফটেন্যান্ট হোসেন দিলেন সই করে। ভাবলেন বেতন পেলে এরা খুশি হয়ে হাসপাতালের কাজে আরো মনোযোগ দেবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। বেতন পাবার পরে কর্মচারী ও নার্সের সংখ্যা হঠাৎ করেই প্রায় নেই হয়ে গেলো। হাসপাতাল তো লোকজন ছাড়া চালানো মুশকিল। শুধু বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিন কি চারজন প্যারামেডিক দিয়ে এতো বড়ো হাসপাতাল চালাবেন কি করে! কিন্তু কোনো বিকল্প নেই। শেষে বাধ্য হয়েই সময়ের এ বিরূপ প্রতিক্রিয়াটা মেনে নিতে হলো সে দিনের দলনেতাকে।

তবে সংবাদ শুভ। সে দিনগুলিতে সেদিনের বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সংগঠিত হচ্ছে দ্রুত। মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে ২ ইস্ট বেঙ্গল পৌঁছে গেছে বি.বাড়িয়ায়। তাঁর এখানে পৌঁছার ঘটনাও চমকপ্রদ। ২৭ মার্চের বিদ্রোহের পর

২ ইস্ট বেঙ্গল মেজর কেএম শফিউল্লাহর নেতৃত্বে সংগঠিত হলো ময়মনসিংহে। ৩০ মার্চ সকাল আটটায় তিনি রাবেয়া বিদ্যালয়ে অবস্থানরত ইপিআর ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং পরিকল্পনা করলেন ঢাকা আক্রমণের। পরিকল্পনা মাফিক অধীনস্ত ইপিআর, মুজাহিদ, আনসার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদের ডেপ্লয়মেন্টের নির্দেশ দিলেন তিনি। একটি কোম্পানি সিরাজগঞ্জ ঘাটে ও একটি গফরগাঁও যাবে। টাঙ্গাইলে পাঠানো হলো এক কোম্পানি ইপিআর। পরিকল্পনা হলো দু'কোম্পানি ইপিআর ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও বিমানবন্দর এলাকায় আক্রমণ রচনা করবে।

২ ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানিসহ ইপিআর-এর আর একটি কোম্পানি পূর্বদিকে দিয়ে ঢাকা আক্রমণ করবে। আর মেজর শফিউল্লাহ নিজে ঢাকার এ আক্রমণে নেতৃত্ব দেবেন। আক্রমণ পরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানিগুলো যে যার গন্তব্যে রওনা করলো। ১লা এপ্রিল আক্রমণের দিন নির্ধারণ করা হলো।

ইতোমধ্যে খালেদ মোশাররফ ২ ইস্ট বেঙ্গলের বিদ্রোহের কথা জানতে পারেন। তিনি দেরি না করে লেফটেন্যান্ট মাহবুবকে শফিউল্লাহর কাছে একটি চিঠি দিয়ে পাঠান। শফিউল্লাহ চিঠি পান ৩০ মার্চ। চিঠিতে খালেদ বলেন – Do not go towards Dhaka.You will be banging your head against wall. We have liberated an area whole of Brahmanbaria Sub-Division and a part of Sylhet. Before taking any further action on Dhaka, we should jointly liberate this whole area and then go for Dhaka. I had already contacted Indian BSF officers and they have agreed to help us. I could not come and meet you today because I am going to meet BC Pande of BSF who promised me to help us. (সূত্র : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পৃ. ১৮০)

এ চিঠি পেয়ে মেজর শফিউল্লাহ ঢাকা আক্রমণের পরিকল্পনা বাদ দিলেন। খালেদের প্রস্তাবনা তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু যারা ইতোমধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে গেছেন তাদের সাথে আর যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলেন না তিনি। শুধু তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাঁদের নিয়ে দিক পরিবর্তন করে উপস্থিত হলেন বি.বাড়িয়ায়। ৪ এবং ২ ইস্ট বেঙ্গলের হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলো তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনের ম্যানেজার বাংলোয়। ২ ইস্ট বেঙ্গল এখানে পৌঁছায় সকলের মনোবল আরো বেড়ে গেছে। তারাও বি.বাড়িয়া রক্ষায় বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অবস্থান নিয়েছে।

৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনের ম্যানেজার বাংলোয় এক জরুরি কনফারেন্স হলো। উক্ত কনফারেন্সে ভারতীয় বিএসএফ-এর ত্রিপুরার ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার বিসি পান্ডে এবং বাংলাদেশের কর্নেল এমএজি ওসমানী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাউদ্দিন রেজা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে এম শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর মঈন প্রমুখ উপস্থিত হলেন। তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক

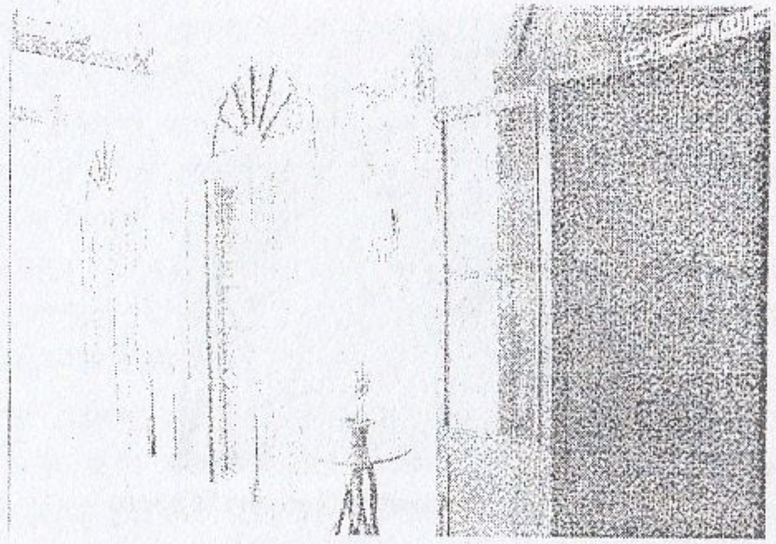




বিএসএফ এর ত্রিপুরার ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার বিসি পান্ডে

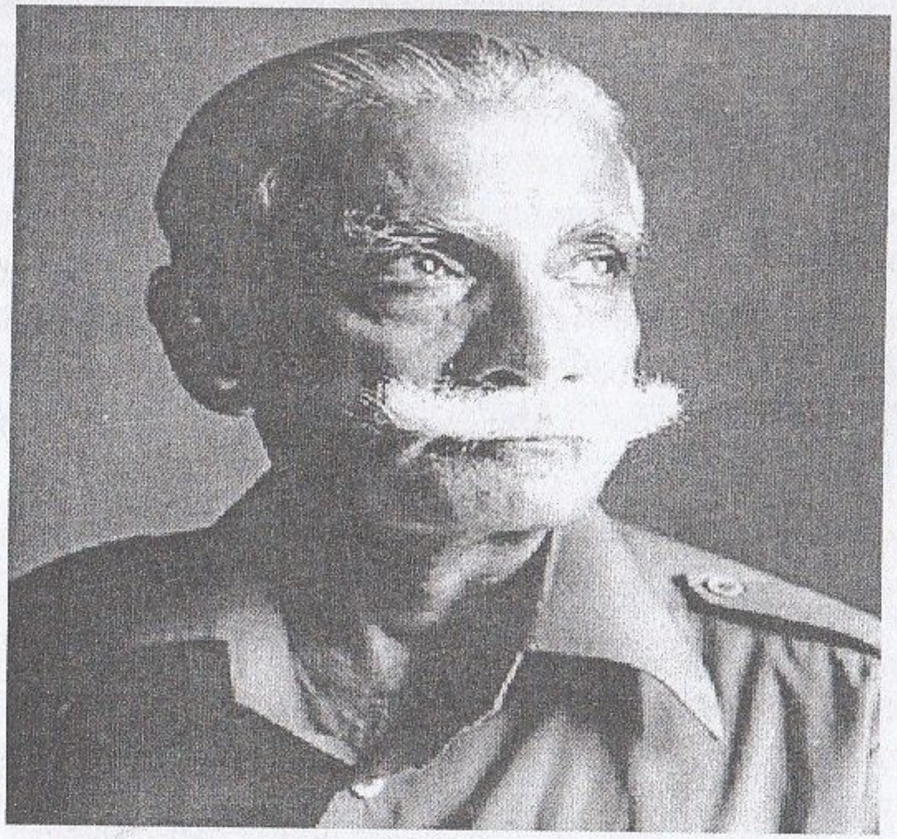
গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত অফিসারবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ণতা দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। উপস্থিত অফিসারবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের গতি সঞ্চারণের ব্যাপারে একমত হন। মেজর খালেদ এ সভায় কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন যা মুক্তিযুদ্ধকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সাহায্য করে। তিনি প্রস্তাবে বলেন– মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকা প্রয়োজন, বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, তাদের অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক সমর্থন আদায় এবং সামরিক সাহায্য সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি রাজনৈতিক সরকার গঠন করা জরুরি। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক নৃশংস গণহত্যা বহির্বিশ্বে তুলে ধরে তাদের সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন আদায়ের দায়িত্ব থাকবে এই সরকারের। খালেদ সভায় উল্লেখ করেন– অন্যথায় অনুরূপ সরকারের অনুপস্থিতিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একটি সামরিক বিদ্রোহ বা সশস্ত্র ষড়যন্ত্র হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ সভায় মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও যুদ্ধ সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই যুদ্ধ সম্পর্কিত এলাকারও দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। বি.বাড়িয়া ও সিলেটের নেতৃত্বে মেজর শফিউল্লাহ, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর নেতৃত্ব মেজর খালেদ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃত্ব মেজর জিয়াউর রহমান, যশোর ও চুয়াডাঙার নেতৃত্বে মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর কাছে অর্পণ করা হয়।

পরে রংপুর ও সৈয়দপুর এলাকার নেতৃত্ব দেয়া হয় ক্যাপ্টেন নওয়াজেশউদ্দীন এবং রাজশাহী অঞ্চল অর্পণ করা হয় মেজর নাজমুল হকের নেতৃত্বে। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য বাংলাদেশকে এ ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করে যুদ্ধকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। আর যেহেতু ৮ ইস্ট বেঙ্গল ২৭ মার্চ থেকে চট্টগ্রামে প্রচণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ব্যাপক লোকবল হারায়



৪ এপ্রিলের তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনের কনফারেন্স এখানেই অনুষ্ঠিত হয়

তাই মেজর জিয়াউর রহমানের অনুরোধে দু'টি কোম্পানি দিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গলের শক্তি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২ ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানি ক্যাপ্টেন মতিনের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব পালন করে। এই সভাতেই কর্নেল এমএজি ওসমানীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করা হয়।



মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক - জেনারেল এম এ জি ওসমানী



বি.বাড়িয়ায় যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিমের দিন কাটছে ব্যস্ততায়। মাঝে মাঝে কোম্পানি লোকেশনে যান দলনেতা। অন্যান্য অফিসারও যাবার সময় কখনো কখনো এখানে থামেন, খোঁজ খবর নেন। এভাবে দেখতে দেখতে এপ্রিলের ১৩ তারিখ চলে এলো। পাকিস্তানিরা এরই মধ্যে গ্রাউন্ড অ্যাটাকে না এলেও দু'তিন দিন পর-পরই আকাশে যুদ্ধ বিমান উড়িয়ে সবাইকে, বিশেষ করে বেসামরিক জনগণকে ভীত করে ফেলে। কিন্তু ব্যাপারটা এক সময় এদের গা সওয়া হয়ে যায়। মেডিকেল টিম খাওয়া-দাওয়া এখন হাসপাতালেই সারেন। বিল পাওয়ার কারণে সিভিল ঠিকাদাররা জিনিসপত্র ঠিকমতো সরবরাহ করছে। সদর হাসপাতালের অবস্থান আর তেমন একটা খারাপ নয়। যেন যুদ্ধ নয়, স্বাভাবিক জীবন-যাপন শুরু করেছেন এখানকার সাধারণ জনগণ।

বি.বাড়িয়ায় দিন যেন গড়ায় দ্রুত। সূর্য উদয় এবং অস্তের হিসেব রাখা কঠিন। এরই মাঝে চোখ কান খোলা রাখতে হচ্ছে তাদের। বর্তমান স্বাধীনতাযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এরই সাথে জড়িত জাতির অধিকার। শোনা গেলো তাজউদ্দীন আহমেদ ভারতে পৌঁছতে পেরেছেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ইতোমধ্যেই বিদেশে বাংলাদেশে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে গেছে। জনমত গড়ে উঠতে শুরু করেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। প্রবাসী বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আওয়ামী লীগের আরও অনেক নেতৃবৃন্দ ভারতে পৌঁছতে শুরু করেছেন।

দেখতে দেখতে ১৪ এপ্রিলের আলো ফুটলো বি. বাড়িয়ায়। সবাই উঠে স্বাভাবিক কাজকর্মে মন দিয়েছে। হঠাৎ লে. হোসেনের দেখা হলো ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের। তিনি ব্যাংকে যাচ্ছিলেন। লেফটেন্যান্ট হোসেনও তাঁর সাথে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাংকে চলে এলেন। ১৩ এপ্রিল থেকেই বাতাসে গুঞ্জন, বি.বাড়িয়া ছাড়তে হবে। এ-ব্যাপারে ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করতেই উনি বললেন – সবাইতো শাহবাজপুর চলে গেছে। You also move to Shabazpur.

লেফটেন্যান্ট হোসেন তো অবাক! এ কি করে সম্ভব! তারা মাত্র ক'জন লোক, ব্যাটালিয়ন চলে গেছে অথচ তারা জানেন না পর্যন্ত! এটা এ ছোটো দলের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে! আর কতোটা বিপজ্জনক! Isolated fragment in the war and caught by enemy! What can happen to a team!

কাজেই লেফটেন্যান্ট হোসেন সাথে সাথে তার ছোটো দলটি নিয়ে তৈরি হলেন স্থান ছাড়ার জন্য। এখন তাদের সামনে মাত্র একটাই কাজ। শাহবাজপুর পৌঁছে ব্যাটালিয়নে জয়েন করা। জলদি করতে হবে। জনাকয়েক আর্মি রোগী ছিল, ওদের সঙ্গে নিলেন হোসেন। যারা বেসামরিক রোগী ছিলেন ওদের নিজেদের জিম্মায় ছেড়ে দিতে হলো। হাসপাতালের অনেকেই না বলে – চলে গেছে কিন্তু অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে তখনো। এ দলটি যখন ৪ ইস্ট বেঙ্গলের মূল

দলের সাথে মিলিত হতে নতুন গন্তব্যে যাত্রা শুরু করলেন তখন তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। এ দলের দলনেতার ইচ্ছা ছিল বিদায় নেয়ার সময় তাকে বলে যাবেন কিন্তু উপায় কি! অগত্যা তাকে না বলেই ওরা সবাই হাসপাতাল ছাড়লেন।

এ দলের বাহন মাত্র একটি অ্যাম্বুলেন্স। শাহবাজপুর চেনা। তাই চললেন সোজা পথ ধরে দ্রুত। সেখানে পৌঁছতে কোনো বেগ পেতে হলো না। কিন্তু হতাশ হলেন সেখানে পৌঁছে। দেখলেন খা খা করছে চারদিক। ঘড় camp siting, no friends, no sign of anybody. কোথাও কেউ নেই। তবে পড়ে আছে যত্রতত্র চলে যাবার সব চিহ্ন। স্থানীয় লোকজনের সাহায্য নিতে হলো দলটিকে। শুনলেন ওরা চলে গেছে চান্দুরায়। কাজেই চান্দুরাই তখন হলো এদের পরবর্তী গন্তব্য। চললেন এরা চান্দুরার উদ্দেশ্যে। সেখানেও হল্ট করেনি অগ্রসরমাণ দল। আবারও হতাশা! সাথে সাথে উদ্বেগও বাড়ছে! চান্দুরাও জনশূন্য। কেউ নেই সেখানে। ওরা সবাই চলে গেছে সোজা তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেন। বর্ডারের কাছেই। শুধু কাছেই নয়, এর পরেই শুরু হয়েছে ভারত সীমান্ত।

এক ধরনের একাকীত্ব আর হতাশা নিয়ে দলটি এগিয়ে চলল তেলিয়াপাড়ার দিকে। কিছুটা সন্ত্রস্ত ওরা। সাথে রোগী আর প্যারামেডিক ছাড়া আর কেউ নেই। দলছুট হবার দায়ভার অনেক। ছুটন্ত অ্যাম্বুলেন্সে বসে তাড়া অনুভব করছেন ওরা। ভাবছেন আরও কতোটা দ্রুত ছোটা যায়। তাদের পৌঁছতে হবে মূল দলের কাছে। সেটাই তখন এদের প্রথম ও প্রধান কাজ।

একসময় ঢাকা-সিলেটের মহাসড়ক ছাড়তে হলো দলটিকে। প্রথমে ইট বিছানো রাস্তা, তবে শুকনো। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এগুতে কোনো কষ্ট হলো না ওদের। রাস্তার দু'পাশ নিরিবিলি, চারদিকে শান্ত পরিবেশ, গাছের ছায়ারা স্নেহময়ী মায়ের মতো ছায়ার চাদর বিছিয়ে রেখেছে পথ জুড়ে। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। শ্যামল বাংলার কি এক অপরূপ মনোলোভা ছবি। এই দৃশ্যপটের মধ্যদিয়ে চলতে চলতে ওরা টেনশন মুক্ত হতে শুরু করলো এবং এক সময় টেনশন নাই হয়ে গেলো।

পথ যত বন্ধুরই হোক, হোক না দুর্গম। কোনো না কোনো সময় তা শেষ হবে। এ ছোট্ট দলটিও এক সময় দেখতে দেখতে তাদের দৌড়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো সামনে বিশাল টি গার্ডেন। চারদিকে সবুজের মায়াময় স্নিগ্ধতা। তবে নিরবতা ভাঙছে দুরন্ত সৈনিকের ব্যস্ত পদচারণা, গাড়ির কড় কড়, ঘড় ঘড় শব্দ। মালপত্র উঠানো নামানোর সময় হাক ডাক। এতো ব্যস্ততার মাঝেও দু'একটা পাখির ডাক শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে পরিবেশে।

২ ইস্ট বেঙ্গলের দেখা মিলল এখানে। জানা গেলো আশুগঞ্জের কাছে তাদের ট্রেনে বিমান হামলাও করেছিল পাকিস্তানিরা। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারেনি। ওরা আছে ভালো, অন্যান্যদের মতোই।



এ ইউনিটের হেডকোয়ার্টার তখন জয়দেবপুর রাজবাড়িতে। কিন্তু পুরো ব্যাটালিয়ন সেখানে রাখা হয়নি। একাত্তরের মাঝামাঝি একটি কোম্পানিকে টাঙ্গাইলে পাঠানো হয়। অন্য একটি প্লাটুন গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং আর একটি প্লাটুন রাজেন্দ্রপুর অ্যামুনিশন ডেপোয় পাহারায় নিয়োজিত। এর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসুদুল হাসান আর উপ-অধিনায়ক মেজর কে এম শফিউলাহ। এ ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন লোকেশনে ডেপ্লয়মেন্টের কথা আগেও একবার এসেছে।

২ ইস্ট বেঙ্গল ছোটো ছোটো অংশে বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করায় এর মূল শক্তি এবং সমন্বয় হ্রাস পায়। ১৯ মার্চের কথা, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান তখন তুঙ্গে। ৫৭ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার ঢাকায়। যার অধীনস্ত ইউনিট ২ ইস্ট বেঙ্গল। মার্চের শুরু থেকেই এর অফিসার, জেসিও এবং জোয়ানরা সতর্ক হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে হালচাল সুবিধের নয়। তারা একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকে। আর এ যোগসূত্রের মধ্যমণি হয়ে উঠেন মেজর মঈন। ধীমান এই অফিসার এক সময় জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার এডিসি ছিলেন। তিনি তার অধিনায়কের সাথেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় সম্বন্ধে জানতে চান। দেশপ্রেমিকদের চিন্তা-ভাবনা একই হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই অধিনায়ক মাসুদুল হাসানের মতামতও ভিন্ন হয়নি। কাজেই মেজর মঈন প্রয়োজনে বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। তবে বিষয়টি অত সোজা ছিল না। ত্রিমুখী সমন্বয় তাও কিনা ব্যাটালিয়নের পাকিস্তানি অফিসার এবং বাইরে পাকিস্তানিদের তীক্ষ্ণ নজরদারীর সামনে। কিন্তু দেশপ্রেমে অবিচল যারা তাদের অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছতে ঠেকায় কে?

অবিরাম গণরোষ, পাকিস্তানিদের নির্বিচার গুলিবর্ষণ তখন নিত্য দিনের ঘটনা। এ দিন সকাল দশটায় ২ ইস্ট বেঙ্গল ৫৭ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে ওয়্যারলেস মেসেজ পায় - The commander with his escort is coming to lunch with you. He would also visit Gazipur Ordnance Factory. কমান্ডার জাহানজেব আরবার হঠাৎ করে ঐ দিন সিদ্ধান্ত নিলেন ২ ইস্ট বেঙ্গলে আসবেন। তিনি ইউনিট অধিনায়ক মাসুদুল হাসানকে জানালেন তিনি আসছেন ঢাকা থেকে। দুপুর বারোটায় ব্যাটালিয়ন আবার ওয়্যারলেসে ব্রিগেড কমান্ডারের তরফ হতে মেসেজ পেল - I have cleared some barricades. Now I am at chowrasta. I am using the civilians to open the barricades.You also clear the barricades from your side and meet me enroute. If there is any opposition use maximum force. অর্থাৎ আদেশ দিলেন বেরিকেড সরিয়ে তাকে যেন চৌরাস্তায় রিসিভ করা হয়। নির্দেশ দিলেন দরকারে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগের।

ঐ দিনগুলোয় টঙ্গি থেকে জয়দেবপুর কিংবা জয়দেবপুর থেকে ২ ইস্ট বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত জনগণ বেরিকেড দিয়েই রাখত। তারা চাইতোনা যখন তখন পাকিস্তানিরা হামলে পড়ুক নিরীহ জনগণের উপর। অনেক রক্তপাততো হয়েছে, আর কতো! সেদিন ব্রিগেড কমান্ডার আসলেন লাইট মেশিনগানসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ৭০ জন সৈনিকের এক বিশাল দল নিয়ে। মেজর মঈন তাদের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন চৌরাস্তা থেকে। ঐ দলে সৈনিক ছাড়াও অফিসারদের ভিতরে ছিলেন লে. কর্নেল জাহেদ, মেজর জাফফার (ব্রিগেড মেজর), ও তিনজন ক্যাপ্টেন। ব্রিগেড কমান্ডার যেয়ে সরাসরি ডাইনিং টেবিলে বসলেন। তিনি ছিলেন বেশ উত্তেজিত।

পাকিস্তানিদের বিশাল বহর দেখে জনগণের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে পাকিস্তানিরা বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য এসেছে। আর যায় কোথা। সাথে সাথে মিছিলে মিছিলে জনসমুদ্র হয়ে গেলো ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের আশপাশ এলাকা। রাস্তায় রাস্তায় দ্রুত গড়ে উঠল বেরিকেড। জনগণ মালগাড়ির বগি ফেলে রাস্তার দিল বন্ধ করে।

স্লোগান শুনে ব্রিগেড কমান্ডার ক্ষেপে উঠলেন। অধিনায়ককে বললেন যে তিনি তখনই ঢাকা ফিরবেন। অধিনায়ক মেজর মঈনকে আদেশ দিলেন বেরিকেড সরাবার জন্য। মঈনের পিছু পিছু কমান্ডার আসছিলেন সদলবলে। মেজর মঈন উত্তেজিত জনতার সামনে তাদের নেতাদের বুঝিয়ে রাজি করাবার চেষ্টা করলেন। ব্রিগেড কমান্ডার তাতে ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি চাচ্ছিলেন রক্তপাত কিন্তু মেজর মঈন চাচ্ছিলেন সহজ সমাধান। কিন্তু সমাধান সহজ হলো না। ব্রিগেড কমান্ডার উত্তেজিত হয়ে গুলি ছোড়ার নির্দেশ দিলেন। মঈন গুলি ছুড়তে আদেশ দিলেন তার এক সার্জেন্টকে কিন্তু বাংলায় বললেন মাটিতে গুলি করতে। ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব তাতে আরো চটে গেলেন। তিনি তখন মৃত দেহ দেখতে মরিয়া। আদেশ দিলেন- Fire for effect. মেজর মঈনও নিজের লোকদের বাঁচাতে মরিয়া। তিনি আদেশ দিলেন আকাশে এবং মাটিতে গুলি করতে। এরই মধ্যে জনগণের মধ্য হতে কেউ বন্ধুক দিয়ে গুলি করলো। এতে দু'জন সৈনিক আহত হয়। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে না গেলেও উত্তেজিত জনতা একটা বেডফোর্ডে করে রেশন নিতে আগত পাঁচজন সৈনিকের অস্ত্র কেড়ে নিল। সেই অস্ত্র থেকে একটা তারা ব্যবহারও করলো দূর থেকে। রীতিমত রণাঙ্গন হয়ে উঠল রাজবাড়ির রাস্তা। ব্যাটালিয়নের ক্লার্ক সুবেদার আইয়ুব আক্রান্ত হয়ে গুলি ছোড়ে সমবেত জনতার উপর। সেদিনের ঐ গোলাগুলিতে মোট ৩ জন বাঙালি শহীদ হন।

ব্রিগেড কমান্ডার চলে গেলেন ঢাকায়। তার নির্দেশে পরের তিন দিন জয়দেবপুরে জারি রইলো সান্ধ্য আইন। অধিনায়ক মাসুদুল হাসানকে ঢাকায়



সংযুক্ত করা হলো ২৩ মার্চ। তার স্থালাভিষিক্ত হলেন লে. কর্নেল রকীব। ২৫ মার্চে ঢাকায় গণহত্যা, বিডিআর এবং পুলিশের উপর আক্রমণ ২ বেঙ্গলের সকলকে বিদ্রোহের মতো সাহসী পদক্ষেপ নিতে আরো উদ্বুদ্ধ করে। কর্নেল মাসুদুল হাসান ঢাকার ঘটনাবলি সংক্ষেপে এবং ইশারায় এদেরকে টেলিফোনে জানাতে সক্ষম হন। তারপর ঢাকার সাথে ব্যাটালিয়নের টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। লে. কর্নেল মাসুদুল হাসানের প্রতিস্থাপক লে. কর্নেল রকিবের বিদ্রোহ সম্পর্কে মনোভাব অন্যান্য অফিসারদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। তার সহযোগিতা লে. কর্নেল মাসুদুল হাসানের মতো হবে কিনা সে ব্যাপারে তারা সন্দিহান ছিলেন। তাই মেজর মঈন বিদ্রোহের খবরাখবর সীমিত রাখতেন ক্যাপ্টেন নাসিম, ক্যাপ্টেন আজিজ অন্যান্য জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে। ২৫ শে মার্চেও নজিরবিহীন গণহত্যার পরে ব্যাটালিয়নের সবাই একযোগে বিদ্রোহের জন্য কাজ শুরু করে দেয়। বিদ্রোহের জন্য তারিখ নির্ধারিত হয় ২৮ মার্চ। মেজর মঈন এমনভাবে সব বিষয়গুলি সমন্বয় করেন যে ব্যাটালিয়নের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা ইলিয়াসের মাধ্যমে ৪০টি বাঙালি পরিবারকে সফলভাবে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলেন। এমওডিসি'র ৭০ জন বাঙালি সৈনিককেও তারা সরিয়ে নিয়ে আসেন। গাজীপুর এবং রাজেন্দ্রপুরে সফলভাবে বিদ্রোহকে সমন্বয় করেন ওরা ক্যাপ্টেন আজিজের মাধ্যমে। গাজীপুরে পরিকল্পনামাফিক যথারীতি অস্ত্রাগারও লুণ্ঠিত হলো। আমাদের নিরস্ত্র লোকদের হত্যা করার জন্য এ অস্ত্রগুলি পিছনে রেখে যাবার কোনো মানে হয় না। রাজেন্দ্রপুরে সামান্য গোলাগুলি হলেও আমাদের লোকজন থাকল অক্ষত। আর মঈনতো ৩০০ সৈন্যের বিশাল দল দিয়ে রাজবাড়ি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে রওনা করলেন নির্ধারিত গন্তব্যে। আসার সময় অধিনায়ক লে. কর্নেল রকিবকে খোঁজাখুঁজি করেও না পাওয়ায় তাকে রেখে আসতে বাধ্য হলেন। প্রকৃতপক্ষে অধিনায়কের মতিগতি না বুঝতে পেরে উপ-অধিনায়ক মেজর সফিউল্লাহ সত্যিকার অর্থে ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছিলেন আগেভাগেই। এ রক্তপাতহীন বিদ্রোহের সফলতার অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল অবিচল দেশপ্রেম এবং ন্যায় পরায়ণতা। অন্যায়কে মিটিয়ে দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। এবং ওরা সেটা করেও দেখিয়েছে।

টাঙ্গাইলে আলফা কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন একজন পাকিস্তানি অফিসার, মেজর কাজেম কামাল। তাকে নিরস্ত্র করে লেফটেন্যান্ট গোলাম হেলাল মোর্শেদকে কোম্পানি কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হলো। আর ময়মনসিংহে চারলি কোম্পানি অবাঙালি ইপিআর দ্বারা ২৭ এর রাতে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে ছত্রভঙ্গ হয়। কোম্পানি কমান্ডার মেজর নুরুল ইসলাম পরের দিন বাঙালি ইপিআর এবং কোম্পানি জোয়ানদের সংগঠিত করে পাকিস্তানিদের নিরস্ত্র ও বন্দি করতে সক্ষম হন। ২৮ মার্চের ভোর রাতে মেজর শফিউল্লাহ তার দলবল নিয়ে ময়মনসিংহের



মেজর শফিউল্লাহ



মেজর মঈন



লেঃ হেলাল মোর্শেদ

আমরা ভুলিনি তোমাদের - পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে
সফল বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী ২ ইস্ট বেঙ্গলের কিছু গর্বিত মুখ

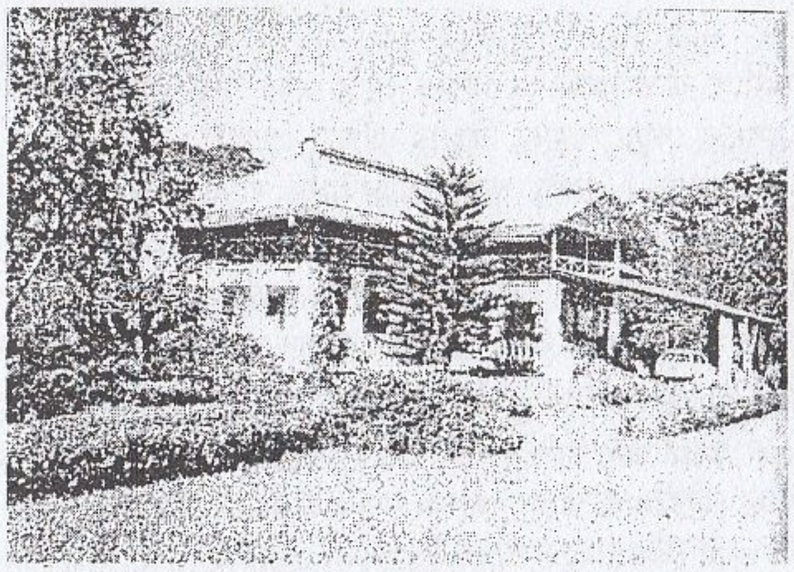
দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। মুক্তাগাছায় মূল দলের সাথে লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদের কোম্পানি মিলিত হয়। বেলা তিনটার দিকে মেজর নুরুল ইসলামের কোম্পানিও শফিউল্লার সাথে যোগ দেয়। ইতোমধ্যে মেজর মঈনুল হোসেন বাকি জোয়ানসহ পৌঁছে যান ময়মনসিংহে।





ফিরে আসা যাকা প্রসঙ্গে। লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনের এ ছোট দলটি শেষপর্যন্ত পৌঁছল টি গার্ডেনে। ওখানে লে. হোসেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সৈনিকদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। তার দেখা হলো মেজর মঈনের সাথে। জিপে করে কোথাও যাচ্ছিলেন কিংবা ফিরছিলেন তিনি। লেফটেন্যান্ট হোসেনকে দেখে থামলেন। পরিচিতি হলেন তারা দু'জন। আচরণে একটা সহজ সরল ভাব আছে মেজর মঈনের মধ্যে। তিনি উঠিয়ে নিলেন এ তরুণ লেফটেন্যান্টকে। চললেন টি গার্ডেনের মধ্য দিয়ে। এঁকে বেঁকে রাস্তা ধরে উঠে এলেন ছবির মতো সুন্দর বাংলোর সামনে। জিপ দাঁড়াতেই নামলেন জিপ থেকে ওরা দু'জন।

এ বাংলোটা বিরাট। হলো ঘরটা দেখার মতো। দোতলায়ও দু'টো কামরা, বেশ সাজানো গোছানো। তবে ও দু'টো মেজর শফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মোশাররফের জন্য রিজার্ভ রাখা হলো। এ বাংলোতেই হোসেনের দেখা হলো ক্যাপ্টেন মুক্তার কামাল চৌধুরীর সাথে। মুক্তার কামাল তখন ২ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার।



মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত তেলিয়পাড়া টি গার্ডেনের ম্যানেজার বাংলো ।



মেজর শফিউল্লাহ



মেজর মঈন



লেঃ হেলাল মোর্শেদ

আমরা ভুলিনি তোমাদের - পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে
সফল বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী ২ ইস্ট বেঙ্গলের কিছু গর্বিত মুখ

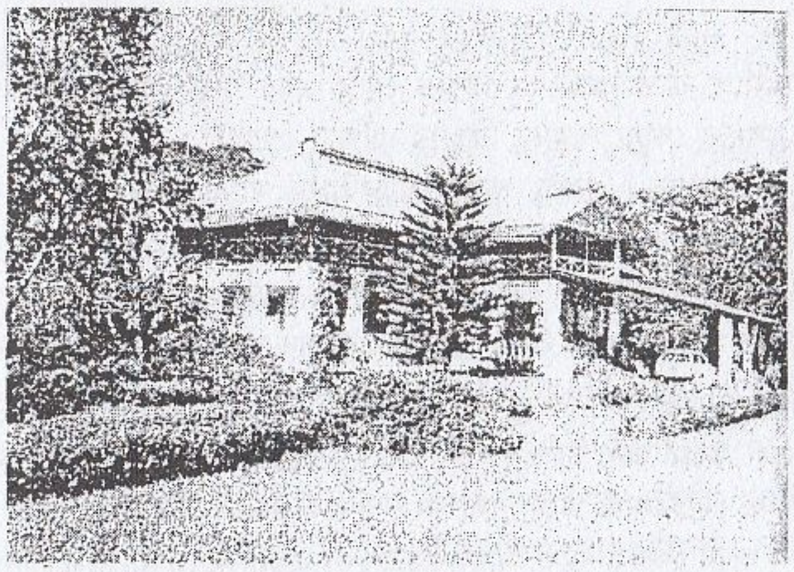
দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। মুক্তাগাছায় মূল দলের সাথে লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদের কোম্পানি মিলিত হয়। বেলা তিনটার দিকে মেজর নুরুল ইসলামের কোম্পানিও শফিউল্লার সাথে যোগ দেয়। ইতোমধ্যে মেজর মঈনুল হোসেন বাকি জোয়ানসহ পৌঁছে যান ময়মনসিংহে।





ফিরে আসা যাকা প্রসঙ্গে। লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনের এ ছোট দলটি শেষপর্যন্ত পৌঁছল টি গার্ডেনে। ওখানে লে. হোসেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সৈনিকদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। তার দেখা হলো মেজর মঈনের সাথে। জিপে করে কোথাও যাচ্ছিলেন কিংবা ফিরছিলেন তিনি। লেফটেন্যান্ট হোসেনকে দেখে থামলেন। পরিচিতি হলেন তারা দু'জন। আচরণে একটা সহজ সরল ভাব আছে মেজর মঈনের মধ্যে। তিনি উঠিয়ে নিলেন এ তরুণ লেফটেন্যান্টকে। চললেন টি গার্ডেনের মধ্য দিয়ে। এঁকে বেঁকে রাস্তা ধরে উঠে এলেন ছবির মতো সুন্দর বাংলোর সামনে। জিপ দাঁড়াতেই নামলেন জিপ থেকে ওরা দু'জন।

এ বাংলোটা বিরাট। হলো ঘরটা দেখার মতো। দোতলায়ও দু'টো কামরা, বেশ সাজানো গোছানো। তবে ও দু'টো মেজর শফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মোশাররফের জন্য রিজার্ভ রাখা হলো। এ বাংলোতেই হোসেনের দেখা হলো ক্যাপ্টেন মুক্তার কামাল চৌধুরীর সাথে। মুক্তার কামাল তখন ২ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার।



মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত তেলিয়পাড়া টি গার্ডেনের ম্যানেজার বাংলো ।

As a rule of nature water flows to the sea and in this crisis all roads of these two battalions led to Teliapara Tea Garden–একটা সরস উক্তি একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধার।

তেলিয়াপাড়ায় সবার মধ্যে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল। কাজের মধ্যে একটা এলোমেলো ভাব। একটা সাজানো বাগানে বন্য হাতি ঢুকে সব তচনচ করে দিলে মালিককে বাগান গোছাতে বেগ পেতে হয় বইকি। আপাতত ইস্ট বেঙ্গলের এখানকার জোয়ানরা পাকিস্তানিদের সাথে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে না এটা ঠিক। তবে উত্তেজনার চাপা স্রোত বয়ে যাচ্ছে সবার মাঝে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো। কখনো কখনো তা আবার প্রকাশ হয়ে পড়ছে কারো কারো আচরণে। অনেকেই পিস্তল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মেডিকেল টিমের এ নবীন যোদ্ধা অবশ্য তার পিস্তল খাপমুক্ত করেননি। তবে ওদের উত্তেজনা ও আবেগ তার মাঝেও সঞ্চারিত হচ্ছে অজান্তেই। এ উত্তেজনা যেন এক অমোঘ নিয়তি।

টি গার্ডেনে যোদ্ধাদের আবার নতুন জীবন শুরু হলো। টেন্টে এমআই রুম লাগান হলো সঠিকভাবে যেখানে অসুস্থ সৈনিকের চিকিৎসা হবে। রোগী নেই বললেই চলে। তবে ১৬ কিংবা ১৭ এপ্রিলের একটা ঘটনা মনে করার মতো। বিকাল তিনটা কি সাড়ে তিনটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন অনেকেই। সে সময় ক্যাপ্টেন নাসিম (পরবর্তীকালে তিনি সেনাপ্রধান হন) জনাকয়েক সৈনিকসহ কোথাও যাচ্ছেন। এদের ড্রেস গেরিলা টাইপ, যার যে রকম খুশি, সামরিক এবং বেসামরিক মিলিয়ে। তবে সবাই সশস্ত্র। লেফটেন্যান্ট হোসেনকে দেখতেই তিনি বললেন – ডক্টর উঠুন। হোসেনও তিনিও কিছু জিজ্ঞেস না করেই তাঁর পাশে উঠে বসলেন।

পিকআপে করে তারা চা বাগান থেকে বের হয়ে এলেন। উঠলেন বড় রাস্তায়। সেখান থেকে সামান্য কিছুদূর এগিয়ে গেলেই মনতলা বাজার। দলটি পৌঁছল সে বাজারে। একটা পাকা গোডাউনের মতো বাড়ি দেখেই ক্যাপ্টেন নাসিম বললেন – ঘেরাও কর। লেফটেন্যান্ট হোসেনের হাতেও পিস্তল। ক্যাপ্টেন নাসিমের পিছু পিছু ঢুকলেন তিনি বাড়ির মধ্যে। হঠাৎ করেই শুরু হলো গুলির শব্দ। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লেফটেন্যন্ট হোসেন ঢুকলেন একা একটা কক্ষে।

হঠাৎ কয়েকজন সৈনিক ঢুকে পড়লো সেখানে এবং লেফটেন্যান্ট হোসেনকে দেখেই গুলি করার জন্য হাতের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলো। তিনি ভড়কে গেলেও বুদ্ধি হারালেন না। চিৎকার করে বললেন – এই করছ কী! আমি তোমাদেরই অফিসার। আমি লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন। এরই মধ্যে ক্যাপ্টেন নাসিম এসে গেলেন। থামালেন সৈনিকদের। এ যাত্রা একটা বড় ফাঁড়া কাটল তার।



আসলে এসেছিল ওরা একজন রাজাকারকে ধরতে এবং তার গুদাম থেকে প্রয়োজনীয় চাল, ডাল ইত্যাদি নিয়ে যেতে। হুকুম ছিল রাজাকারের ছেলেও থাকতে পারে এবং তাকেও অ্যারেস্ট করতে হবে। যেহেতু ক্যাপ্টেন নাসিমের সাথের কোনো সৈনিক এর আগে দেখেনি হোসেনকে তাই ঘটতে চলছিল এ অঘটন।

গুলির শব্দের কারণও জানা গেলো কিছুক্ষণের মধ্যে। ওরা যখন রাজাকারটাকে অ্যারেস্ট করতে ঘরে ঢুকে সাথে সাথে সে তার পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায়। তো, যা হবার তা-ই হলো। শোধ বোধ হলো জীবন দিয়ে। সৈনিকরা সম্ভবত লেফটেন্যান্ট হোসেনকে সেই লোকের ছেলে ভেবে ভুল করেছে। আর যেহেতু সে মুহূর্তে তার পরনে কোনো ইউনিফরম ছিল না তাই ওদের সন্দেহটা হয়েছে প্রবল।

একাত্তরের এপ্রিল। ২ এবং ৪ ইস্ট বেঙ্গলের কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনকে কেন্দ্র করে। সেদিন ১৬ কিংবা ১৭ এপ্রিল। অফিসারবৃন্দ ভোরের নাস্তা করছেন সবাই মিলে। ক্যাপ্টেন নাসিম মেজর শফিউল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন – স্যার, আমার ঘাড়ে ব্যথা। মেজর শফিউলাহ ২ ইস্ট বেঙ্গলের মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন কামালের কাছে কারণ জানতে চাইলেন। জবাবে তিনি বললেন – নাসিমের ঘাড়ে ফরেন বডি রয়ে গেছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল আশুগঞ্জে, পাকিস্তানি এয়ার স্ট্রাইকের সময়। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ২ ইস্ট বেঙ্গল যখন পাকিস্তানিদের থাম্ব দেখিয়ে সদলবলে কিশোরগঞ্জ থেকে বি.বাড়িয়ায় চলে আসছিল, তারই এক পর্যায়ের ঘটনা এটা। যা হোক, মেজর শফিউল্লাহ তখন ক্যাপ্টেন কামালকে বললেন – নাসিমকে নিয়ে আগরতলা যান। ওখানকার হাসপাতালে দেখিয়ে আনুন ওকে। ক্যাপ্টেন কামাল জবাবে বললেন – I don't know Agartala.

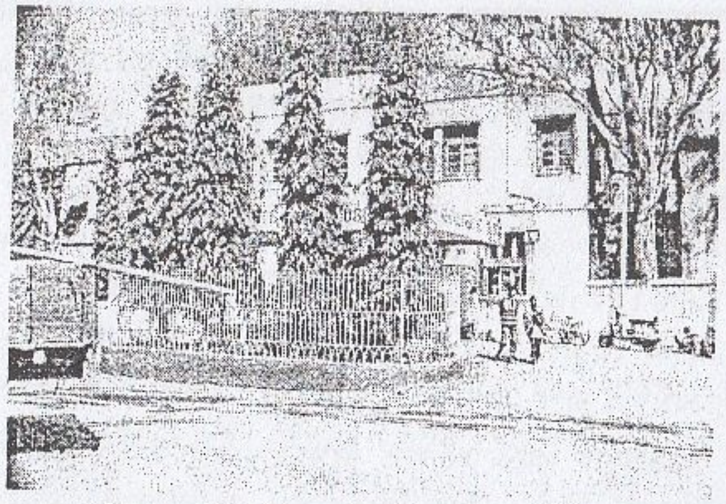
লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন তখন বললেন – আমি নিয়ে যেতে পারি। কোনো অসুবিধা হবে না।

মেজর শফিউল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন যাবার জন্য। নাস্তা শেষে তিনি ক্যাপ্টেন নাসিমকে নিয়ে একটা জিপ যোগে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়না করছেন। পথে ক্যাপ্টেন নাসিম লেঃ হোসেনের কাছে জানতে চাইলেন তিনি কখনো আগরতলা গিয়েছেন কিনা এর আগে। জবাবে তিনি বললেন– না। তা হলে? প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন ক্যাপ্টেন নাসিম, অবাকও হয়েছেন বেশ। জবাবে তাকে আশ্বস্ত করে হোসেন বললেন– কোনো অসুবিধা হবে না। যে কোনো দেশে হাসপাতালের লোকেশন সবাই জানে। সহজেই বের করে নেয়া যাবে।

তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেনের আঁকা বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চললো জিপ। কিছুক্ষণ পরই ওরা দু'জন ইন্ডিয়ান টেরিটরিতে চলে এলেন। ওদের সাথে বিএসএফ এর যোগাযোগ ছিল ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। ইন্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি

ফোর্সের বিওপিতে (বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট) এ দু'জন অফিসারের যাত্রার কথা জানানো হয়েছিল। চা বাগানের সৌন্দর্যে মন কাড়ে কিন্তু সাধারণ পায়ে চলা পথে জিপের উপর ঝাঁকি খেতে খেতেই বিওপিতে পৌঁছতে হলো ওদের। বাগানের মনকাড়া সৌন্দর্য আর উপভোগ করেন কী ভাবে!

বর্ডার পার হতে ভারতীয়রা ভদ্রতা তো দেখালোই এবং সাথে সাথে এসকর্ট করে মেইন রোড পর্যন্ত পৌঁছে দিল। বড় রাস্তায় পৌঁছে গেলে নাসিম আর হোসেনের পথ চলায় আর কোনো কষ্ট হলো না। মসৃণ পথ ধরে আগরতলা শহরের দিকে এগিয়ে চললেন ওরা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন শহরে, দিনের উজ্জ্বল আলোয় পথ দেখতে দেখতে। এ শহরটা তখন তেমন আহা মরি উন্নত ছিল না। প্রায় বাংলাদেশের আর দশটা সাব - ডিভিশনাল শহরের মতোই। পথে প্রথম যে ট্রাফিক পুলিশ পেলো, তার কাছে থেমে আগরতলা সরকারি হাসপাতালের অবস্থান জানতে চাইলেন ওরা। সে হাত তুলে দিক নির্দেশ করলো। হাসপাতালটা শহরের এক প্রান্তে। কিন্তু ওদের সেখানে পৌঁছতে অসুবিধা হলো না। জিপে করে পৌঁছে গেলেন সেখানে অনায়াসেই। আগরতলার এক প্রান্তে রাস্তার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে জিবি হসপিটাল। নিরিবিলি পরিবেশ।



মুক্তিযুদ্ধের কঠিন দিনগুলোয় মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায়
উলেখযোগ্য অবদান রাখে আগরতলার জিবি হসপিটাল

জি এবং বি তে কি হয় তা মনে করতে পারলেন না লে. হোসেন। তখন কে - ই বা অতো খোঁজ খবর নেয়। তারা দু'জন হেঁটে রিসেপশনে চলে এলেন। নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে লে. আবুল হোসেন বললেন – We belong to Bangladesh Mukti Bahini and I am a doctor.

রিসেপশনে যারা ছিল তারা যথেষ্ট ভদ্রতা করলো ওদের। বাংলাদেশের চলমান ঘটনার সাথে ভারতের সাধারণ জনগণও বেশ ওয়াকিফহাল। হাসপাতাল স্টাফরা দেরি না করে এ দু'জন অফিসারকে হাসপাতালের পরিচালকের কাছে



নিয়ে গেলো। ওদের পরিচয় নিয়ে আর কোথাও ঘোরাঘুরি করতে হলো না। পরিচালক নিজে উদ্যোগী হয়ে ক্যাপ্টেন নাসিমের ঘাড়ের X-ray করালেন। ফিল্ম দেখে বললেন – Yes, Foreign body is seen. The treatment is operation. In that case you need to stay here for two days. But for the time being it can be held up too.

তারপর একটু থেমে বললেন – You are important officers of Joi Bangla. I need to talk to my appropriate authority for permission.

ক্যাপ্টেন নাসিম লেফটেন্যান্ট হোসেনকে ডেকে বললেন – চলো, ফিরে যাই।

বিলম্ব না করে ফিরে চললেন ওরা দু'জন। যখন হাসপাতালের করিডোরে এলেন ওরা দেখলেন দিনের হাসি তখনো অম্লান। শেষে দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন আগরতলা শহরটা একটু ঘুরে দেখবেন। একজন ভদ্রলোক হাসপাতালের বারান্দায় এগিয়ে এসে তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। বললেন – I am very happy to see Joi Bangla soldiers. I can take you to the town if you want to see it.

লেফটেন্যান্ট হোসেন খানিকটা ইতস্তত করলেও ক্যাপ্টেন নাসিম রাজি হলেন। ভদ্রলোককে সাথে করে জিপে উঠলেন দু'জনে। তারপর শহরে চলে এলেন তরুণ যোদ্ধারা।

আসলে ওদের দেখার মতো এ শহরে তেমন কিছু নেই। এখন হয়তো থাকতে পারে তবে একাত্তরে ওদের কাছে আগরতলাকে শহর হিসাবে অতি সাধারণ বলে মনে হয়েছে। তবে অসাধারণ ছিল লোকজনের আন্তরিকতা। দু'জনে সামান্য কেনাকাটাও করলেন। দেখতে দেখতে চলে এল. ফেরার পালা। সন্ধ্যা নামছে, ফিরতে হবে তেলিয়াপাড়া। কিন্তু তাদের সাথের ভদ্রলোক বিনয়ের সাথে তাঁর বাসায় এক কাপ চা খাবার অনুরোধ জানালেন। লেফটেন্যান্ট হোসেনের বাড়ি নরসিংদি শুনে তাকে উচ্ছ্বসিত মনে হলো। বহুদিন তিনি নরসিংদির লোক দেখেননি। বিয়ে করেছেন সেখানেই। কাজেই বন্ধনটা ভেঙে যায়নি একেবারে। ভালোবাসা রয়ে গেছে অটুট, মনের গোপন অঙ্গনে, একান্ত নিভৃতে। ভদ্রলোকের নাম মনে নেই। বাসা কাছেই। ওরা দু'জন গেলেন তাঁর বাসায়। এড়ানো গেলো না তাঁর অনুরোধ। আর যে অনুরোধে হৃদয়ের ছোঁয়া থাকে তা কি সহজে এড়ানো যায় ?

শেষে ওরা দু'জন ঢুকলেন ভদ্রলোকের বাড়িতে। সুন্দর করে গোছানো ড্রইংরুম। আকর্ষণীয় ও দামি জিনিসপত্র। দেখলেই বোঝা যায় একটা স্বচ্ছল পরিবার এটা। ওদের কথা শুনে ভদ্রলোকের শ্বাশুড়ি বের হয়ে এলেন ভেতর থেকে। তখন এ পরিবারের আনন্দ উল্লাসের পর্যায়ে পৌঁছলো। নরসিংদির লোক, তার উপর আবার জয় বাংলার অফিসার। এক কথায় সোনায় সোহাগা।

যোদ্ধাদের সময় নেই শুনে মা মেয়ে দু'জনেই ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তারা মিনি রান্নাঘর নিয়ে ঢুকলেন ড্রয়িংরুমে। সেখানেই চুলা জ্বালিয়ে চা

বানালেন। বেলুন চালালেন দ্রুত। পুরির মতো কি যেন একটা ভাজলেন। এরা দু'জন তাদের বানানো দেখেছেন। মা মেয়ে হাসছেন, যোদ্ধাদের এটা সেটা প্রশ্ন করছেন। কখনো আবার করছেন স্মৃতিচারণ।

ওরা দু'জন দেখছেন তাদের কাজ। এ পরিবারে যেন বাঁধ ভাঙা হাসি বাসা বেঁধেছে। ভদ্রলোকও টুকটাক কাজ করছেন। কিন্তু এর মাঝেও তাঁর মনোযোগ যোদ্ধাদের দিকে। যতটুকু সময় ওরা দু'জন থাকলেন ভদ্রলোকের বাড়িতে, পুরো সময়টাই পরিবারের সকল সদস্য ওদের ভালোবাসার সঙ্গ দিয়ে ভরে দিতে চাইলেন। যোদ্ধারা হলেন অভিভূত। এভাবে অন্তরের ছোঁয়া ক'জনে দিতে পারে। কিন্তু ফেরার তাকাদা আছে, তাই উঠতে হলো ওদের।

পুরো পরিবার এগিয়ে এলো দরজা পর্যন্ত যোদ্ধাদের বিদায় জানাতে। বারবার বললো আগরতলা এলে যেন আবার দেখা করেন। সম্মতি জানালেন সেদিনের যোদ্ধারা। কিন্তু সময়ের প্রবাহে এ দু'জনার একসঙ্গে আর আগরতলা যাওয়া হয়নি।

সন্ধ্যা পার হয়েছে। ক্যাপ্টেন নাসিম আর লেফটেন্যান্ট হোসেন জিপে চেপে বসলেন। হেডলাইটের আলোয় অন্ধকারকে দু'ভাগ করে ছুটে চলেছে জিপ। ফেলে আসা পথে চলেছেন ওরা আবার। সেই চা বাগান, এবড়ো থেবড়ো পথ, এক সময় পার হয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশের মাটিতে। ক্লান্ত ছিলেন ওরা কিন্তু তারপরও কেন যেন ভাল লাগতে থাকলো। ফিরে এসেছেন নিজেদের মাটিতে। আহা এ যে একান্ত আপনার, নিজের জন্মভূমি! ভাদ্রের মাটির সোদা গন্ধ কী এখনো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে!

কোন সন্দেহ নেই দেশের জন্য ভালোবাসার এ অনুভূতিই আমাদের সকলকে শ্রেষ্ঠ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে মহান একাত্তরে। ত্যাগের আর বীরত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করেছে একটা পুরো জাতিকে। তরুণ যোদ্ধারা ক্যাম্পে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। ক্লান্তিতে ভেঙে এসেছে শরীর। কখন যে ওরা ঘুমিয়ে গেলেন বলতে পারবেন না। তবে হোসেন উঠলেন পরের দিন সূর্যের মুখ দেখে।

দিন এগিয়ে চললো যথারীতি। তার উপর রোগীর তেমন চাপ নেই। এক সময় শুনলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী এসেছেন এখানে, তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। দেখবেন এবং আলোচনা করবেন অফিসারদের সাথে। ব্যাটালিয়নের সিগন্যাল সেন্টার পাকিস্তানি বার্তা রেগুলার মনিটর করতো। অয়্যারলেস কোড ভাঙা কোনো জটিল কাজ ছিল না তাদের জন্য। মেসেস ডি-কোড করে ওরা জানালো পাকিস্তানি ফাইটার ঢাকা থেকে টেক অফ করছে। লক্ষ্য সম্ভবত তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেন। শুনে সর্বাধিনায়ক উঠলেন তড়িঘড়ি করে। সে সময় তাঁর বাহন জিপটা ওখানে ছিল না। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। যে জিপ সামনে পেলেন তাতেই চেপে বসলেন। দ্রুত চলে গেলেন নিরাপদ স্থানে। যেতে যেতে বললেন - Probably they are chasing me.



আসলে তিনি কোনো ঝুঁকি নেন নি। ঝুঁকি নিলে তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার উৎসমূলে আঘাত হেনে বসতে পারতো।

তবে এ লোকেশনের কারো মধ্যে তেমন কোনো তাড়াহুড়ার ভাব নেই। ভাবটা যেন – যা হবার হোক না। লোকজনের মধ্যে এক্সট্রা সিকিউরিটির জন্য কোনো ব্যস্ততাও নেই। শেষ পর্যন্ত এয়ার অ্যাটাক হলো না। যেন হবে না এরকমটা ধরেই নিয়েছে সবাই, দুই এবং চার ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার এবং জওয়ানরা।



দ্রুত সংগঠিত হয়ে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিবেশী দেশ ভারত নৈতিক সমর্থন শুধু অব্যাহতই রাখেনি বরং সকল ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে তারা। এখন আর এই যুদ্ধকে কেউ দুস্কৃতকারীর কাজ বলে আখ্যায়িত করলেও কিছু এসে যায় না। কারণ সশস্ত্র সংগ্রাম এখন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফসল। শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানিরা বন্দি করেছে বটে কিন্তু তার রাজনৈতিক কর্মীদের নিঃশেষ করতে সক্ষম হয়নি। বেশ কিছু নেতা পৌঁছে গেছেন ভারতে। শোনা গেলো ৪ এপ্রিলে তাজউদ্দিন আহমেদ দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে তাদের সার্বিক সাহায্য কামনা করেছেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করতে পারবে।

৬ এপ্রিলে তাজউদ্দিন পিএন হাকসারের সাথে একান্তে বৈঠক করেন। মি. হাকসার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শদাতা। ৭ এপ্রিলে তাজউদ্দিন আহমেদ পুনরায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। সে বৈঠকে রাজনৈতিক নেতা ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারীদের ভারতের মাটিতে আশ্রয় ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার সম্মতি লাভ করলেন। এরই মধ্যে প্রায় দু'শতাধিক আওয়ামী লীগের উপস্থিত জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত হলো বঙ্গবন্ধুকে নেতৃত্বে রেখে বাংলাদেশ সরকার। ১০ এপ্রিল পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি

বানালেন। বেলুন চালালেন দ্রুত। পুরির মতো কি যেন একটা ভাজলেন। এরা দু'জন তাদের বানানো দেখেছেন। মা মেয়ে হাসছেন, যোদ্ধাদের এটা সেটা প্রশ্ন করছেন। কখনো আবার করছেন স্মৃতিচারণ।

ওরা দু'জন দেখছেন তাদের কাজ। এ পরিবারে যেন বাঁধ ভাঙা হাসি বাসা বেঁধেছে। ভদ্রলোকও টুকটাক কাজ করছেন। কিন্তু এর মাঝেও তাঁর মনোযোগ যোদ্ধাদের দিকে। যতটুকু সময় ওরা দু'জন থাকলেন ভদ্রলোকের বাড়িতে, পুরো সময়টাই পরিবারের সকল সদস্য ওদের ভালোবাসার সঙ্গ দিয়ে ভরে দিতে চাইলেন। যোদ্ধারা হলেন অভিভূত। এভাবে অন্তরের ছোঁয়া ক'জনে দিতে পারে। কিন্তু ফেরার তাকাদা আছে, তাই উঠতে হলো ওদের।

পুরো পরিবার এগিয়ে এলো দরজা পর্যন্ত যোদ্ধাদের বিদায় জানাতে। বারবার বললো আগরতলা এলে যেন আবার দেখা করেন। সম্মতি জানালেন সেদিনের যোদ্ধারা। কিন্তু সময়ের প্রবাহে এ দু'জনার একসঙ্গে আর আগরতলা যাওয়া হয়নি।

সন্ধ্যা পার হয়েছে। ক্যাপ্টেন নাসিম আর লেফটেন্যান্ট হোসেন জিপে চেপে বসলেন। হেডলাইটের আলোয় অন্ধকারকে দু'ভাগ করে ছুটে চলেছে জিপ। ফেলে আসা পথে চলেছেন ওরা আবার। সেই চা বাগান, এবড়ো থেবড়ো পথ, এক সময় পার হয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশের মাটিতে। ক্লান্ত ছিলেন ওরা কিন্তু তারপরও কেন যেন ভাল লাগতে থাকলো। ফিরে এসেছেন নিজেদের মাটিতে। আহা এ যে একান্ত আপনার, নিজের জন্মভূমি! ভাদ্রের মাটির সোদা গন্ধ কী এখনো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে!

কোন সন্দেহ নেই দেশের জন্য ভালোবাসার এ অনুভূতিই আমাদের সকলকে শ্রেষ্ঠ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে মহান একাত্তরে। ত্যাগের আর বীরত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করেছে একটা পুরো জাতিকে। তরুণ যোদ্ধারা ক্যাম্পে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। ক্লান্তিতে ভেঙে এসেছে শরীর। কখন যে ওরা ঘুমিয়ে গেলেন বলতে পারবেন না। তবে হোসেন উঠলেন পরের দিন সূর্যের মুখ দেখে।

দিন এগিয়ে চললো যথারীতি। তার উপর রোগীর তেমন চাপ নেই। এক সময় শুনলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী এসেছেন এখানে, তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। দেখবেন এবং আলোচনা করবেন অফিসারদের সাথে। ব্যাটালিয়নের সিগন্যাল সেন্টার পাকিস্তানি বার্তা রেগুলার মনিটর করতো। অয়্যারলেস কোড ভাঙা কোনো জটিল কাজ ছিল না তাদের জন্য। মেসেস ডি-কোড করে ওরা জানালো পাকিস্তানি ফাইটার ঢাকা থেকে টেক অফ করছে। লক্ষ্য সম্ভবত তেলিয়াপাড়া টি গার্ডেন। শুনে সর্বাধিনায়ক উঠলেন তড়িঘড়ি করে। সে সময় তাঁর বাহন জিপটা ওখানে ছিল না। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। যে জিপ সামনে পেলেন তাতেই চেপে বসলেন। দ্রুত চলে গেলেন নিরাপদ স্থানে। যেতে যেতে বললেন - Probably they are chasing me.



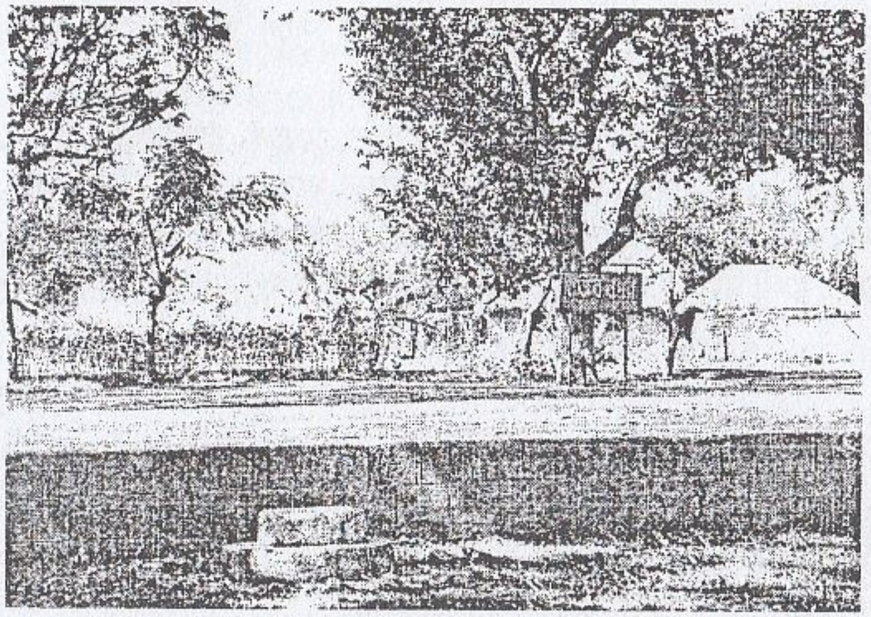
আসলে তিনি কোনো ঝুঁকি নেন নি। ঝুঁকি নিলে তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার উৎসমূলে আঘাত হেনে বসতে পারতো।

তবে এ লোকেশনের কারো মধ্যে তেমন কোনো তাড়াহুড়ার ভাব নেই। ভাবটা যেন – যা হবার হোক না। লোকজনের মধ্যে এক্সট্রা সিকিউরিটির জন্য কোনো ব্যস্ততাও নেই। শেষ পর্যন্ত এয়ার অ্যাটাক হলো না। যেন হবে না এরকমটা ধরেই নিয়েছে সবাই, দুই এবং চার ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার এবং জওয়ানরা।



দ্রুত সংগঠিত হয়ে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিবেশী দেশ ভারত নৈতিক সমর্থন শুধু অব্যাহতই রাখেনি বরং সকল ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে তারা। এখন আর এই যুদ্ধকে কেউ দুস্কৃতকারীর কাজ বলে আখ্যায়িত করলেও কিছু এসে যায় না। কারণ সশস্ত্র সংগ্রাম এখন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফসল। শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানিরা বন্দি করেছে বটে কিন্তু তার রাজনৈতিক কর্মীদের নিঃশেষ করতে সক্ষম হয়নি। বেশ কিছু নেতা পৌঁছে গেছেন ভারতে। শোনা গেলো ৪ এপ্রিলে তাজউদ্দিন আহমেদ দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে তাদের সার্বিক সাহায্য কামনা করেছেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করতে পারবে।

৬ এপ্রিলে তাজউদ্দিন পিএন হাকসারের সাথে একান্তে বৈঠক করেন। মি. হাকসার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শদাতা। ৭ এপ্রিলে তাজউদ্দিন আহমেদ পুনরায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন। সে বৈঠকে রাজনৈতিক নেতা ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারীদের ভারতের মাটিতে আশ্রয় ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার সম্মতি লাভ করলেন। এরই মধ্যে প্রায় দু'শতাধিক আওয়ামী লীগের উপস্থিত জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ বিপ্লবী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে গঠিত হলো বঙ্গবন্ধুকে নেতৃত্বে রেখে বাংলাদেশ সরকার। ১০ এপ্রিল পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি



স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাসের মাইল ফলক - ঐতিহাসিক মুজিব নগর

মাইল ফলক হয়ে এলো। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করে সেদিন। এ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে নিশ্চিত করে। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানে বন্দি থাকলেও তাকে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিযুক্ত হন ভাইস প্রেসিডেন্ট আর তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী। তবে দেশের প্রেসিডেন্টের অনিবার্য অনুপস্থিতির কারণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব এবং নির্বাহী ক্ষমতা লাভ করেন।

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ বিশ্বের কাছে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আমবাগানে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিত হন বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দ। বৈদ্যনাথতলা গ্রাম হয়ে যায় স্বাধীনতার অন্যতম অংশ, নাম পেয়ে যায় মুজিবনগর। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর কয়েক প্লাটুন সদস্য এবং মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গার্ড অব অনারের ব্যবস্থা করা হয়।

অনুষ্ঠান সকাল ১১ ঘটিকায় শুরু হয়। যখন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন তখন কিছু শিল্পী সমস্বরে গেয়ে উঠেন...

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি

বাংলাদেশিরা তখন আনন্দে উৎফুল্ল, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাংলাদেশ। সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন তার মন্ত্রিপরিষদকে উপস্থিত সকলের কাছে। তারপর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দিলেন সকলের উদ্দেশ্যে। এর পর এলো প্রধানমন্ত্রির



পালা। তিনি প্রেস কনফারেন্সে কথা বললেন উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে। আমরাও পরিচিত হয়ে নিই মুজিবনগরে গঠিত প্রথম বাংলাদেশ সরকারের সাথে।

| | | |
|---|---|---|
| প্রেসিডেন্ট | : | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান |
| ভাইস প্রেসিডেন্ট | : | সৈয়দ নজরুল ইসলাম |
| প্রধানমন্ত্রী | : | তাজউদ্দীন আহমেদ |
| বিদেশ এবং আইনমন্ত্রী | : | খন্দকার মোশতাক আহমেদ |
| অর্থমন্ত্রী | : | এম মনসুর আলী |
| স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় | : | এ এইচ এম কামরুজ্জামান |
| কমান্ডার-ইন চীফ অব আর্মড ফোর্সেস | : | কর্ণেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী |
| চীফ অব আর্মি স্টাফ | : | লেঃ কর্ণেল এম. আবদুর রব |
| **বিভাগীয় প্রধানগণ** | : | আবদুল মান্নান (প্রেস, তথ্য, বেতার এবং ফিল্ম)<br>প্রফেসর ইউসুফ আলী (ত্রাণ ও পুনর্বাসন)<br>মতিউর রহমান (বাণিজ্য)<br>ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম (ভলান্টিয়ার কোর)। |

**বিভিন্ন জোনের চেয়ারম্যানগণ** : প্রফেসর নুরুল ইসলাম চৌধুরী, এমএনএ এবং জহুর আহমেদ চৌধুরী, এমপিএ (দক্ষিণ-পূর্ব), দেওয়ান ফরিদ গাজী, এমএনএ এবং শামসুর রহমান খান (উত্তর-পূর্ব), লে. কর্নেল এমএ রব, এমএনএ (পূর্ব), মতিউর রহমান এবং আবদুর রউফ, এমএনএ (উত্তর), আজিজুর রহমান এবং আশরাফুল ইসলাম, এমএনএ (পশ্চিম), এমএ রউফ চৌধুরী, এমপিএ এবং ফনিভূষণ মজুমদার, এমপিএ (দক্ষিণ-পশ্চিম)।

**জোনাল অফিসের অফিসার - ইন - চার্জগণ:** ফয়েজউদ্দিন আহমেদ, এস এ সামাদ, কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ ও আবদুর রব সেরানিয়াবাত

**মুজিবনগর সেক্রেটারিয়েট :**

| | | |
|---|---|---|
| মুখ্য সচিব | : | রুহুল কুদুস |
| সংস্থাপন সচিব | : | নুরুল কাদের খান |
| স্বরাষ্ট্র সচিব | : | আবদুল খালেক |
| প্রতিরক্ষা সচিব | : | আবদুস সামাদ |
| তথ্য সচিব | : | আনোয়ারুল হক খান |
| পররাষ্ট্র সচিব | : | মাহবুবুল আলম চাষী |
| ক্যাবিনেট সচিব | : | হোসেন তৌফিক ইমাম |
| তথ্য সচিব | : | খন্দকার আসাদুজ্জামান |
| কৃষি সচিব | : | নুরউদ্দিন আহমেদ |

**বিদেশে নিয়োজিত দূত :**

| | | |
|---|---|---|
| বিশেষ দূত | : | বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী |
| দিলিতে মিশন প্রধান | : | হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী |
| কলকাতায় মিশন প্রধান | : | এম. হোসেন আলী |

**প্লানিং কমিশন :**

| | | |
|---|---|---|
| চেয়ারম্যান | : | মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী |
| সদস্য | : | ড. মোশাররফ হোসেন |
| | | ড. আনিসুজ্জামান |
| | | ড. খান সারওয়ার মুরশিদ |
| | | ড. স্বদেশ রঞ্জন |

**এছাড়াও পরিচালকদের মধ্য আছেন**

| | | |
|---|---|---|
| পরিচালক ইয়ুথ ক্যাম্প | : | উইং কমান্ডার এস আর মির্জা |
| পরিচালক ইনফরমেশন ও পাবলিসিটি | : | এম আর আখতার মুকুল |
| পরিচালক ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম | : | আবদুল জব্বার খান |
| পরিচালক আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন | : | কামরুল হাসান |
| রিলিফ কমিশনার | : | জে জি ভৌমিক |
| পরিচালক হেলথ | : | ডা. টি হোসেন |
| সহকারী পরিচালক হেলথ | : | ডা. আহমেদ আলী |

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ব্যক্তিবর্গ হলেন : আশফাকুর রহমান খান, শহীদুল ইসলাম, টি এইচ শিকদার, বেলাল মোহাম্মদ, তাহের সুলতান, কামাল লোহানী, আলী জাকের, আলমগীর কবির, জাহিদ সিদ্দিকী, সমর দাস, অজিত রায়, সৈয়দ হাসান ইমাম, আশরাফুল আলম, সৈয়দ আবদুস শাকুর, রেজাউল করিম চৌধুরী (সৌজন্যে : বাংলাপিডিয়া - এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ)

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একই দিনে আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ ১৯৭১ জারি করেন। এই আদেশ বিগত ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। ফলে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে সকল আইন বলবৎ ছিল সে আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষা পেল এ আদেশ বলে।

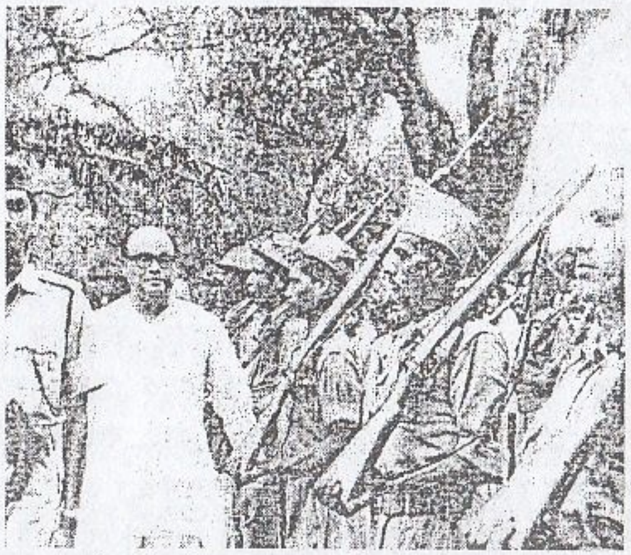


যে স্মৃতি অম্লান – মুজিবনগরে প্রবাসী
বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ

কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী হলো মুজিবনগর নামে। বাংলাদেশ সরকারের এ আনুষ্ঠানিকতা সুসংগঠিত করতে সাহায্য করলো মুক্তিযুদ্ধকে। প্রায় ১২৭ জন দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সালাম গ্রহণ

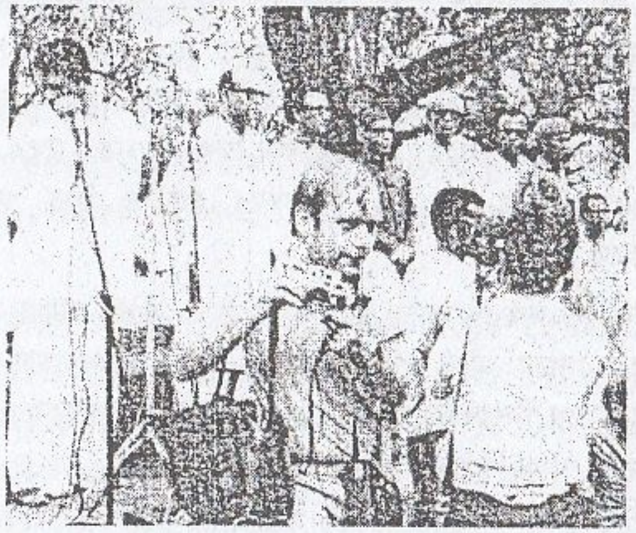


করলেন। এ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার সনদ পাঠ করলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী যিনি তখন আওয়ামী লীগের চীপ হুইপ। ব্যাস্, বাংলাদেশের ঘোষণা সাংগঠনিক রূপ নিয়েছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেছেন – পৃথিবীর মানচিত্রে আজ



মুজিবনগরে গার্ড পরিদর্শন করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্নের সূচনা হলো তা চিরদিন থাকবে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বলেছেন – বাংলাদেশ আজ যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নিষ্পেষনের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ। এটা বাংলাদেশিদের স্বকীয়তার সংগ্রাম, তাদের বাঁচা-মরার সংগ্রাম, তাদের মুক্ত বাতাসে বুক ফুলিয়ে হাঁটার সনদ প্রাপ্তির সংগ্রাম।



বাংলাদেশ আজ বাস্তব - সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন অস্থায়ী রাষ্টপ্রতি

মনটা খুশি খুশি লাগছে। এ যেন বিধ্বস্ত সিন্দাবাদের স্বপ্ন ডিঙা, ক্রমান্বয়ে জোড়া লেগে তৈরি হচ্ছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পারি দিতে। কাণ্ডারিরা প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, সংকল্পে অটল। মাল্লারা বাড়িয়েছে সাহায্যের সহস্র হাত। ঝড়ের মাথায় পা রেখে রেখে এবার পার হবে সমুদ্র।



ঊনিশে এপ্রিল বিকেল। টি গার্ডেনের কাছাকাছি ভারতীয় ভূখণ্ডে একটা হেলিকাপ্টার ল্যান্ড করলো। বাংলাদেশের পক্ষ হতে মেজর শফিউল্লাহ এবং খালেদ মোশাররফ গেলেন অভ্যাগতদের সাথে কথা বলতে। ফিরলেন তারা সংক্ষিপ্ত আলাপের পর। এ আলোচনা ছিল কৌশলগত। এসে জানালেন, দু'টো বেঙ্গল রেজিমেন্টই ভারতীয় এলাকায় চলে যাবে। তাঁরা সুনির্দিষ্ট কারণ বললেন না। তবে এটা স্পষ্ট যে মাত্র দু'টো ব্যাটালিয়ন নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সফল সম্মুখ লড়াই সম্ভব নয়। আপাতত শক্তি সঞ্চয়, তা রক্ষা করা এবং পুনর্গঠন প্রয়োজন। সময়মতো এদের কাজে লাগানো হবে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে।

সারা বিকেল দু'টো ব্যাটালিয়ন দারুণ ব্যস্ততায় সময় কাটালো। আবারও যাত্রার আয়োজন। এবার অবশ্য আর বেশি দেরি হলো না। লাইন আপ হয়ে গেলো দু'টো রেজিমেন্ট। ৪ ইস্ট বেঙ্গলের চেয়ে ২ ইস্ট বেঙ্গলের গাড়ি এবং অস্ত্র সংখ্যা বেশি। ৪ ইস্ট বেঙ্গলেরও অবশ্য একদম কম ছিল তা নয়। তবে পুরাতন গাড়ি ছাড়াও রিকুইজিশন করা কার ও পিকআপ জাতীয় কিছু গাড়ি ছিল এ ব্যাটালিয়নের সাথে।

সত্যিকারের মুভ সন্ধ্যার আগে শুরু হলো না। মুভের আগে সবাই বসে চা পান করছিলেন। মেজর মঈন (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল, রাষ্ট্রদূত এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা) হঠাৎ করে মেজর শফিউলাহকে বললেন – Sir, I want to take Lt Abul Hossain with our battalion.

মেজর শফিউল্লাহ একটু ভাবলেন। তারপর বললেন – Yes, if he is willing.

লেফটেন্যান্ট হোসেন না করলেন না। ২ ইস্ট বেঙ্গলের সাথে ক্যাপ্টেন মুক্তার কামাল ছাড়াও আরো দু'জন সিভিল ডাক্তার ছিলেন। ব্যাটালিয়নের সাথে তাদের ময়মনসিংহ থেকে আনা হয়েছে, ডা. আহমেদ আলী এবং ডা. আবেদুর রহমান। সামরিক বাহিনীর ডাক্তারদের সাথে তারা তেমন একটা মেলামেশা করেননি এ



ক'দিন। লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন অতো কিছু না ভেবেই মেজর মঈনের সাথে জিপে উঠে বসলেন। গড়িয়ে চললো গাড়ির চাকা। চারদিকে শুধুই চা বাগান, রাত দু'ভাগ করা হেডলাইটের আলোয় খুব বেশিদূর যে দেখা গেলো তা নয় । তবু যতদূর দেখা গেলো তাতে চোখ ফিরানো যায় না। একই উচ্চতায় উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি চা গাছ, সবুজের সম্মোহনী দৃষ্টি নিয়ে। এদের শৃঙ্খলায় যেন সৈনিক জীবনের ছোঁয়া মিশে আছে।

চা বাগানের অপরিসর আর উঁচু নিচু ট্রাক ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চললো কনভয়। সময় পার হতে হতে ধীর লয়ে গাড়ির সংখ্যা কমতে শুরু করলো। কারা যে কোনো দিকে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছিলো না। তবে এটা ঠিক যে পুরো ব্যাটালিয়ন এক জায়গায় যাচ্ছে না, কোম্পানি হিসেবে ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। মেজর মঈন আর লেফটেন্যান্ট হোসেন যখন গন্তব্যে পৌঁছলেন তখন শুধু ২ ইস্ট বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি অবশিষ্ট রইলো মেজর মঈনের নেতৃত্বে।

এদের রাতের যাত্রা বিরতি হলো একটা টি গার্ডেনে, অবশ্য ভারতের মধ্যে। ব্যাটালিয়ন মুভের মধ্যে কখন যে সবাই এপার হতে ওপারে চলে গেছে রাতের আঁধারে বোঝা যায়নি। অন্যান্য কোম্পানি কমান্ডার যেমন ক্যাপ্টেন আজিজ, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এবং ক্যাপ্টেন নাসিম মনে হলো যেন রূপকথার চরিত্রের মতো হারিয়ে গেলেন। তবে এটা নিশ্চিত তারাও সবাই আছেন ডেলটা কোম্পানির কাছাকাছি, নিশ্চয় ওয়্যারলেস কমুনিকেশনের মধ্যেই।

'ডি' কোম্পানির জোয়ানরা রাতের বেলা যেখানে অবস্থান নিল তার নাম কলকলিয়া টি গার্ডেন। রাতের আঁধারে টি গার্ডেনের কলেবর বোঝা গেলো না। ভাল করে দেখার জন্য পরের দিনের সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হলো সবার। টি গার্ডেনের মালিক এক হিন্দু ভদ্রলোক। তিনি বের হয়ে এলেন হ্যারিকেন হাতে। বললেন – আজকে রাত এখানে থাকেন, দেখা যাক কাল কী করা যায়।

এখানে কোনো আলো নেই। হ্যাঁ, তবে গাড়ির হেডলাইটগুলো এখনও জ্বলছে। আলোকিত হয়ে আছে জঙ্গল। রাতের মতো সৈনিকদের ব্যবস্থা করা হলো বড় একটা গোডাউনে আর বাকিরা বাইরে টেন্টে। মেজর মঈন আর লেফটেন্যান্ট হোসেন পেলেন মাঝারি আকারের একটা ঘর। একটা চৌকিও ছিল সেখানে। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে হয়ত এক ধরনের বেদনাও কাজ করছিল যোদ্ধাদের মনে। তবে যুদ্ধের মানসিক চাপের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি ফিরে এলো সবার মাঝে। আপাতত শত্রুর তাড়া নেই। আর বেদনা! হয়ত কেউ মুখ ফুটে বলবে না। নিজের একান্ত আশ্রয়, ভালোবাসার নিবাস ছেড়ে পরদেশে আশ্রয় কোনো সুখের অভিজ্ঞতা নয়। এরা সবাই খুব ক্লান্ত তখন। তাই আবেগের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো বেশিক্ষণ তাড়া করতে পারলো না এদের। বিছানায় গা এলিয়ে

দিতেই নিঃশব্দে ঘুমের কোলে হারিয়ে গেলেন ওরা। এক ধরনের গভীর নিঃশব্দ আর শূন্যতা সারারাত ওদের সঙ্গী হয়ে রইলো ।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা উঠেছে বেশ। আসলে ২০ শে এপ্রিলে শুরু হয়েছে সেই বহুক্ষণ। উঠে ফ্রেশ হয়ে মেজর মঈন এবং লেফটেন্যান্ট হোসেন নাস্তা করলেন, পুরি আর চা দিয়ে। সৈনিকদের নাস্তা থেকেই অফিসার দু'জনকে দেয়া হয়েছে। একজন সৈনিক জানতে চাইলো ডিম ভাজি করে আনবে কিনা। সৈনিকদের নেতৃত্বের প্রতি একাত্মতা যুদ্ধ জয়ের প্রাণ সঞ্জীবনী। উর্ধতনদের সম্মান করার সাথে সাথে তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা সৈনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। লেফটেন্যান্ট হোসেন ডিম খাবেন না জানিয়েছেন। তারপর বের হলেন মেজর মঈনের সাথে ক্যাম্প দেখতে। ওরা দু'জন ঘুরে ঘুরে দেখলেন আশপাশ। কোম্পানির অবস্থান বর্ডারের মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনে দেখলেন সীমানা পিলার। কিছু কিছু লোকজনের চলাচল। বাংলাদেশের মাটির সোঁদা গন্ধ যেন এই দূর থেকেও অনুভব করলো ওরা বুক ভরে। এখনতো সবে এপ্রিল, বাংলার গাঁয়ে কদম ফুলেরা কবে নাগাদ অপরূপ সৌন্দর্য বিলাতে শুরু করবে!

এটাই কি দেশপ্রেম! মাটির গভীর থেকে ভেসে আসা ডাক কী ওরাই শুনতে পায় যারা দেশকে ভালবাসে! দেশের এক মুঠো মাটির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে! আসলে নিজের দেশ, সে যে কতো আপনার, বিদেশে বিভুঁইয়ে না গেলে কখনোই তা অনুভব করা যায় না।

কোম্পানির জোয়ানদের তৎপরতার শুরু হয়ে গেলো। মেজর মঈন সিনিয়র কয়েকজন এনসিওকে ডেকে এলাকাটা ভাল করে রেকি (Reccee) করতে বললেন। এখান থেকে হরষপুর রেল স্টেশন মাত্র ৩ মাইল দূর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বলে সেখানে পাকিস্তানিদের আনাগোনা খুব স্বাভাবিক। শেষতক ওখানটায় এ কোম্পানির জোয়ানদের প্রাধান্য বিস্তার করতে হবে যাতে হানাদার বাহিনী সেটা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে।

ডেলটা কোম্পানির এলাকা অর্থাৎ কলকলিয়া টি গার্ডেনটা ততো বেশি বড় নয়। তবে ওদের জন্য যথেষ্ট।

কেউ উপকার করলে বিশেষত বিপদের সময়তো কোনোভাবেই তো ভোলা যায় না। ভোলা উচিৎও নয়। অকৃতজ্ঞ হওয়া বাঙালির স্বভাবে নেই। মালিক ভদ্রলোক ভোরে এসে আবার দেখা করলেন ওদের সাথে। সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিলেন। এ বাগানেই তিনি নিজে থাকেন সপরিবারে। বললেন – এর চেয়ে থাকার জন্য ভালো জায়গা তাঁর দেয়ার মতো নেই। বড় গোডাউনটা তৈরি হয়েছিল চা পাতা প্রসেসিং করার জন্য। কিন্তু আপাতত সে



প্রক্রিয়া বন্ধ। পাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করছেন ভদ্রলোক। ঐ গোডাউনেই বেশ কিছু সৈনিক ঠাঁই নিয়েছে স্বচ্ছন্দে।

পাশেই একশ' থেকে দেড়শ' গজের মধ্যে পুকুর রয়েছে দু'টো। কিন্তু তার ফ্যামিলি বেড়া দেয়া বাথরুমে গোসল করেন। যোদ্ধারা তাদের প্রায় দেখেননি বললেই চলে। দেখেছেন যদিও তা পরের দিকে কখনো কখনো। যখন এ পরিবারটি মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিকে আপনজনের উপস্থিতি হিসেবে মেনে নিতে পেরেছেন। মেজর মঈন আর লেফটেন্যান্ট হোসেনের ঘরের চারদিকে মুলিবাঁশের বেড়া। খারাপ নয়। যুদ্ধাবস্থায় আশ্রয়ের জন্য কোনো ঘর পাওয়া অনেক বড়ো ব্যাপার বৈকি! আরো ছড়ানো ছিটানো কিছু ঘর আছে। সেগুলোয় টি গার্ডেনের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্মতো তাদেরও চালিয়ে যেতে হবে।

মেজর মঈনের নেতৃত্বে ডেলটা কোম্পানির কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে। ক্যাম্প সেট আপ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, রেকি ইত্যাদি। লেফটেন্যান্ট হোসেন যখন মেজর মঈনের সাথে চলে এলেন তখনও তিনি বুঝতে পারেন নি আসলে তিনি কি হতে যাচ্ছেন। কিন্তু অবশেষে দেখলেন আসলে তিনি শুধু ডেলটা কোম্পানির মেডিক্যাল অফিসার, তাও কিনা ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। নিয়মানুযায়ী মেডিক্যাল অফিসার থাকে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু এবার সেটা হয়নি। নবীন অফিসার লেফটেন্যান্ট হোসেনও এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলেন নি। না কোনো আপত্তি। কারণ তখন মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরু এবং তার গর্বিত অংশীদার হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিলো প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হৃদয়ে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। দল বেঁধে মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে। রাতের আঁধারে আশ্রয় ও বিশ্রামের জন্য যে কোনো বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে মুক্তি পাগল যোদ্ধারা। সবাই তাঁদের আপ্যায়ন করছেন এমনভাবে যেন কোনো পরম আত্মীয় এসেছেন অনেক দিনের পরে। এদের দেখেই সাহসে বুক বাঁধছে সাধারণ মানুষ, মাথা উঁচিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে চলায় সাহস পাচ্ছে দেখছে সত্যিকার স্বাধীনতার স্বপ্ন। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায়ও মনে বিরাজ করছে এক ধরনের প্রশান্তি। ওরা ঐ যে বুকের ধন, মুক্তি পাগল যোদ্ধারা, আছে জনগণের আশপাশেই, কাজেই ভয়ের কিছু নেই।

লেফটেন্যান্ট হোসেন জানালেন যে একজন সুবেদারের কথা তার খুব মনে পড়ে। একদম অনুগত, আন্তরিক এবং সৎ। শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল টিপসই, বেতন তুলতেন ওভাবেই। দু'চারটে ইংরেজি শব্দ জানতেন। বলতেন নিজের মতো করে। কিন্তু যোগ্যতার কারণে গ্রেট ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেক অনুষ্ঠানে তৎকালীন ভারতীয় আর্মির তরফ হতে তাঁকে পাঠানো

হয়েছিল। তিনি ছিলেন সব ব্যাপারে অসাধারণ। থাকতেন যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী অফিসারদের কাছাকাছি। লক্ষ্য রাখতেন কখন কি প্রয়োজন হয়।

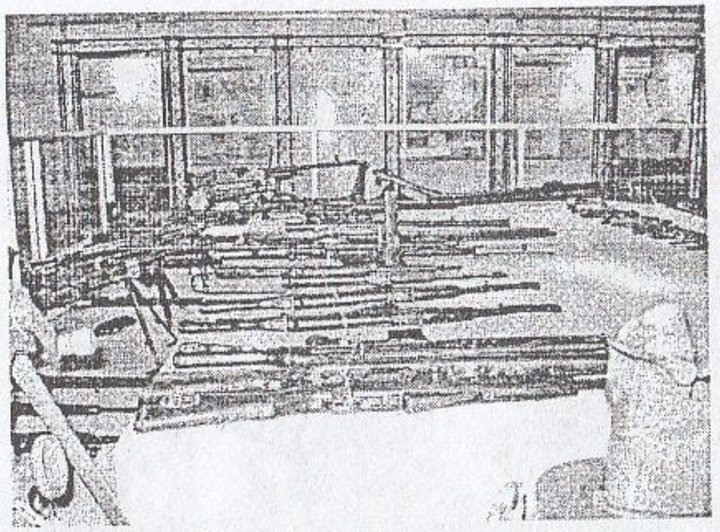
আসলে প্রত্যেক ভালো লোক বা ব্যক্তিত্বকে মানুষ মনে রাখে। বাঙালির জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় একের জন্য অন্যের সহমর্মিতা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কোনো গোত্র, বর্ণ বা ধর্ম নয়। অসহায় আশ্রয়হীন মানুষের পাশে সেদিন পুরো জাতির হাত ছিল প্রসারিত। কি রাত, কি দিন। যখনই কোনো পথশ্রান্তমানুষের দেখা পাওয়া যেত সাথে সাথে তার থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসতো সবাই। সাহায্য করতো খুশি মনে। পরের বেলা নিজের ঘরে চুলো জ্বলবে কি জ্বলবেনা গৃহকর্তা সে ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতেন না।

ডেলটা কোম্পানির কমান্ডার মেজর মঈন তাঁর কোম্পানিকে ডেপ্লয় করে ফেললেন। একটা প্লাটুন থাকলো হরষপুর রেল স্টেশনে। এর ডানে এবং বামে আরো দু'টো প্লাটুন অবস্থান নিল। তবে এদের কোম্পানি হেডকোয়ার্টার থাকলো কলকলিয়া টি গার্ডেনেই। লে. আবুল হোসেন একদিন গেলেন মেজর মঈনের সাথে, ডেপ্লয়মেন্ট এরিয়ায়, জোয়ানরা কেমন আছে দেখতে। স্টেশনের কাছে যারা অবস্থান নিয়েছে তারা ওখানকার বিভিন্ন স্ট্রাকচারে গুছিয়ে নিয়েছে বেশ। যারা স্টেশনের ডানে কিংবা বামে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান নিয়েছে সেগুলো গ্রাম। ওখানকার খালি বাড়িগুলোয় উঠেছে তারা। রান্নাবান্না করছে নিজেরাই। গ্রামবাসীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করছে তাদের।

এ কোম্পানির জোয়ানরা এদিকটায় পাকিস্তানিদের চলাচল দুর্বিষহ করে তুললো। সময় ও সুবিধা দেখে রেইড এবং অ্যামবুশ করে পাকিস্তানিদের বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছে ওরা। পেট্রোলিং করে ঐ এলাকায় ডেলটা কোম্পানি অবস্থান বেশ সুদৃঢ় করেছে। কোনো কোনো অ্যাকশনে কিছু পাকিস্তানি মারাও গেলো। শেষে সীমান্তের এই রেল স্টেশনের মায়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো পাকিস্তানিরা। ওদের এখানে আসা-যাওয়া একদম বন্ধ। কীভাবে আসবে? দুঃসাহসী জোয়ানদের আকস্মিক হামলায় তখন হানাদারদের দারুণ দুরাবস্থা। A good success of delta company.

কিছু কিছু অ্যাকশনে লেফটেন্যান্ট হোসেনও অংশ নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেজর মঈন সীমান্তের কাছের নাল্লা তাকে অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকতে দিলেন না। তাঁর ধারণা স্পষ্ট। একমাত্র ডাক্তার আহত হলে অন্যদের চিকিৎসা করবে কে। Assurance of good treatment in the war field generates high moral for the fighting force. ভাল চিকিৎসার নিশ্চয়তা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সবসময়ই মনোবল চাঙা করে রাখে। যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ডারের আদেশ শিরোধার্য করে হোসেনকে সীমান্তের ওপারেই থাকতে হলো।





মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত কিছু হালকা ও ভারি অস্ত্র

একাত্তরের ঐ সময়টায় পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের নারকীয় গণহত্যাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা ঢাকায় এবং সারা দেশজুড়ে শান্তি কমিটি গঠন করেছে। সেনাবাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় সর্বত্র, আনাচে কানাচে। কাজেই শান্তি কমিটিও গজিয়ে উঠলো ব্যাঙের ছাতার মতো। এরা নির্বিচারে বাঙালি নিধনকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করে চলেছে। যারা পাকিস্তানিদের অখণ্ডতার ধারনা নিয়ে পুরো ভাগে এলেন তাদের মধ্যে খান এ সবুর,



ঘাতকের নিষ্ঠুরতা সীমাহীন - ওরা যত্রতত্র প্রমাণ রেখেছে তার

খাজা খায়েরউদ্দিন, মাহমুদ আলী, গোলাম আযম, শফিকুল ইসলাম, আবুল কাশেম, পীর মোহসীনউদ্দিন, এদের নাম শোনা যেতে লাগলো। এরা পাকিস্তানের সামরিক শাসন এবং ওদের ঘৃণ্য কাজকে বৈধতা দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। সামরিক জান্তাকে সাহায্য করতে যেয়ে গড়ে তুলতে থাকলো রাজাকার আলবদর, আলশামস ইত্যাদি বিভিন্ন বাহিনী। পাকিস্তানিদের সুবিধে হলো এ বাঙালিদের দিয়ে অচেনা জায়গায় সহজেই পৌঁছে যেতে পারছে তারা।



শাসকের বর্বরতায় শহীদের কাতারে ওরাও শামিল

কারা মুক্তিযোদ্ধা কিংবা কারা তাদের পরিবার, সহজেই চিহ্নিত হতে থাকলো দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায়। ফলে নির্বিচার খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ বেড়ে গেলো। মুক্তিবাহিনীর সাথে লড়াইয়ে মারা যেতে থাকলো নাদান বাঙালিরাই। পাকিস্তানিরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে শুরু করেছে তখন। গণহত্যাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টায় ঘাতকরা যুদ্ধের প্রথমদিকে কিছুটা সফলতাও লাভ করলো বটে। তারা মিডিয়াকে ব্যবহার করলো তাদের ইশারায়, ইচ্ছামতো। ১৮ এপ্রিলের এক বেতার ভাষণে জেনারেল টিক্কা খান যা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায় যে ১লা মার্চ হতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীগণ অফিসে যেতে পারেন নি। কারণ তাদের ও তাদের পরিবার পরিজনের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। এখন যেহেতু দুস্কৃতকারী ও ফ্যাসিস্টদের দমন করা হয়েছে এবং শান্তি বিরাজ করছে। তাদের সর্বান্তকরণে, অকুণ্ঠ চিত্তে, অকুতোভয়ে জাতি ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিৎ। কিন্তু সামরিক জান্তার অশুভ তৎপরতা শেষ পর্যন্ত টিকল না। একবার টিক্কা খান বললেন - The muslims of East Pakistan, who had played a leading part in the creation of Pakistan, are determined to keep it alive. However, the voice of the vast majority had been suppressed through coersion, threat to life and property by a vocal, violent and aggressive minority, which forced the Awami League to adopt the destrutive course. (সূত্র : ৭১ এর দশমাস, পৃ. ১৫১)





ওরা নিষ্ঠুর ঘাতক - তাই তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে দেশ জুড়ে

মিথ্যার একটা মাত্রা থাকে। জান্তার মিথ্যা হলো মাত্রাহীন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোয়েবলস-এর পরমাত্মীয়। জেনারেল টিক্কা খানের বক্তব্য যে একদম বাস্তবতা বিবর্জিত সেদিনের এক বাচ্চাও তা জানে। কিন্তু মানে না নির্দয় ঘাতক আর তাদের নির্বোধ দোসরেরা। পাকিস্তান উঠে পড়ে লাগলো বিশ্বকে বোঝাবার জন্য যে বিষয়টি নিতান্ত সাময়িক এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপার যা ইতোমধ্যেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

কিন্তু ওদের হাত রাঙা হতে থাকলো সাধারণ মানুষের অসাধারণ রক্তে। চললো রক্তপাত বাংলাদেশের আনাচে কানাচে। ওরা জামালপুরে ঢুকে পলায়নপর লোকের উপর গুলি ছোড়ে। অগ্নি সংযোগ করে পতিতালয়ে। ভীত সন্ত্রস্ত লোকের মাথায় লুটের মালামাল তুলে দিয়ে তুললো ফটো। এরপর চালালো নির্বিচারে গুলি। যশোরের ওরা হালাকু খানকেও হার মানিয়েছে। এভাবে ওরা এপ্রিলে সকল জনপদেই লাগামহীন হত্যা আর ধর্ষণের খেলায় মেতে উঠে।

বাংলাদেশের নবগঠিত বিপ্লবী সরকার জনগণের কিছু নির্দেশ জারি করেছেন যেমন :

১। আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার সুযোগ নিন।
২। মুক্তিসংগ্রামের বিশ্বাস ঘাতকদের খতম করুন ও শাস্তি দিন।
৩। আওয়ামী লীগ স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ খবরাখবর সকলকে জানিয়ে রাখুন।
৪। মুক্তাঞ্চলে সরকারি কর্মচারীর আওয়ামী লীগের স্থানীয় দপ্তর থেকে নির্দেশ নিন।

৫। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নির্দেশ উপেক্ষা করুন।

৬। মুক্তিফৌজ কমান্ডারের নির্দেশে অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত নিয়ম মেনে চলুন।

৭। সন্দেহভাজন লোক সম্বন্ধে নিকটতম মুক্তিফৌজ কেন্দ্রে খবর দিন।

আশা করা যায় এসব নির্দেশের পর হয়ত হানাদারদের স্থানীয় দোসরদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। নচেৎ অকালে প্রাণ হারাবে তারা। আর অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় এ নির্দেশগুলো মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে।

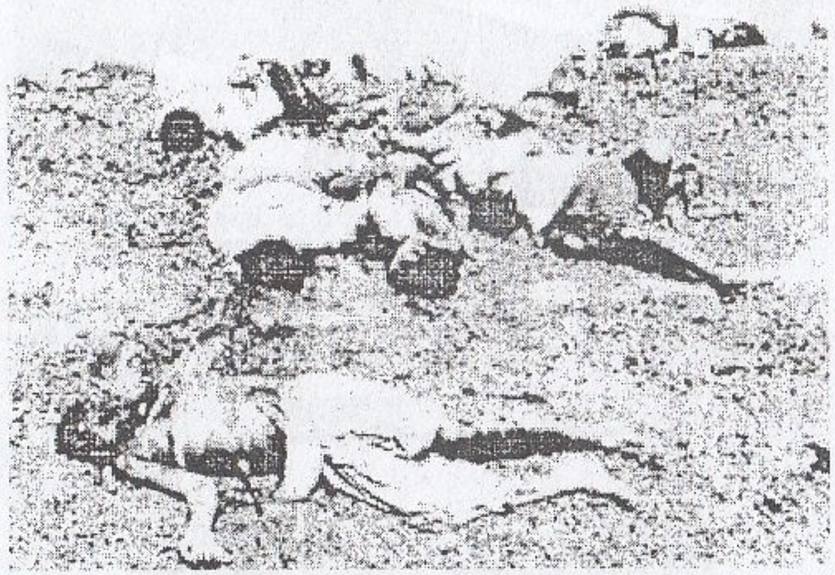


নির্দয় শাসকের পতন অনিবার্য - এপ্রিলে কুষ্টিয়ায় গ্রেপ্তারকৃত ক'জন হানাদার

সত্যকে মিথ্যা দিয়ে বেশি দিন আড়াল করা যে যায় না তার প্রমাণ মিলছে। কিছু কিছু বিদেশি সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গণহত্যার প্রমাণ সাথে করে বিদেশে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তারা নির্বিচার গণহত্যার সচিত্র প্রমাণ তুলে ধরেছেন মুক্ত বিশ্বের সামনে। এ প্রসঙ্গে কিসিংস কনটেম্পরারি আরকাইভস বলছে - Evacuation of British and American nationals from East Pakistan as well as of those of many other nationalities was carried out by air and sea during the first weak of April. The evacuation of all UN personnel and their dependents from East Pakistan was also ordered by the United Nations Secretary General, U Thant. British refugees from East Pakistan arriving at Calcultta spoke on April 6 of "bloody massacres" and mass 'murder' in and around Chittagong. A British engineer saying that he had seen " bodies pilled high in the gutters" and "dogs and crows eating corpses in the streets nine days after they had fallen there". Refugees spoke about mass killing and shootings by both sides, the Army and Awami League supporters, and estimated the dead as running into many thousands" (KCA, pp-24569) অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্রিটিশ ও মার্কিনী লোকজনসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর

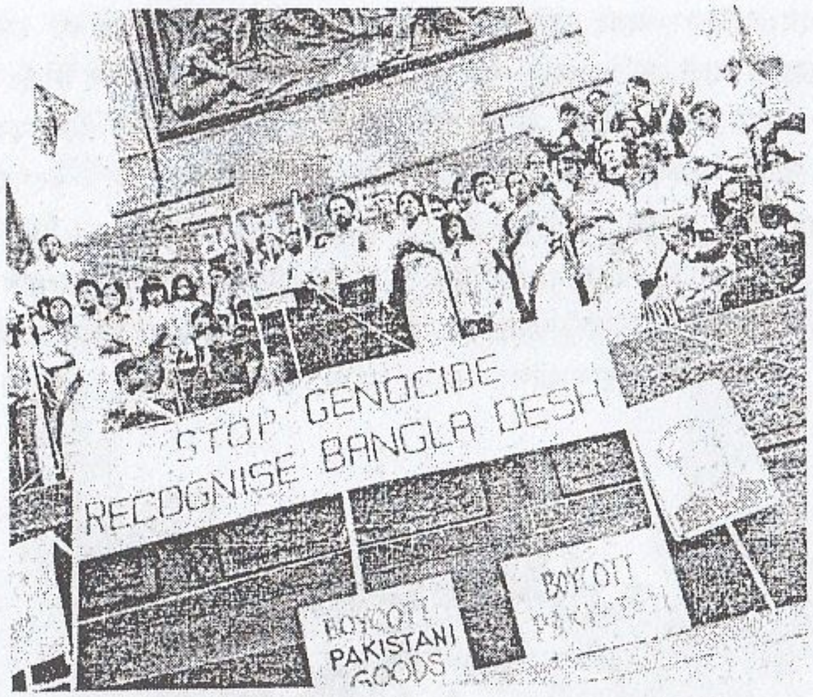


লোকদের আকাশ এবং জলপথে সরিয়ে নেয়া হয়। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট জাতিসংঘের কর্মরত সকল লোকজন ও তাদের নির্ভরশীলদের সরিয়ে নেয়ার আদেশ জারি করেন পূর্ব পাকিস্তান হতে। ০৬ এপ্রিলে কলকাতায় আগত ব্রিটিশ রিফিউজিরা চট্টগ্রাম শহরে এবং এর চারদিকে রক্তাক্ত ধংসযজ্ঞ আর গণহত্যার কথা জানান। একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার জানালেন যে তিনি হত্যার ন'দিন পরেও গাটারের মধ্যে স্তূপীকৃত মৃতদেহ দেখেছেন যা কুকুর এবং কাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছিল। রিফিউজিরা বললেন গণহত্যার কথা এবং আর্মি ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের গোলাগুলির কথা যাতে হাজারে হাজারে লোক নিহত হয়েছে।



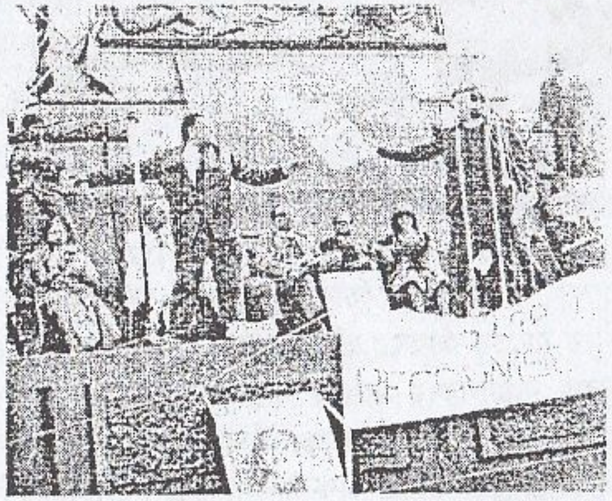
হতবাক বিশ্ব বিবেক - ওরা হত্যা করেছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে

প্রকাশ পেলো নারকীয় নির্বিচার গণহত্যার দলিল। অনেক সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাতের আঁধারে ছবি তুললেন। আঁতকে উঠলো সচেতন বিশ্ব। বিদেশে অবস্থানরত বাঙালিদের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেলো। জনমত গঠন এবং যুদ্ধের জন্য তহবিল তোলা শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ব্রিটেনের হাউস অফ লর্ডসের সদস্য ফেনার ব্রক ওয়াজ এক জনসমাবেশে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের হত্যাকাণ্ড বন্ধের দাবি জানালেন। সাথে সাথে তিনি সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তি, পূর্বাঞ্চল হতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকার আহবান জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বললেন – ভারত পূর্ব বাংলার ঘটনায় নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না। ব্রিটেনের লর্ড ব্রকওয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সামরিক বাহিনীকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করার জন্য শ্রীলঙ্কার প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার কথা আসার কারণ হলো ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না পারায় পাকিস্তান তখন শ্রীলঙ্কাকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করেছে।




ঘাতকের মুখোস উন্মোচিত নিপীড়ত মানুষের জন্য সোচ্চার বিশ্ব বিবেক

মার্কিন জনগণও পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠলো। যদিও মার্কিন প্রশাসনের ঘুম সহজে ভাঙবে বলে মনে হচ্ছে না।



ঘাতকেরা নির্দয়– বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালো মুক্ত বিশ্ব

কেনেডি বললেন – সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে নির্বিচার গণহত্যা চলছে। শস্যের গোলা পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সেখানে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। আর সেই সময় নিক্সন প্রশাসন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যাচ্ছেন। কেনেডি সে সময় মার্কিন জনগণকে আহবান জানালেন পূর্ব বাংলার দুর্গত মানবতাকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে। মার্কিন পত্রিকা সাপ্তাহিক নিউজউইক এবং টাইমস বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিক তথা তুলে ধরতে শুরু করলো ।

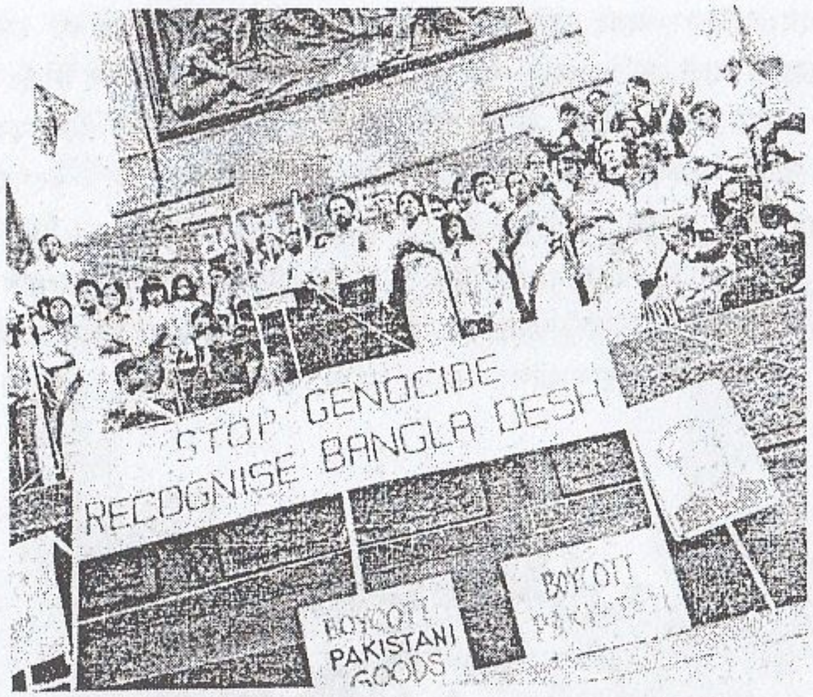


সে সময় ঢাকায় অবস্থিত জাতিসংঘ এবং অন্যান্য দেশের কূটনীতিবিদরা বিমানে করে কলকাতায় পৌছালে তারা পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যাযজ্ঞের বীভৎস চিত্র সবার কাছে তুলে ধরেন। আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব পাকিস্তান নামক সংগঠনের ২৯ জন বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিক ইয়াহিয়ার কাছে এক আবেদনে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের জন্য আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। তারা বলেন – কোনো সরকারেরই অস্ত্র ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার অধিকার নেই।

কতো দ্রুত বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে তা ক'দিন পরে মার্কিনী চেষ্টার বার্ডলস-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি নিউইর্য়ক টাইমসকে বললেন – সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের লোকজনকেও পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের কথা স্বীকার করেছেন। ইতোমধ্যেই লন্ডনে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি। তারা দ্রুত জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে।

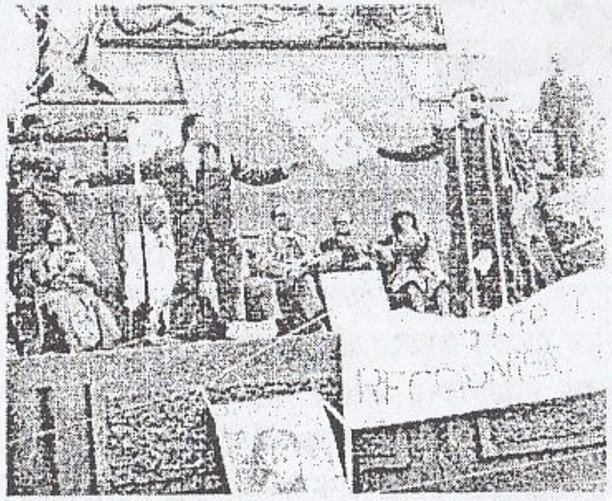


বর্ষীয়ান জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বিশ্ব জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ইতোমধ্যে তিনি পত্রযোগাযোগ শুরু করেছেন। মুজিবনগর থেকে তিনি যাদের কাছে বাংলাদেশের নির্বিচার গণহত্যার বর্ণনা দিয়ে চিঠি পাঠান তারা হলেন জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট, চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ ও প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই, সেভিয়েত নেতৃবৃন্দের মধ্যে লিওনিদ ব্রেজনেভ, আলেক্সেই কোসিগিন ও প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট পম্পিডু, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশেফ ব্রোজ টিটো ও মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। তিনি প্রত্যেকের কাছে পৃথক পৃথক বার্তায় পাকিস্তানিদের গণহত্যা এবং সাহায্য বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টির আবেদন জানান। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ইউএসএআইডি (USAID) এর জন উ রোড ঢাকায় পাকিস্তানি নির্মমতা ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের বর্ননা দিয়ে মার্কিন সিনেটর স্যাক্সবিকে এক পত্র লেখেন।




ঘাতকের মুখোস উন্মোচিত নিপীড়ত মানুষের জন্য সোচ্চার বিশ্ব বিবেক

মার্কিন জনগণও পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠলো। যদিও মার্কিন প্রশাসনের ঘুম সহজে ভাঙবে বলে মনে হচ্ছে না।



ঘাতকেরা নির্দয়– বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালো মুক্ত বিশ্ব

কেনেডি বললেন – সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে নির্বিচার গণহত্যা চলছে। শস্যের গোলা পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সেখানে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। আর সেই সময় নিক্সন প্রশাসন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যাচ্ছেন। কেনেডি সে সময় মার্কিন জনগণকে আহবান জানালেন পূর্ব বাংলার দুর্গত মানবতাকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে। মার্কিন পত্রিকা সাপ্তাহিক নিউজউইক এবং টাইমস বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিক তথা তুলে ধরতে শুরু করলো ।



সে সময় ঢাকায় অবস্থিত জাতিসংঘ এবং অন্যান্য দেশের কূটনীতিবিদরা বিমানে করে কলকাতায় পৌছালে তারা পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যাযজ্ঞের বীভৎস চিত্র সবার কাছে তুলে ধরেন। আমেরিকান ফ্রেন্ডস অব পাকিস্তান নামক সংগঠনের ২৯ জন বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিক ইয়াহিয়ার কাছে এক আবেদনে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের জন্য আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। তারা বলেন – কোনো সরকারেরই অস্ত্র ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার অধিকার নেই।

কতো দ্রুত বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে তা ক'দিন পরে মার্কিনী চেষ্টার বার্ডলস-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি নিউইর্য়ক টাইমসকে বললেন – সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের লোকজনকেও পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের কথা স্বীকার করেছেন। ইতোমধ্যেই লন্ডনে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি। তারা দ্রুত জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে।



বর্ষীয়ান জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বিশ্ব জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ইতোমধ্যে তিনি পত্রযোগাযোগ শুরু করেছেন। মুজিবনগর থেকে তিনি যাদের কাছে বাংলাদেশের নির্বিচার গণহত্যার বর্ণনা দিয়ে চিঠি পাঠান তারা হলেন জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট, চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ ও প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই, সেভিয়েত নেতৃবৃন্দের মধ্যে লিওনিদ ব্রেজনেভ, আলেক্সেই কোসিগিন ও প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট পম্পিডু, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশেফ ব্রোজ টিটো ও মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। তিনি প্রত্যেকের কাছে পৃথক পৃথক বার্তায় পাকিস্তানিদের গণহত্যা এবং সাহায্য বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টির আবেদন জানান। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ইউএসএআইডি (USAID) এর জন উ রোড ঢাকায় পাকিস্তানি নির্মমতা ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের বর্ননা দিয়ে মার্কিন সিনেটর স্যাক্সবিকে এক পত্র লেখেন।

যদিও সামরিক জান্তা দাবি করছিল যে ঢাকা শহর শান্ত হয়ে আসছে কিন্তু আসলে সেটা তখন এক ভুতুড়ে শহর। রোডের চিঠির খানিকটা পড়লেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির একটা সাধারণ চিত্র ফুটে উঠে। যেমন তিনি লিখেছেন - One of the results of East Pakistan civil war was exoelus of more than a quarter of a million refugees both Hindus and Muslims across the Indian border in West Bengal and Asam, posing health and food problems for the Indian authorities.

ঐ সময় খান এ সবুর পাকিস্তানিদের পক্ষ হয়ে বললেন-শত্রুর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীকে সব ধরনের সাহায্য প্রদান বর্তমান প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু মি. খান কিংবা তার দোসরেরা যতই হুঙ্কার ছাড়ুন না কেন গণহত্যাকারী পাকিস্তানি শাসকদের পাপ ঢাকা থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধের জয়যাত্রার সাথে সাথে বিশ্ববাসীর কাছে তাদের অন্যায় উন্মোচিত হতে থাকে। আর্তমানবতার কাছে এসে দাঁড়ায় চিন্তাশীল মুক্ত বিশ্ব। গড়ে উঠে জনমত যা বাংলাদেশের বিজয় পথের অগ্রযাত্রাকে সহজ করে দেয়।



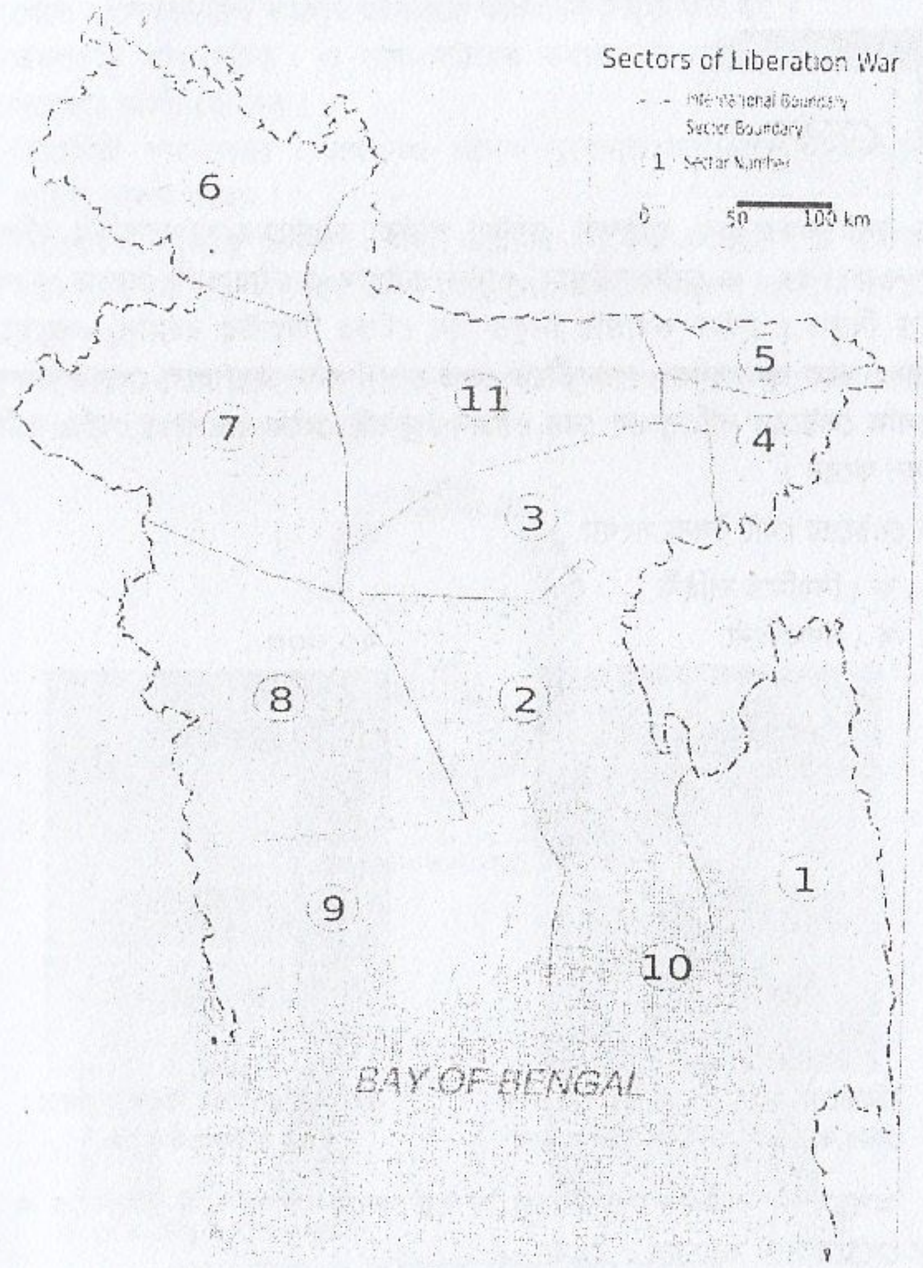
শ্রদ্ধেয় জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

ঐ সময়টাতে ২ ইস্ট বেঙ্গলের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার ছিল কলকলিয়া টি গার্ডেন থেকে কয়েক মাইল ভিতরে। মে বা জুন ১৯৭১, ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার আরো ভিতরে চলে গেলো, চার কি সাড়ে চার মাইল। কৌশলগত কারণেই অবস্থানের এ পরিবর্তনের দরকার ছিল। ততোদিনে সেদিনের ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর শফিউলাহ সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তার নামে গঠিত হয়েছে S-Force. যেমন জিয়াউর রহমানের নামে Z-Force, খালেদ মোশাররফের নাম K-Force. মেজর শফিউল্লাহকে পদোন্নতি দিয়ে. লেফটেন্যান্ট কর্নেল করা হয়েছে। শুধু তাঁকে নয়, অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদেরও পদোন্নতি দিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদায়



উন্নীত করা হয়েছে। সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব হলো সেক্টরের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড, গঠন এবং পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণ। ২ ইস্ট বেঙ্গলকে ভেঙে ২ নং ১১ ইস্ট বেঙ্গল খাড়া করা হলো। তখন নিয়মিত সেনাবাহিনী বাড়ানো অনিবার্য হয়ে পড়েছে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য চাই শক্তিশালী সাহসী হাত, চাই প্রশিক্ষিত লোকবল।

এরই মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধা, যুদ্ধকে গতিশীল ও শত্রুকে সহজে পরাস্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে মোট এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। নিযুক্ত হয়েছেন এগারোজন সেক্টর কমান্ডার। এ ব্যাপারে কিছুটা বিশদ তথ্য দেয়া দরকার ।




এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ

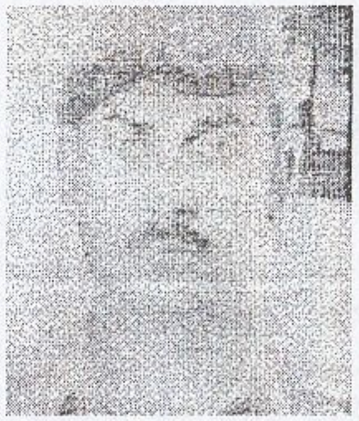


## সেক্টর-১

এর সদর দপ্তর এবং প্রশিক্ষণ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ির হরিণায় স্থাপন করা হয়। এ সেক্টর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার পূর্বপাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর জিয়াউর রহমান, একাত্তরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত। পরবর্তীতে জেড-ফোর্স গঠন করা হলে মেজর রফিকুল ইসলাম সেক্টরের দায়িত্বভার নেন। তিনি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

এই সেক্টরের মোট সৈন্য সংখ্যা

ক। নিয়মিত বাহিনী - ২,১০০
খ। গণবাহিনী - ২০,০০০



ইতিহাসের মাইল ফলকে যার নাম লেখা - সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান



এক নম্বর সেক্টরের গর্বিত কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম

অপারেশন কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই সেক্টরকে ৭ টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। যেমন :-



১। ঋষিমুখ সাব-সেক্টর: অধিনায়ক ক্যাপ্টেন সামসুল হুদা। ৪ নভেম্বরে তিনি শহীদ হলে ক্যাপ্টেন এওয়াইএম মাহফুজুর রহমান সে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

২। শ্রীনগর সাব-সেক্টর : প্রথমে ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ সাব - সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। জুলাইতে জেড ফোর্স গঠিত হলে তিনি হেডকোয়ার্টারের ফোর্সের বিএম নিযুক্ত হন। লেফটেন্যান্ট মনসুরুল আমিন ক্যাপ্টেন অলি আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হন।

৩। মনুঘাট সাব-সেক্টর : প্রথমে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন এওয়াইএম মাহফুজুর রহমান। তিনি নভেম্বর পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি হেড কোয়ার্টারে চলে গেলে ২/লেফটেন্যান্ট ফজলুর রহমানকে অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়।

৪। তবলছড়ি সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন সুবেদার আলী হোসেন।

৫। ডিমাগিরী সাব-সেক্টর : এখানেও জনৈক সুবেদার সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

৬। মিরেশ্বরাই পাহাড়ি এলাকা : মধ্য অক্টোবর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ইপিআর ও গণযোদ্ধাদের একটি মিশ্রদল এখানে অবস্থান গ্রহণ করে ।

৭। ফটিকছড়ি ও নাজিরহাট এলাকার মধ্যস্থল: ২/লেফটেন্যান্ট শওকত আলীর নেতৃত্বে একটি মিশ্রদল অবস্থান গ্রহণ করে এ এলাকায়।



ক্যাপ্টেন অলি আহম্মেদ



ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান



ক্যাপ্টেন হারুন আহম্মেদ চৌধুরী

ওরা কালজয়ী - ১ নং সেক্টরের ক'জন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা

# সেক্টর-২

এ সেক্টরের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় ভারতের অভ্যন্তরে, ত্রিপুরার মেলাঘরে। মুহুরী নদীর পশ্চিমপাড় থেকে সমগ্র নোয়াখালী জেলা, কুমিলা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ এই সেক্টরের আওতাভুক্ত হয়।

এ সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ করেন মেজর খালেদ মোশাররফ, পিএসসি। তিনি এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু যুদ্ধে আহত হলে মেজর এটিএম হায়দার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীল করার জন্য এই সেক্টরকে ৮ টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। যেমন:-



ভুলিনি ওদের - সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ

১। রাজনগর সাব-সেক্টর: এর কমান্ডার নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম।

২। মনতলি সাব-সেক্টর: এ সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দেয়া হয় ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আইনুদ্দীকে।

৩। রাঙ্গামুরা সাব-সেক্টর: এ সাব-সেক্টরের কমান্ড লাভ করেন লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান।

৪। নির্ভয়পুর সাব-সেক্টর: এখানে লে. মাহবুবুর রহমান কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

৫। কোনাবন সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন আব্দুল গাফফার হাওলাদার এ সাব-সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন।

৬। সালদানদী সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক চৌধুরী এখানে চৌকষ যোদ্ধা হিসেবে নেতৃত্ব দেন।

৭। মতিনগর সাব-সেক্টর: লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলমকে এ সাব - সেক্টরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।



৮। ধনপুর সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন ও লেফটেন্যান্ট আবু কায়সার ফজলুল কবির এখানে কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।



লে. ফজলুল কবির



লে. ইমামুজ্জামান



ক্যাপ্টেন সালেক



ক্যাপ্টেন গাফফার



লে. দিদারুল আলম



লে. মাহবুবুর রহমান



ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার



সুবেদার ওহাব

ওরা চির দুর্জয় - এ সেক্টরের কিছু তরুণ যোদ্ধা

# সেক্টর-৩

এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার প্রথমে ছিল বাংলাদেশের মনতলায়। পরবর্তীতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের হেজামুরায় হেডকোয়ার্টার এবং প্রশিক্ষণ এলাকা স্থানান্তর করা হয়। সীমানা: উত্তরে - সিলেটের চুড়ামনকাঠ, দক্ষিণে- বি.বাড়িয়ার সিঙ্গরাবিল পর্যন্ত। এই সেক্টরে সিলেটের মৌলভীবাজার মহকুমার অংশ বিশেষ, হবিগঞ্জ মহকুমা, বি.বাড়িয়া মহকুমার অংশ বিশেষ, নারায়ণগঞ্জ মহাকুমার কিছু অংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা মহাকুমার অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সেক্টরের প্রথম কমান্ডার মেজর কে এম শফিউলাহ একাত্তরের এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী দিনগুলিতে দায়িত্বপালন করেন মেজর এএনএম নুরুজ্জামান অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে স্বাধীনতা অর্জন হওয়া পর্যন্ত।



ওরা ছিল দুর্বার - সেক্টর কমান্ডার মেজর কে এম শফিউলাহ

পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুবিধার্থে এই সেক্টরকে ১০ টি সাব - সেক্টরে ভাগ করা হয়। এক নজরে দেখা যাক সাব - সেক্টর এবং তার কমান্ডারদের পরিচয়।

১। আশ্রমবাড়ি সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও ক্যাপ্টেন এজাজ আহমেদ চৌধুরী এ সাব-সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন।

২। বাঘাইবাড়ি সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন এজাজ আহমেদ চৌধুরী এ সাব-সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

৩। হাতকাটা সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এ সাব-সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন।

৪। সিমলা সাব-সেক্টর: অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আবদুল মতিন এখানে কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দান করেন।



৫। পঞ্চবটী সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন এএসএম নাসিম এ সাব-সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৬। মনতলা সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভুঁইয়া এখানে কমান্ডার হিসেবে সুযোগ্য নেতৃত্ব দান করেন।

৭। বিজয়নগর সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভুঁইয়া এখানে কমান্ডার হিসেবে সুযোগ্য নেতৃত্ব দান করেন।

৮। কালাছড়া সাব-সেক্টর: ২/লেফটেন্যান্ট মুনসুরুল ইসলাম মজুমদার এখানে কমান্ডার হিসেবে নিযুক্তি পান।

৯। কলকলিয়া সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান ও ২/লেফটেন্যান্ট সায়ীদ আহমেদ এখানে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

১০। বামুটিয়া সাব-সেক্টর : ২/লেফটেন্যান্ট সায়ীদ আহমেদ ও ২/লেফটেন্যান্ট সাদেক হোসেন উভয়েই বিভিন্ন সময় এখানে কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।



ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান



ক্যাপ্টেন এজাজ আহমেদ চৌধুরী



ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান



২/লেফটেন্যান্ট সায়ীদ আহমেদ



ক্যাপ্টেন এ এস এম নাসিম



ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভুঁইয়া



ক্যাপ্টেন আবদুল মতিন



ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোর্শেদ

ওরা দুর্জয় - ৩ নং সেক্টরের ক'জন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা

## সেক্টর-৪

এই সেক্টরের সদর দপ্তর এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় ভারতের আসামের অন্তর্গত মাছিমপুরে। সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল খোয়াইখাট-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তরদিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল সীমান্ত এলাকা। উত্তরে হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত ছিল এই সেক্টরের বিস্তৃতি।

এই সেক্টরে সৈন্য সংখ্যা: নিয়মিত - ১,৫০০

গণবাহিনী - ৯,০০০

এই সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ করেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। যুদ্ধপরবর্তীকালে তিনি সি আর দত্ত নামে সুপরিচিত।



অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সুনিয়ন্ত্রিত ও জোরদার করার লক্ষ্যে এই সেক্টরকে ৫ টি সাব - সেক্টরে ভাগ করা হয়। যেমন:

১। জালালপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান সাদী এখানে কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন।

২। কারপুঞ্জি সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন আবদুর রব।

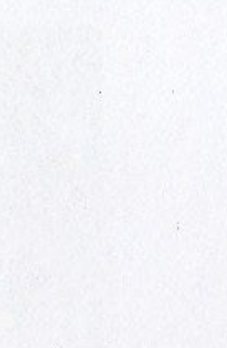
৩। কুকিতল সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টর কমান্ড করেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদের।

৪। কৈলা শহর সাব-সেক্টর : এখানে সাব-সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন ২/লেফটেন্যান্ট আলী ওয়াকিউজ্জামান।

৫। কমলপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম এখানে কমান্ডার হিসেবে নিযুক্তি পান।



গণযোদ্ধা মাহবুবুর রহমান



ক্যাপ্টেন আবদুর রব



ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম



ক্যাপ্টেন শরিফুল হক



২/লেফটেন্যান্ট সাজ্জাদ আলী জহির



২/লেফটেন্যান্ট আবদুল জলিল

ওরা চির নতুন – ৪ নং সেক্টরের অসম সাহসী যোদ্ধাদের কিছু মুখ

## সেক্টর-৫

এই সেক্টরের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় শিলং এ (বিধান চন্দ্র হাউজ)। শিলং ভারতের আসাম রাজ্যের অন্তর্গত। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে খাসিয়া ও জৈন্তা পাহাড়ের সমতল ভূমি নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকের সিলেট তামাবিল সড়ক এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার সীমানা পর্যন্ত এই সেক্টরের আওতাভুক্ত করা হয়।

এই সেক্টর কমান্ডের দায়িত্ব লাভ করেন মেজর মীর শওকত আলী, পিএসসি।



ওরা ছিল আশার অফুরন্ত উৎস - মেজর মীর শওকত আলী

পকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীল রাখার সাথে এ সেক্টরটিকে ৬ টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। যেমন:

১। মুক্তাপুর সাব-সেক্টর: এ সাব-সেক্টরে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন সুবেদার নজির হোসেন।

২। ডাউকি সাব-সেক্টর: সুবেদার মেজর বিআর চৌধুরী এ সাব-সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

৩। মেলা সাব-সেক্টর: এ সাব-সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ক্যাপ্টেন হেলাল এবং তার সহযোগী ছিলেন লেফটেন্যান্ট মাহবুব ও ২/লেফটেন্যান্ট রউফ।

৪। ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর: ২/লেফটেন্যান্ট তাহেরউদ্দিন আখঞ্জি এখানে সাব-সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন।

৫। বালাই সাব-সেক্টর: এখানে কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ করেন ক্যাপ্টেন আবু তাহের সালাহউদ্দিন।

৬। বড়ছড়া সাব-সেক্টর: ক্যাপ্টেন মুসলিমউদ্দিন এখানে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।



## সেক্টর-৬

এই সেক্টরের সদর দপ্তর এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় পাটগ্রামের বুড়িমারীতে। বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলা এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয় (বর্তমানে গাইবান্ধা জেলা ও কুড়িগ্রামের রৌমারী ও রাজিবপুর থানা ব্যতীত)।

উইং কমান্ডার মোহম্মদ খাদেমুল বাশার এই সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন।



একাত্তরের দুরন্ত পথিক - উইং কমান্ডার মোহম্মদ খাদেমুল বাশার

এই সেক্টরকেও ৫ টি সাব-সেক্টরে ভাগ ভাগ করা হয়। যেমন :

১। ভজনপুর সাব-সেক্টর : কমান্ডার নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন নজরুল হক, স্কোয়াড্রন লিডার সফরউদ্দিন এবং সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান।

২। পাটগ্রাম সাব-সেক্টর : প্রথমে ইপিআর এর একজন জেসিও এবং পরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এখানে কমান্ডার নিযুক্ত হন।

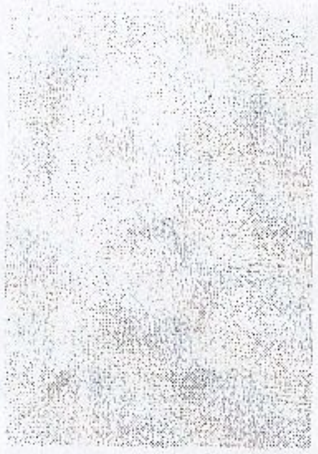
৩। সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দিন এখানে কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

৪। মোঘলাহাট সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ দেলোয়ার এ সাব-সেক্টরে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

৫। চিলাহাটি সাব-সেক্টর : এখানে কমান্ডার নিযুক্ত হন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশীদ।



ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ



ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার



২/লেফটেন্যান্ট আশফাক



২/লেফটেন্যান্ট মাসুদুর রহমান



২/লেফটেন্যান্ট মেসবাহ

ওরা সময়কে করেছে জয় – ৬ নং সেক্টরের ক'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা



# সেক্টর-৭

এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত তরঙ্গপুরে। সমগ্র রাজশাহী, পাবনা বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর ও রংপুর জেলার অংশ বিশেষ এই সেক্টরের আওতাভুক্ত করা হয়। এ সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বভার লাভ করেন মেজর নাজমুল হক। তিনি একাত্তরের এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উক্ত দায়িত্বে থাকেন। তারপর লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান একাত্তরের অক্টোবর হতে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত এ সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।



ওরা চির অম্লান - মেজর নাজমুল হক



ওরা সাহসী যোদ্ধা - লে. কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান

সৈন্য সংখ্যা :

নিয়মিত- ২,৫০০ (ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও সেনাসদস্যসহ)

গণবাহিনী- ১২,৫০০

অপারেশনাল কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে এই সেক্টরকে ভাগ করা হয় ৭টি সাব-সেক্টরে।

১। মালন সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর এখানে সাব-সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। তিনি শহীদ হলে ইপিআর এর জেসিওরাই এই সাব সেক্টর কমান্ড করে।

২। তপন সাব-সেক্টর : এখানে মেজর নাজমুল হক সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

৩। মেহেদীপুর সাব-সেক্টর : সুবেদার ইলিয়াস এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (শহীদ) এখানে সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

৪। হামজাপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ইদ্রিস (অবঃ) এখানে সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

৫। অংশিনাবাদ সাব-সেক্টর : একজন গণযোদ্ধা এখানে সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ করেন।

৬। শেখপাড়া সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ এ সাব-সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন।

৭। ঠোকরাবাড়ি সাব-সেক্টর : সুবেদার মোয়াজ্জেম এখানে সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ করেন।

## সেক্টর-৮

এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে। উত্তরে-পদ্মানদী, দক্ষিণে - সাতক্ষীরা এবং বৃহত্তর খুলনা ও বরিশালের কিয়দংশ, পূর্বে ফরিদপুর ও শরিয়তপুর এবং পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে এই সেক্টর গঠন করা হয়।

এ সেক্টর পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। একাত্তরের আগস্ট পর্যন্ত পরবর্তীতে মেজর এম এ মঞ্জুর তার স্থলাভিষিক্ত হন যিনি স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।



মেজর আবু ওসমান চৌধুরী
একাত্তরের নির্ভীক যোদ্ধা



মেজর এম এ মঞ্জু দেশের জন্য
একাত্তরের অনন্য উপহার



এই সেক্টরকে ভাগ করা হয় ৭ টি সাব-সেক্টরে। যেমন :-

১। শিকারপুর সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন তৌফিক এলাহী চৌধুরী। তিনি মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) ছিলেন।

২। লালবাজার সাব-সেক্টর : ইপিআর এর ৪ নং উইং এর উপ-অধিনায়ক এই সাবসেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৩। বানপুর সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান এখানে কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৪। বয়রা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা এখানে কমান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

৫। হাকিমপুর সাব-সেক্টর : ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ এখানে সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তাঁকে ক্যাপ্টেন পদে ফিল্ড কমিশন দেয়া হয়।

৬। বেনাপোল সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম এখানে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি জেড ফোর্সের সিগন্যাল কোম্পানির অধিনায়ক নিযুক্ত হলে ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী তার স্থলাভিষিক্ত হন।

৭। ভোমরা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন এটিএম সালাহউদ্দিন এখানে দায়িত্ব পালন করেন। পরে দায়িত্ব পালন করেন ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দিন। তিনি ঝিনাইদহের মহাকুমা পুলিশ অফিসার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে ফিল্ড কমিশন প্রদান করা হয়।



ক্যাপ্টেন এটি সালাউদ্দিন



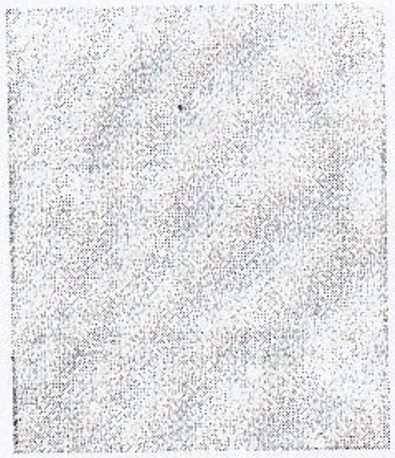
ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী



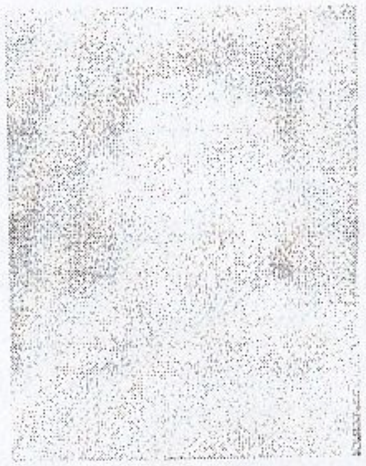
ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান



ক্যাপ্টেন সফিক উল্লাহ



ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই এলাহী



ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম

ওরা দুর্নিবার - ৮ নং সেক্টরের ক'জন দুরন্ত মুক্তিযোদ্ধা

## সেক্টর-৯

এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় সাতক্ষীরার টকিতে। এলাকাটা ভারতের সীমান্তবর্তী। দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয়।



দেশপ্রেমে বলিয়ান- সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল



সৈন্য সংখ্যা : মুক্তিযোদ্ধা প্রায় - ২০,০০০

পাকিস্তান হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীল করতে এই সেক্টরকে ভাগ করা হয় ৩টি সাব-সেক্টরে। যেমন :-

১। টাকি সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর।

২। হিঙ্গলগঞ্জ সাব-সেক্টর : এখানে কমান্ডার নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা।

৩। শমশেরনগর সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন প্রথমে ফাইট সার্জেন্ট সলিমুলাহ এবং পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন বেগ।



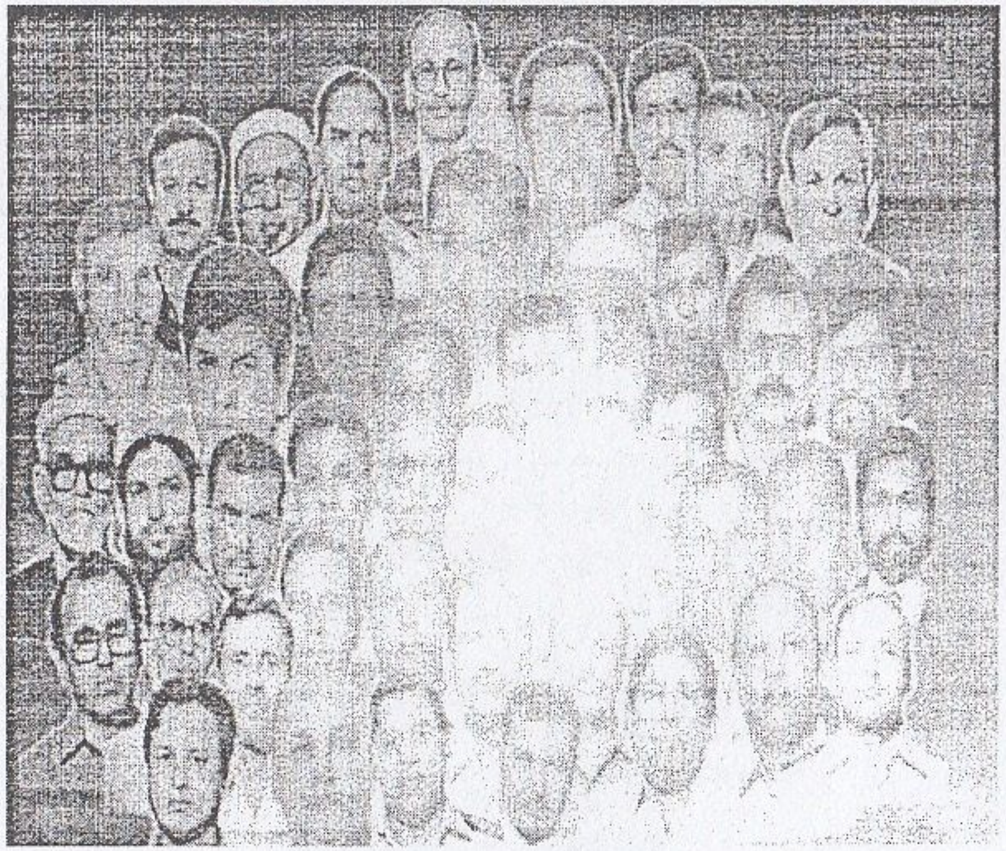
ওরা একাত্তরের গর্বিত যোদ্ধা - ৯নং সেক্টরের একগুচ্ছ তরুণ মুখ

# সেক্টর-১০

এ সেক্টরের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় ঐতিহাসিক পলাশীতে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে অবস্থিত পলাশী। বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ এ সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই সেক্টরের কোনো একক কমান্ডার ছিলেন না। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী সদর দপ্তর, ভারতীয় নৌ ও সেনাবাহিনী এবং অপারেশন এলাকায় সেক্টর কমান্ডারগণ নিজ নিজ এলাকায় নৌ যুদ্ধ সমন্বয় ও পরিচালনায় সহায়তা করেন।

সেনাবাহিনী: মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নৌ-সেনা, গণযোদ্ধা ও পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা নাবিকদের নিয়ে এ সেক্টরের জনবল গড়ে ওঠে।



ওরা উত্তাল তরঙ্গ - ওরা একাত্তরের নৌ-সেনা



# সেক্টর-১১

এই সেক্টরের সদর দপ্তর ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরায় স্থাপন করা হয়। ময়মনসিংহ, টাংগাইলের উত্তরাঞ্চল এবং রংপুরের গাইবান্ধা মহকুমা নিয়ে এ সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

এই সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ করেন মেজর আবু তাহের। তিনি ১৫ নভেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি আহত হলে স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুলাহ খান তার স্থলাভিষিক্ত হন।



একাত্তরের লড়াকু যোদ্ধা - মেজর এম এ তাহের



স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুলাহ খান

হানাদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১১ নং সেক্টরকে ৮ টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। যেমন :-

১। মানকারচর সাব - সেক্টর : এ সাব - সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুলাহ খান।

২। মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় লেফটেন্যান্ট আব্দুল মান্নানের উপর।

৩। পুরা খাসিয়া সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট হাশেম এ সাব-সেক্টরের নেতৃত্বের জন্য মনোনীত হন।

৪। ঢালু সাব-সেক্টর : লেফটেন্যান্ট তাহের ও লেফটেন্যান্ট কামাল দু'জনেই পর্যায়ক্রমে এখানে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

৫। রংরা সাব-সেক্টর : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এ সাব-সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

৬। বাচমারা সাব-সেক্টর : ইপিআর এর একজন জেসিও এ সাব-সেক্টরে নেতৃত্বের জন্য মনোনীত হন।

৭। ভোমরা সাব-সেক্টর : ইপিআর এবং গণবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এ সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দান করা হয়।

৮। মহেশখোলা সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টরে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন ইপিআর এর একজন সদস্য।



ওরা দুর্ধর্ষ - ১১ নং সেক্টরের ক'জন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা

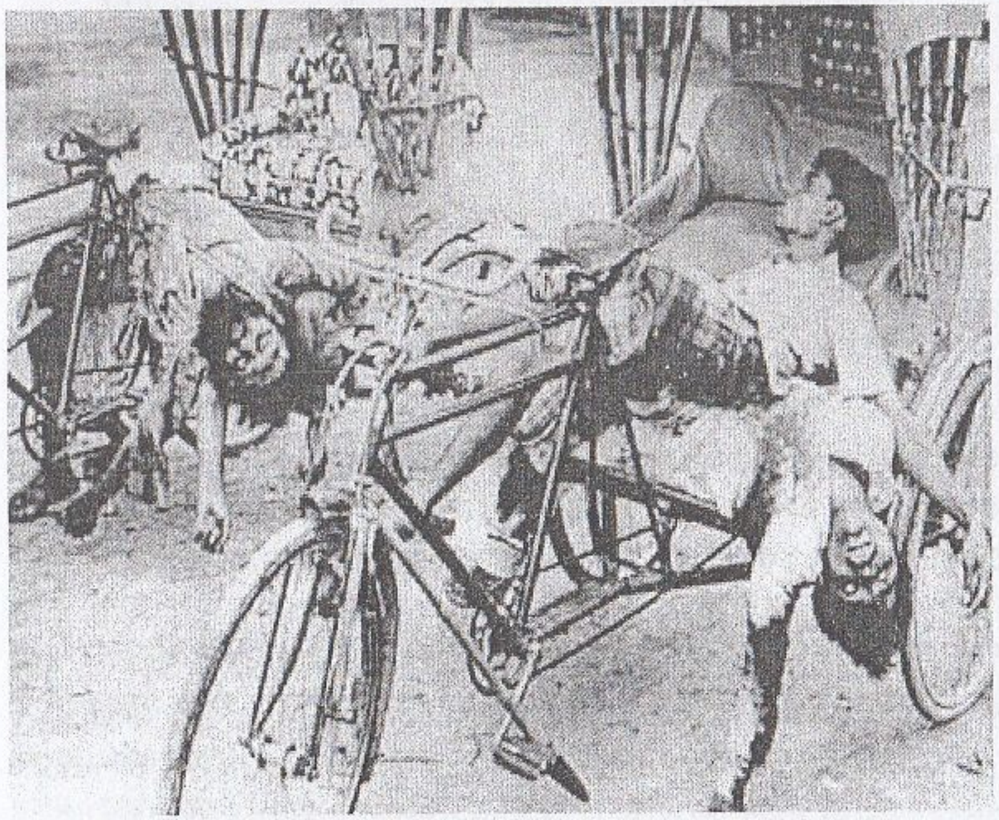
বাংলাদেশকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডারদের উপর যুদ্ধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাঁদের গতিশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে বেগবান হয়ে উঠছে মুক্তিযুদ্ধ। ধীরে ধীরে বাড়ছে শত্রুর আতঙ্ক, বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এ জন্যেই বোধ হয় সুকান্ত বলেছিলেন :

হে সূর্য !
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়ত আমরা প্রত্যেকেই এক একটা
জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব।





গেরিলা বাহিনীও গঠিত হতে থাকলো পাশাপাশি, ছাত্র এবং জনতাকে নিয়ে। ২ ইস্ট বেঙ্গলে মেজর মঈন আর ১১ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার হলেন ক্যাপ্টেন নাসিম। জুন-জুলাইতে শুরু হলো রিক্রুটমেন্ট দু'টি ব্যাটালিয়নের সমর শক্তি বাড়াতে। আধা শক্তি নিয়ে লড়াই করে সাফল্য লাভ করা কঠিন যে কোনো ব্যাটালিয়নের পক্ষে। সামনে আরো কঠিনতর দিন রয়েছে। পুরো বাংলাদেশ তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে। দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটে যাদের দিন। বীভৎস সব অত্যাচারের কাহিনী বের হয়ে আসতে থাকল।



ওরা নির্দয় ঘাতক - দিনাজপুরের রাস্তায় নাম না জানা ওরা শহীদ

কিভাবে পাকিস্তানিরা একের পর এক ধ্বংস করে চলেছে গ্রাম, শহর। মারছে মানুষ। নির্দয় ধর্ষণের শিকার হচ্ছে মেয়ে-মা। তাদের অসহায় হাহাকারে হতবাক হচ্ছে বিশ্ববিবেক। এ পাষণ্ডদের রুখতে হবে। এর জন্য চাই নিবেদিত প্রাণ,

৬। বাচমারা সাব-সেক্টর : ইপিআর এর একজন জেসিও এ সাব-সেক্টরে নেতৃত্বের জন্য মনোনীত হন।

৭। ভোমরা সাব-সেক্টর : ইপিআর এবং গণবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এ সাব-সেক্টরের নেতৃত্ব দান করা হয়।

৮। মহেশখোলা সাব-সেক্টর : এ সাব-সেক্টরে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন ইপিআর এর একজন সদস্য।



ওরা দুর্ধর্ষ - ১১ নং সেক্টরের ক'জন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা

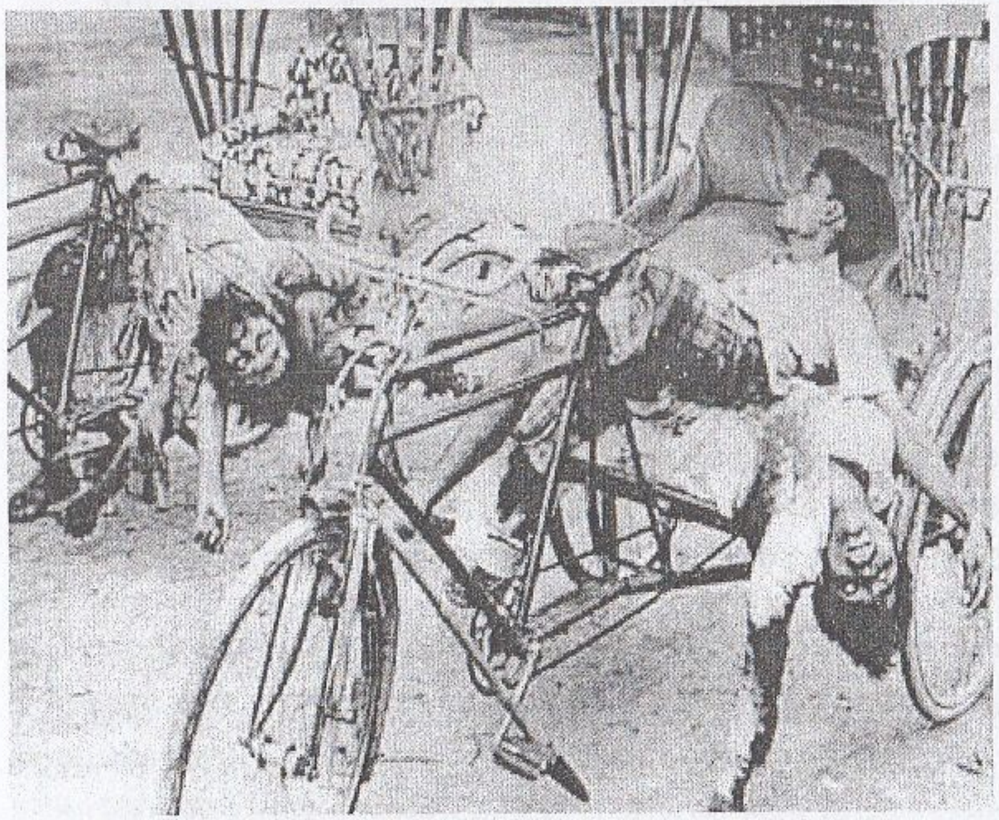
বাংলাদেশকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডারদের উপর যুদ্ধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাঁদের গতিশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে বেগবান হয়ে উঠছে মুক্তিযুদ্ধ। ধীরে ধীরে বাড়ছে শত্রুর আতঙ্ক, বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এ জন্যেই বোধ হয় সুকান্ত বলেছিলেন :

হে সূর্য !
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়ত আমরা প্রত্যেকেই এক একটা
জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব।





গেরিলা বাহিনীও গঠিত হতে থাকলো পাশাপাশি, ছাত্র এবং জনতাকে নিয়ে। ২ ইস্ট বেঙ্গলে মেজর মঈন আর ১১ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার হলেন ক্যাপ্টেন নাসিম। জুন-জুলাইতে শুরু হলো রিক্রুটমেন্ট দু'টি ব্যাটালিয়নের সমর শক্তি বাড়াতে। আধা শক্তি নিয়ে লড়াই করে সাফল্য লাভ করা কঠিন যে কোনো ব্যাটালিয়নের পক্ষে। সামনে আরো কঠিনতর দিন রয়েছে। পুরো বাংলাদেশ তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে। দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটে যাদের দিন। বীভৎস সব অত্যাচারের কাহিনী বের হয়ে আসতে থাকল।



ওরা নির্দয় ঘাতক - দিনাজপুরের রাস্তায় নাম না জানা ওরা শহীদ

কিভাবে পাকিস্তানিরা একের পর এক ধ্বংস করে চলেছে গ্রাম, শহর। মারছে মানুষ। নির্দয় ধর্ষণের শিকার হচ্ছে মেয়ে-মা। তাদের অসহায় হাহাকারে হতবাক হচ্ছে বিশ্ববিবেক। এ পাষণ্ডদের রুখতে হবে। এর জন্য চাই নিবেদিত প্রাণ,

যতটা সম্ভব সুশিক্ষিত বাহিনী। শত অসুবিধার মধ্যেও ওরা শুধু স্বাধীনতার এক লক্ষ্যে সংগঠিত হয়ে চলেছে।

সে দিনগুলোয় আবেগের সাথে এ অসমসাহসী যোদ্ধাদের দরকার ছিল মনোবল এবং দেশপ্রেম। তখন তাদের এগুলোর কোনোটারই ঘাটতি ছিল না। আর সাহস? কে বলে আমাদের সাহস নেই? একজন সাহসী যোদ্ধার কথা জানি। ধরা পড়েছিল পাকিস্তানিদের হাতে। তাকে গুলি করার জন্য জেটিতে দাঁড় করান হয়েছে, পিরোজপুরে। তখন এটা একটা নিরিবিলি ছিমছাম মহকুমা শহর। পিছনে ঘাতক। বাঙালির গর্বের ধন সেই সাহসী যোদ্ধা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো - 'I am not born to get a bullet on my back. Hit on my chest. বললো – 'আমি চলে গেলে আমার মতো আরো অনেকেই আসবে ! এদেশ তোমাদের পদতলে থাকবে না'।



এ লজ্জা লুকাবো কোথায় - ওদের লালসার শিকার এক হতভাগ্য নারী

আর তার কথা যতবার শুনেছি, ভরে উঠেছে বুক, আবেগে আর আনন্দে। অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে হেঁটেছি রাস্তায়। ভেবেছি আমিও হবো তাঁর মতো একজন যোদ্ধা। ২ এবং ৪ ইস্ট বেঙ্গলের যোদ্ধাদের কথা শুনতে শুনতে মনে হলো, আমি আরো অনেক দেশপ্রেমিকের গল্প শুনছি। প্রয়োজনে এরাই একক এবং দলগতভাবে দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ছিনিয়ে এনেছেন স্বাধীনতা, নিশ্চিত করেছেন বিজয়। আকাশে উড়িয়েছেন সূর্যখচিত স্বাধীনতার রক্তিম পতাকা।

সে ক্রাইসিসের দিনেও রিক্রুটমেন্ট কী রকম শক্ত ছিল শুনলে অবাক হবার মতো। ক্যাপ্টেন নাসিমের ভাই ছিলেন মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ছাত্র। নাম সম্ভবত জাকারিয়া। দাঁড়িয়েছিলেন লাইনে, সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য। তখন কিন্তু লোকজন নিজের ক্যারিয়ারের কথা কখনো চিন্তা করেনি, কেবল দেশের মুক্তির কথাই ভেবেছে। দেশের জন্য কিছু একটা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছে। মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন মুক্তার কামাল কি কারণে যেন তাকে

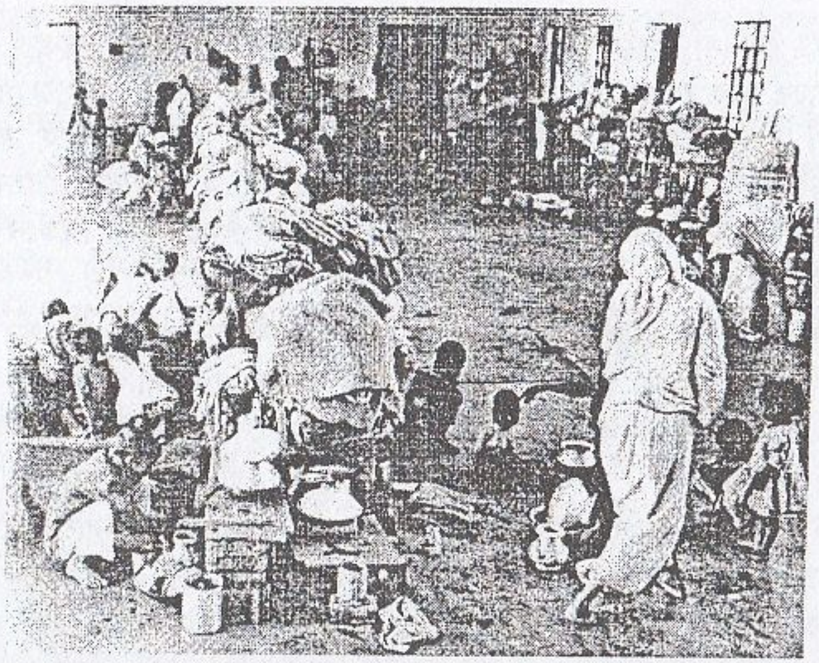


আনফিট ঘোষণা করলেন। সেদিনের ক্যাপ্টেন নাসিম খানিকটা অবাক হলেন। একাত্তরের যুদ্ধে যারা দেশসেবার জন্য সুযোগ চাচ্ছেন, তাদের সে সুযোগ পাওয়া উচিত। কিন্তু ক্যাপ্টেন নাসিম তাঁর ভাইয়ের জন্য কোনোভাবেই চাপাচাপি করেননি। করলেও কাজ হতো কিনা সন্দেহ আছে। কারণ সেসব দিনে মেডিক্যাল অফিসারদের মতামতের উপর কেউ কথা বলতেন না। মেনে নিতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন ছাড়াও এ ব্যাটালিয়নে আরও চারজন ডাক্তার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন বেসামরিক : ডা. আহমেদ আলী এবং ডা. আবেদুর রহমান। বিদেশে সরকার গঠনের পর আর্মি অফিসার হিসেবে সবাই বেতন পাওয়া শুরু করলেন। তবে তা হলো এক ধরনের ফ্লাট রেট। যেমন যে কোনো ইউনিট অধিনায়ক পাবেন প্রতিমাসে পাঁচশ টাকা। অন্য সব অফিসার পাবেন প্রতি মাসে চারশ' টাকা করে। কিন্তু বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ যারা সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করছেন তারা পাবেন প্রতিমাসে একশ' পঞ্চাশ টাকা করে। ডাক্তার হয়েও এতো কম বেতন পাবার কারণে সম্ভবত বিস্মিত হয়েছিলেন ডা. আবেদ এবং ডা. আহমেদ আলী। তাঁরা বিষয়টি সেক্টর কমান্ডারের কাছে উত্থাপন করলেন একদিন। কমান্ডার হাসিমুখে সহজ একটা সমাধান দিলেন তাঁদের। বললেন– তোমরা সেনাবাহিনীতে জয়েন করো। রাজি হয়ে গেলেন তাঁরা। সেক্টর কমান্ডার তাঁদের কমিশন প্রদানের জন্য সুপারিশ সহকারে লিখলেন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। কিছুদিনের মধ্যেই অনুমোদন চলে এলো। হয়ে গেলেন তাঁরা লেফটেন্যান্ট আহমেদ আলী এবং লেফটেন্যান্ট আবেদুর রহমান। বেতন হয়ে গেলো অন্যান্য অফিসারদের সমান সমান। ইউনিটে দু'জন মেডিক্যাল অফিসার ইন ইউনিফরম বাড়লো, তবে পূর্বের চিকিৎসকের সংখ্যার কোনো হেরফের হলো না।

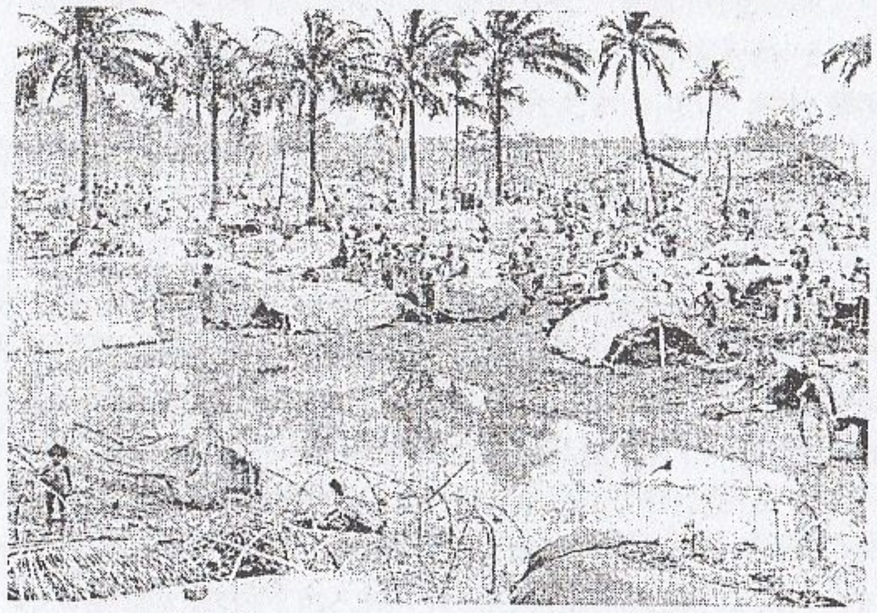
লড়াই করার জন্য মনোবলের সাথে লোকবলও দরকার। সে লক্ষ্যেই ২ এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গল দু'টো রেজিমেন্টের লোকবল পূরণের জন্য লোক ভর্তি করা হয়ে গেছে। লোকের এখন আর কোনো কমতি নেই। অনেক তরুণই তখন ভারতে, রিফিউজি হিসেবে। বরং বলা যেতে পারে লোকজনে থই থই, প্রায় পুরো বর্ডার বেল্ট জুড়ে।

সে সময়টায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। পুনর্গঠনের পালা চলছে তখন পুরোদমে। বিদেশেও আমাদের সরকার তখন বেশ সক্রিয়। তারা বললেন– আমাদের দেশ আমাদেরই মুক্ত করতে হবে। সে সময় প্রাণের জোয়ার, ত্যাগের জোয়ারে ভাসছে পুরো জাতি। তাছাড়া এ দেশের জন্য অন্য কারো আত্মাহুতি কাম্য নয়। নিজের দেশের জন্য নিজেদের ত্যাগ এবং তিতিক্ষা, এটাই কাম্য বরং বলবো তা-ই স্বাভাবিক। সেই দিনগুলিতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যে হারে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড শুরু করে তাতে সব বয়সী জনগণ তখন আতঙ্কিত। দলে দলে লোক ছুটছে জীবনের ভয়ে,



সে এক দুঃসহ দিন প্রাণভয়ে ভীত জনগণের সীমান্ত অতিক্রমের অপেক্ষা

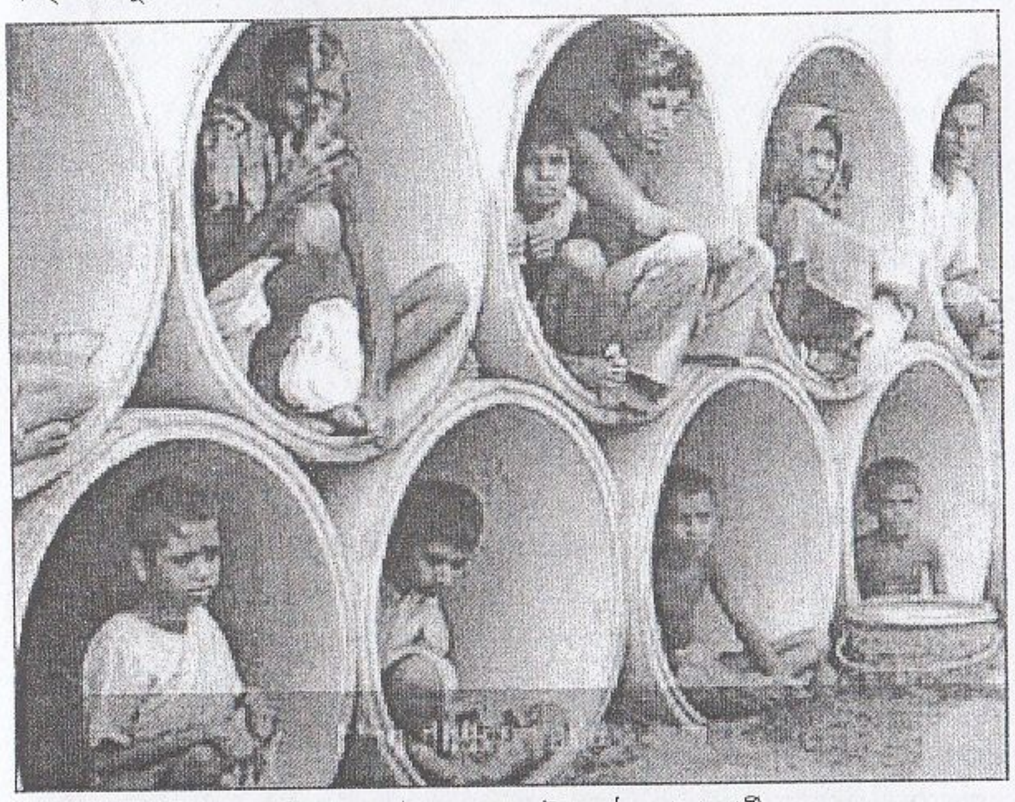
নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ভারত লাগোয়া বলে সেখানেই প্রবেশ করতে লাগলো প্রাণভয়ে পালানো লোকজন। আগরতলা, আসাম, ত্রিপুরা, সর্বত্র সীমান্ত এলাকাগুলো হয়ে গেলো যেন আরেক বাংলাদেশ। সেখানে তাদের না আছে সুপেয় পানি, না খাবার। হঠাৎ করে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভারতও বেসামাল হয়ে পড়ে এদের জন্য খাদ্য, বাসস্থান আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। মানুষ যেখানে যে পেরেছে ঠাঁই নিয়েছে। সে সুয়ারেজ লাইনের পাইপই হোক কিংবা খোলা আকাশ।



দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জীবন ওদের-কলকাতার উপকণ্ঠে শরণার্থী শিবিরের একাংশ



শুধু চেয়েছে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং নিরাপত্তা। দেশের অভ্যন্তরেও এমন এলাকা নেই বললেই চলে যেখানে মানুষকে ঘর ছাড়া হতে হয়নি। হয় পাকিস্তানি সেনা বা রাজাকার বা উভয়েই পুড়িয়েছে ঘর অথবা আক্রমণ করেছে সংখ্যা লঘুর উপর। কোনো কোনো সময় তারা হামলে পড়ে দানবের মতো। নামে সংখ্যালঘু কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সময় সংখ্যা গরিষ্ঠরাই ওদের জিঘাংসার শিকার হচ্ছিলো বেশি। স্বাস্থ্যবান যুবক পেলেতো কথাই নেই।



অস্তিত্বের লড়াই কলকাতার উপকণ্ঠে ওরা শরণার্থী

মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে হয় অত্যাচার নয়তো গুলি। দু'টোর যে কোনো একটা অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হতো ওদের যদি ধরা পরতো। মা বোনের সম্ভ্রম হানির কথা না-ই বলা হলো । ইতিহাস হয়ে আছে সে-সব লোমহর্ষক কাহিনী। নিষ্ঠুরতায় ভরা কান্না, আর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। এক সমীক্ষায় পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে ভারতে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা এক কোটি বিশ লক্ষ। যেখানে সর্বমোট জনসংখ্যাই ছিল সাত কোটি। অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক প্রাণভয়ে পালাতে বাধা হয়েছে। আগস্টের দিকে জোয়ানদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষ হলো । ওরা এখন যোদ্ধা, সাহসী এবং ত্যাগে উদ্বুদ্ধ। অস্ত্র চালাতে জানে, জানে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কাজেই সিদ্ধান্ত হলো হানাদারদের বিরুদ্ধে এবার শুরু হবে জোরদার আক্রমণ। ব্যাটালিয়নগুলো পুরোপুরি রিঅরগানেইজড হয়ে গেছে, নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক এবং ভলান্টিয়ারদের দিয়ে। ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ছিলেন বেলুচ রেজিমেন্টের। প্রথমে তিনি ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়কের

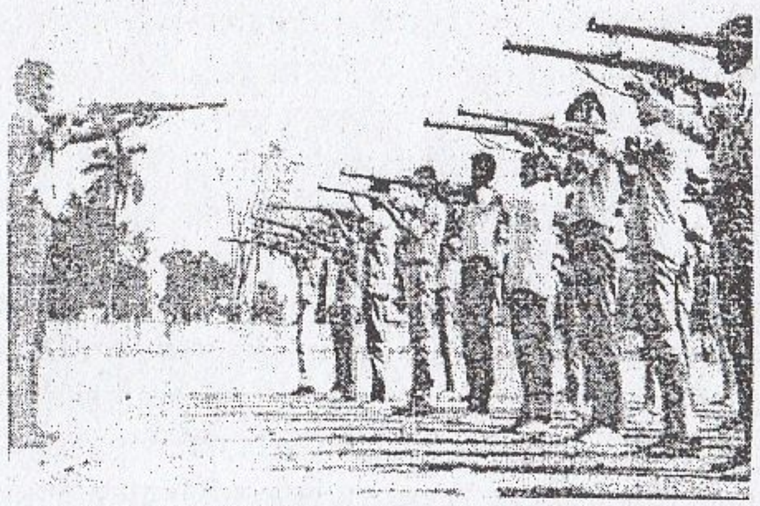
দায়িত্বে থাকলেও পরে তাঁকে কোম্পানি কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হলো। অন্যান্য যারা কোম্পানি কমান্ডারের নিযুক্তি পেলেন তারা হলেন ক্যাপ্টেন আবদুল আজিজ,



দুঃশাসনের নিপীড়নে ওরা দেশত্যাগী – ওরা শরণার্থী

ক্যাপ্টেন এজাজ, লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদ প্রমুখ। লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদ দায়িত্ব পেলেন ডেলটা কোম্পানির। এ কোম্পানি অবস্থান নিয়েছে কলকলিয়া টি গার্ডেনের সবচেয়ে কাছে।

লেফটেন্যান্ট হোসেনেরও এটা পুরানো পরিচিত জায়গা। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ কোম্পানির সাথেই জুড়ে গেলেন তিনি। হয়ে গেলেন এই যোদ্ধাদের সহযোদ্ধা এবং মেডিক্যাল অফিসার। শুরু হলো কর্মময় ব্যস্ত জীবন, টেন্টে, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী ভূমিকায়।



রণাঙ্গনের জন্য প্রস্তুতি - একাত্তরের প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধা



লক্ষ্যণীয়, যে সকল অফিসার একসময় ২ ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, পরবর্তীকালে তারা সবাই জেনারেল হয়েছেন। আবার কেউ কেউ সেনাপ্রধানও। আল্লাহ তাঁদেরকে এই সম্মানে অভিষিক্ত করেছেন। এ সম্মান মহান আল্লাহর তরফ হতে দেয়া। তারাও তাদের সময়ের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে নির্ভয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন।

ডেলটা কোম্পানির যুদ্ধের জীবন শুরু হলো কলকলিয়ায়, টেন্টে। কোম্পানি কমান্ডার সেদিনের লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদ একজন আপরাইট অফিসার, যিনি সব সময়ই সিমসাম থাকতে পছন্দ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ছিমছাম! তা কিভাবে সম্ভব! তবে তার পক্ষে সেটা যুদ্ধকালীন সময়ও সম্ভব ছিল। একটা উদাহরণ দিলে সেটা বুঝা যাবে। যেমন কোম্পানি কমান্ডার এবং মেডিকেল অফিসার ক্যাম্প সেট করেছেন কলকলিয়ায়, প্রায় মাটির পাঁচ ফিট গভীরে। খাট আছে, আছে কার্পেট, ফ্লাই প্রুফ নেট এবং চাঁচের বেড়া। দু'জনে একত্রে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন কিছু দিন যেতে যেতেই। এরই মধ্যে একদিন তাদের সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহ ভারতীয় আর্মির ব্রিগেডিয়ার আনন্দ সরূপকে নিয়ে এলাকাটা দেখতে আসলেন।



মুক্তিযোদ্ধারা এখন তৈরি - এগিয়ে যাচ্ছে রণাঙ্গণের দিকে

দেখে টেকে এস-ফোর্স (S-Force) কমান্ডারকে তিনি বললেন - Let us see how these two young officers are living. টেন্টে ঢুকে তিনি তো অবাক! In a field condition the internal arrangement is so gorgeous. কমান্ডারের দিকে ফিরে বললেন - Shafiullah, send a message to my wife. I am not going to fall back today. তারপর তাদের দিকে ফিরে বললেন - Will you please allow me to stay here for a day ?

ব্যক্তিগত জীবনে হেলাল মোর্শেদ সব সময়ই খুব টিপটপ থাকতেন। এটা স্বাধীন বাংলাদেশেও লেফটেন্যান্ট হোসেন বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করেছেন। He was an officer of taste.

ডেলটা কোম্পানির উপর তখনকার মতো দায়িত্ব ছিল প্রধানত মাইনর অপারেশন যেমন অ্যাম্বুশ, রেইড, পেট্রোলিং ইত্যাদি। যাতে করে শত্রু শান্তিতে না থাকতে পারে এবং তাদের ভিতর ভয় ঢুকে যায়। কারণ আক্রমণের পুরোভাগে যাবার অনুমোদন তখনও মুক্তিযোদ্ধাদের হয়নি। একবার ওরা দু'জন ঠিক করলেন ২ ইস্ট বেঙ্গলের অন্যান্য কোম্পানির লোকেশনে যাবেন। সব লোকেশন প্লান মাফিক, সীমান্ত বরাবর, সিলেটের উল্টোদিকে। ভাবনাটা এদের উৎসাহিত করলো। যাদের সাথে অনেকদিন দেখা হচ্ছে না তাদের দেখতে পাবার এটাই একটা সুযোগ। তারিখটা মনে নেই। তবে যাত্রা শুরু করলেন একদিন, দু'জনেই।



মুক্তিযুদ্ধে ওরা ঐতিহ্যবাহী - মার্চ এবং এপ্রিলে যশোরে গণপ্রতিরোধ

ওরা যাচ্ছিলেন টি গার্ডেনের মধ্যের ছোটো ছোটো ট্রাক ফলো করে। জিপ চলতে চলতে থামছে আবার থামতে থামতে চলছে। আসলে শুকনো মৌসুমে এই ট্রাকে হয়ত জিপ চালানো যায়। তবে বর্ষা মৌসুমে! চলবে, কারণ ওরাও তো চলছে। তবে হ্যাঁ, ভোগান্তির অন্ত নেই দু'জন তরুণ মুক্তিযোদ্ধার। ঐ ট্রাকগুলো দিয়ে গরুর গাড়ি চলে। দেখলেই বোঝা যায়, দাগ পড়ে আছে চাকার, বেশ গভীর হয়ে।

বেশ কয়েক জায়গায় ঠেলতে হলো জিপ। পুরো ট্রিপে কষ্ট হলেও অনেক পরিচিত মুখের সঙ্গেই দেখা হলো ওদের দু'জনার। যেমন ক্যাপ্টেন মতিউর, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেন আজিজ। দু'জন যোদ্ধাকে দেখে যারপরনাই খুশি হলেন তারা।



ওদের সাথে একদম শেষের ক্যাম্পে দেখা হলো লেফটেন্যান্ট মঈনের সাথে। লেফটেন্যান্ট হোসেনের মতোই ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের একজন মেডিক্যাল অফিসার তিনি। তার বেঁচে আসার ঘটনাটা যেন একটা মিরাকল। পরম করুণাময়ের নিতান্ত দয়া যে তিনি তখনো জীবিত। ছিলেন সিলেটের শমশেরনগরে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আরএমও (রেজিমেন্টাল মেডিক্যাল অফিসার), অস্থায়ী দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন ২৫শে মার্চের আগে। সঙ্গে আরেকজন বাংলাদেশি অফিসার ছিলেন, মাহবুব। ভোর বেলা দু'জনে টেন্টে বসে নাস্তা করছিলেন। ২৭ কিংবা ২৮ মার্চের ঘটনা। হঠাৎ করে দু'তিনজন পাকিস্তানি এনসিও এসে ওদের উপর গুলি চালালো কোনো হুঁশিয়ারি ছাড়াই। মাহবুব সম্ভবত লেফটেন্যান্ট অথবা ক্যাপ্টেন পদবির। বেচারা সাথে সাথেই শহীদ হয়ে গেলেন। মঈনকে নেয়া হলো হাসপাতালে, আহত অবস্থায়। তিনি আঘাত পেয়েছিলেন গ্রোইনে। আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। কিন্তু সার্বিক অবস্থা আর বুঝতে বাকি নেই তাঁর। পাকিস্তানিরা হত্যা করা শুরু করেছে সব বাঙালি অফিসার ও জোয়ানকে। ঘাতকদের হাতে ফেরত গেলে আর বাঁচা নয়! বাঁচতে হলে তাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে অথবা পালাতে হবে। ব্যাপারটা ছিল দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা নিলেন তিনি। মঈন ডাক্তারদের অনুরোধ করে বললেন তাকে হাসপাতালে রেখে দেয়ার জন্য। তারাও সবাই এদেশেরই সন্তান। রেখে দিলেন মঈনকে। ঐ সময় পাকিস্তানিরা আর দ্বিতীয়বার মঈনের খোঁজ নিতে আসেনি। এটা ছিল সিলেটের শমশেরনগরের ঘটনা। যেহেতু ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ওখানেই ছিল বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার মতো ঘাতকরা এখানেও নিরস্ত্র জনগণকে রেহাই দেয়নি।

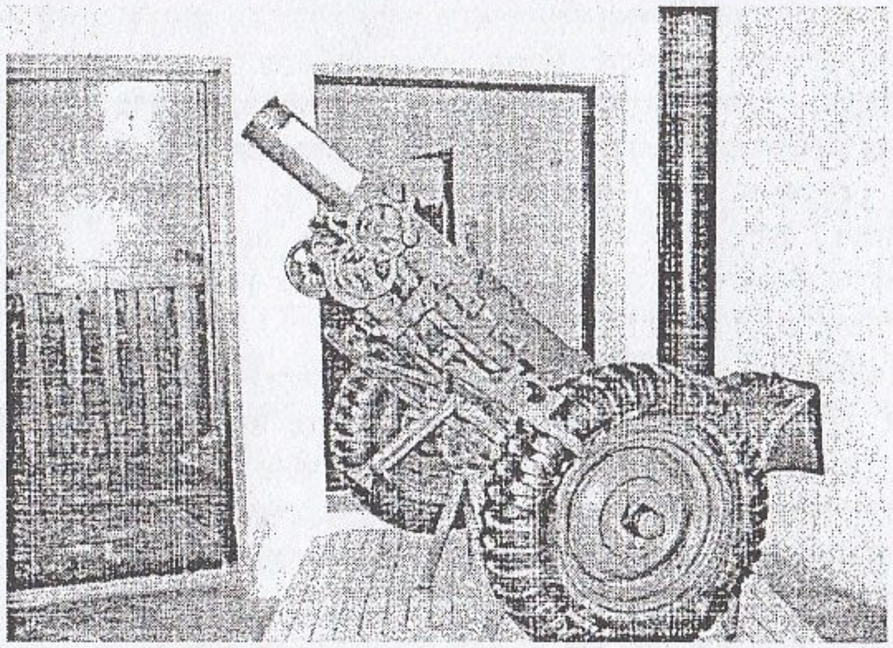
ঐ সময়টাতে শমশেরনগরে পাকিস্তানি আর্মি কোণঠাসা হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারাই তখন প্রাধান্য বিস্তার করে আছে সিলেটে। মঈনের মুখেই শোনা গেলো, একজন স্টাফনার্স ছিলেন, তিনি মঈনকে ভালভাবে সেবা যত্ন করেছিলেন। মঈন জানতো এখানে বেশিদিন থাকা মস্ত বোকামি হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন পালাবেন। হাসপাতাল থেকে পালাবার সময় স্টাফ নার্সকেও সাথে করে বের হলেন মঈন। কিন্তু বিধিবাম। ভাগ্য খারাপই বলতে হবে বেচারি সেবিকার। হঠাৎ হসপিটাল কম্পাউন্ডে প্রিন্সিপাল এসে হাজির। রীতিমতো হাঁকাহাঁকি করে সিস্টারকে রেখে দিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সবাই চলে গেলে হাসপাতাল চলবে কি করে !

আসলে হাসপাতাল চলবে, তো কাদের জন্য চলবে? যাদের জন্য হাসপাতাল তৈরি হয়েছে পাকিস্তানিরা তখন হত্যা করে চলেছে তাদেরকেই। মৃত ব্যক্তির জন্য তো হাসপাতালের দরকার নেই। ফলে যা ঘটার তা-ই ঘটলো। সিস্টার প্রিন্সিপালের কথা ফেলতে পারলেন না। থেকে গেলেন তিনি। পরের দিন হাসপাতালে উপস্থিত হলো পাকিস্তানিরা সদম্ভে, সশস্ত্র অবস্থায়। মারলো যাকে সামনে পেলো তাকেই, নির্বিচারে। বেচারি স্টাফ নার্সও রেহাই পেলেন না। তাকে আত্মাহুতি দিতে হলো বিনা কারণে, দুঃস্থ মানুষকে সেবার জন্য।



পুরো ঘটনার মধ্যে দুঃখ থাকলেও লেফটেন্যান্ট মঈনকে কাছে পেয়ে ওরা অত্যন্ত আনন্দিত। মনে হয় সে তৃপ্তি এখনো তাদের ছুঁয়ে যায়। ওরা দেশের জন্য লড়াই করেছে। ওদের অস্তিত্ব অম্লান হয়ে থাক চিরদিন।

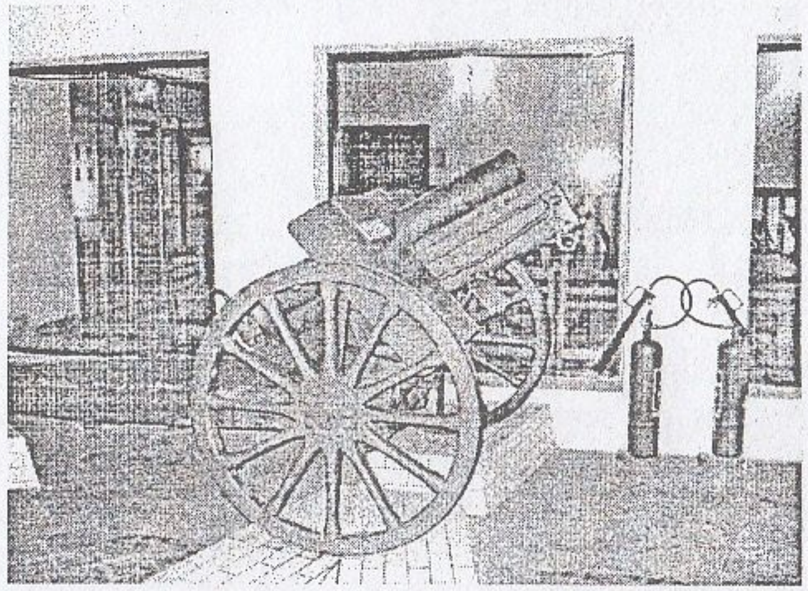
২, ৪ এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গুছিয়ে ওঠার কিছুদিনের পরের ঘটনা। ক্যাপ্টেন আজিজের সম্ভবত চার্লি কোম্পানি খোয়াইনদী বরাবরে কোথাও অবস্থান নিয়েছে। জায়গাটার নাম স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না লেফটেন্যান্ট হোসেন। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার আগের জায়গায়ই থাকলো, সম্ভবত হেজামুরা জায়গাটার নাম। ডেলটা কোম্পানি থেকে চার কি পাঁচ মাইল ভারতের অভ্যন্তরে। সিদ্ধান্ত হল লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদের নেতৃত্বে ডেলটা কোম্পানি পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণে যাবে। সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল শফিউল্লাহ দেখবেন এ কোম্পানির অ্যাকশন। তারিখটা মনে নেই তবে সময়টা মনে আছে। এটা ব্যাটালিয়ন কার্যকর হবার পরের কাছাকাছি কোনো দিন। ওরা সাহসী যোদ্ধার দল রাতের অন্ধকারের যে যার জায়গায় পৌঁছে গেলেন। মেডিকেল



একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধাদের ব্যবহৃত ১২০ মি.মি. গান

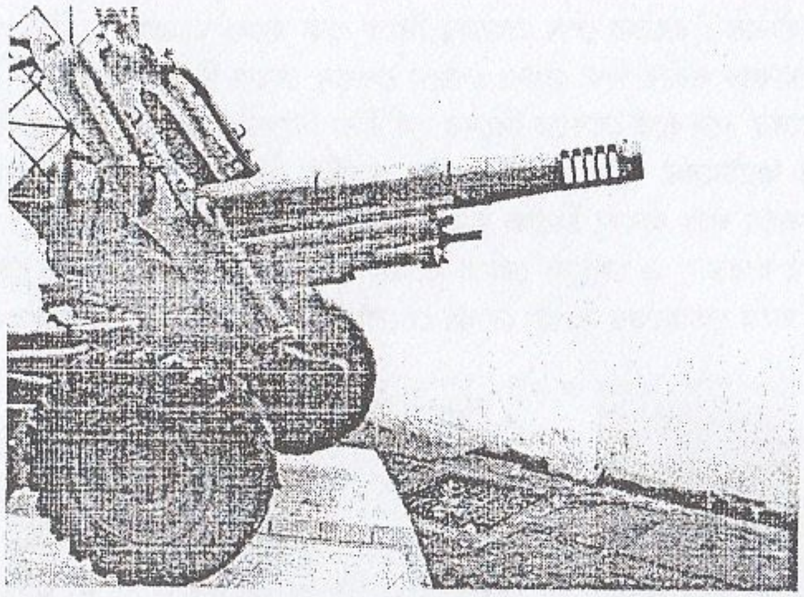


ইলিমেন্টকে একটা গাছের গোড়ায় অবস্থান নিতে বলা হলো। মূল দল এগিয়ে গেলো সামনে। রাতের শেষ প্রহরের দিকে শুরু হলো আক্রমণ। চিকিৎসক দল পিছনে থাকায় গুলির শব্দ শোনা গেলো সেখান থেকে কিন্তু কিছুই দেখার উপায় নেই তাদের। দেখতে দেখতে দিনের সূর্য উঁকি দিলো। ডেলটা কোম্পানির সাহসী যোদ্ধারা অ্যাটাকের পরে ফিরে এলেন ভারতীয় ভূখণ্ডে। সেক্টর কমান্ডার যখন এলেন তখন শান্ত অবস্থা বিরাজ করছে চারদিকে। বাইনোকুলার দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থান ও চলাচল বোঝা যাচ্ছিল। ঘাতকরা নিজেদের প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। তবে হতাহতের সংখ্যা বোঝা গেলো না। আক্রমণে আহত একজন



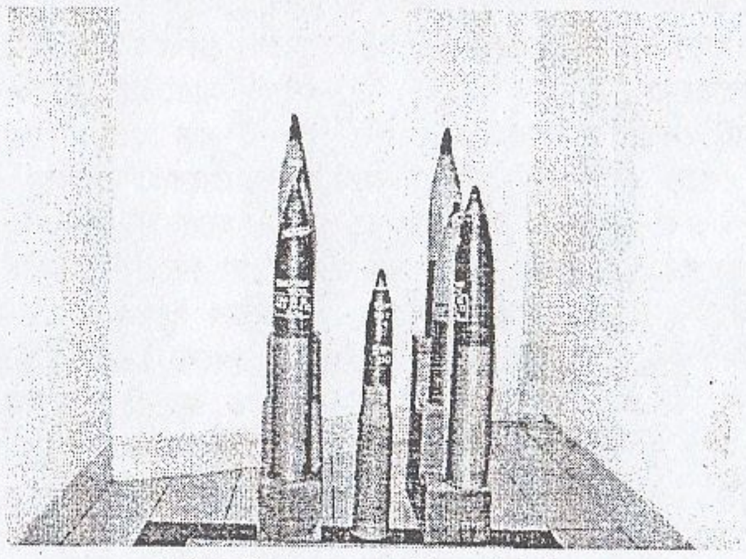
নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত ৬ পাউন্ডার কামান

নায়েককে (বর্তমানে 'কর্পোরাল') টি গার্ডেন এবং বাংলাদেশি ভূখণ্ডকে বিভক্তকারী নালায় পড়ে থাকতে দেখা গেলো। সে রক্তাক্ত। বোঝা যাচ্ছে দূর থেকেই। ওকে উদ্ধার করে আনতে যাওয়া রিস্কি। কারণ ওখানে গেলে খোলা জায়গা দিয়ে যেতে হবে। তার মানে বাঙালি যোদ্ধারা যদি পাকিস্তানিদের দেখতে পায়, তাহলে ওরাও নিশ্চয় মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে পাচ্ছে। নিদেনপক্ষে আহতের উদ্ধারকারী দলকে তো অবশ্যই দেখবে। তারপরও দায়িত্ব পালনই বড় কথা। আহত বন্ধুকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রাখা কাপুরষতা। সিদ্ধান্ত মোতাবেক একজন মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট এবং একজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা পাঠানো হলো উদ্ধার অভিযানে। ওরা গ্রামের কৃষকদের মতো লুঙ্গি পরে কোমড়ে গামছা বেঁধে ধীরে ধীরে এগুলো সামনের দিকে। যেতে যেতে সত্যিকারের কৃষকের ভূমিকায় সফল অভিনয় করলো তারা। কখনো থামলো, মাঠের ভালোমন্দ দেখলো, আবার এগুলো। থামা আর এগুনো, এগুনো আর থামা, এ ড্রিল করতে করতে এক সময় আহত এনসিও'র কাছে পৌঁছে গেলো ওরা দু'জন নির্ভীক যোদ্ধা। তারপর সফলভাবে সম্পন্ন করলো উদ্ধার কাজ। পাকিস্তানিরা গুলি ছোড়েনি। নিশ্চয় দেখতে পায়নি অথবা দ্বিতীয়বার দিনের আলোয় বীরত্বপূর্ণ আত্মাহুতির ইচ্ছা জাগেনি তাদের।



মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব - নির্ভীক যোদ্ধাদের
হাতে বার বার গর্জে উঠে ১০৫ মি.মি. কামান

এক সময় বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে নেয়া হতো সীমিত সংখ্যায়। ১৯৬৫'র পাক-ভারত যুদ্ধে ওরা বিশালদেহী পাকিস্তানিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সাহস আর নৈপুণ্যে। আর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সুশিক্ষিত যোদ্ধা যারা আমাদের সাধারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যোদ্ধাদের হাতে বেধড়ক মার খাচ্ছে এরাই তো শুনেছি সুবিখ্যাত যোদ্ধার দল। তাদের নাম নাকি বিশ্বব্যাপী। ভিয়েতনামে হেরেছিল মার্কিনীরা। পরের জন্য লড়েছিল ওরা। এখানে যারা লড়াই করছে অর্থাৎ পাকিস্তানিরা, ওরা শুধু স্বার্থের জন্য লড়ছে। লড়ছে অন্য একটা জাতিকে পদদলিত করতে, শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে। এখানে ওরা অনেকেই হয়ত লড়ছে বিবেকের বিরুদ্ধে। নির্বিচারে হত্যা করছে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে। প্রত্যেক

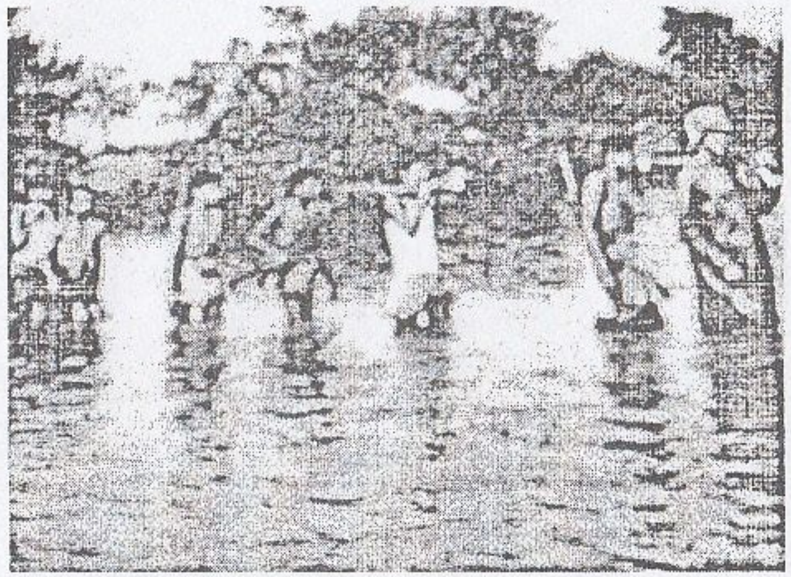


মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত কিছু গোলা-বারুদ



মুহূর্তে মুহূর্তে হারাচ্ছে মনোবল। আর আমরা যারা লড়াই করছি, করছি বেঁচে থাকতে সসম্মানে, জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। হারলে দাসত্ব – জিতলে স্বাধীনতা। আমি, আমার সন্তান, আমাদের অনাগত সন্তান এবং তাদের ভবিষ্যৎ! সেটা নিষ্কণ্টক করতেই আমাদের লড়াই। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটা গান এখনও অনেককেই বার বার দোলা দেয়, স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে .....

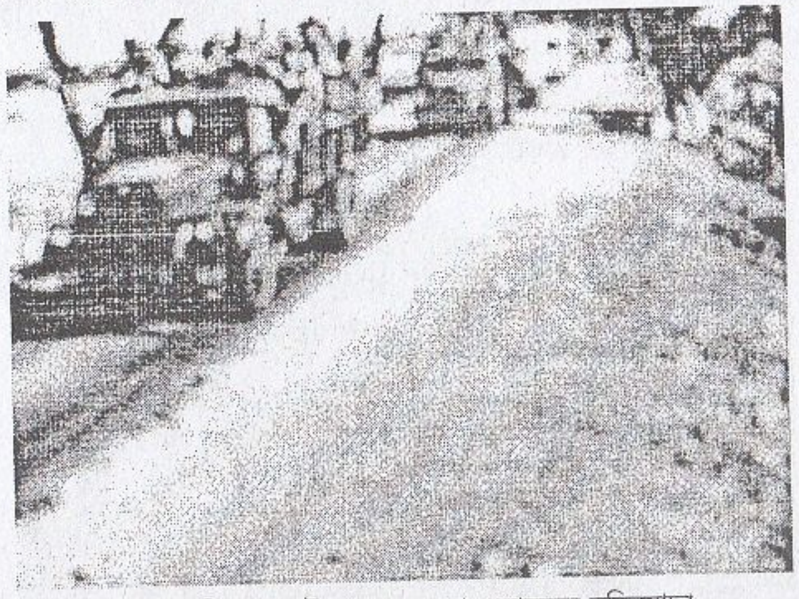
মোরা একটা ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটা মুখের হাসির জন্য যুদ্ধ করি



এগিয়ে চলে যুদ্ধ-রণাঙ্গণে অকুতোভয় মুক্তিদ্ধোরা

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশিদের লড়াইটা ছিল অসম। কিন্তু সে দিনের ত্যাগে উজ্জীবিত মানুষের বিজয় ছিল শাশ্বত। সে কথারই প্রতিধ্বনি আজও বেজে ওঠে দৃঢ়চেতা সকল মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে। একসময় আহত মুক্তিযোদ্ধাকে যখন লেফটেন্যান্ট হোসেনের কাছে নিয়ে আসা হলো দেখলেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে বেচারা। পেটে গুলি লেগেছে। সেক্টর কমান্ডারকে তিনি বললেন – স্যার, ইমিডিয়েটলি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কমান্ডার রোগীকে তাঁর জিপের পিছনে বসালেন। লেফটেন্যান্ট হোসেনকে দ্বিতীয় আসনে নিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে রওয়না হলেন আগরতলা জেনারেল হাসপাতালের দিকে। কোম্পানি কমান্ডারের তখনকার মতো কোনো কাজ না থাকায় তিনিও বাইরে গেলেন। যাবার আগে লেফটেন্যান্ট হোসেন তাকে জানিয়ে গেলেন ফেরার পথে কোথায় নামবেন তিনি। ডেলটা কোম্পানি কমান্ডার কথা দিলেন যখন ফিরবেন তাকে সাথে নিয়ে ফিরবেন ক্যাম্পে। আগরতলা জেনারেল

হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাকে দ্রুত অপারেশনের ব্যবস্থা করা হলো। প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় রক্ত সঞ্চালন জরুরি ছিল। রক্ত দেয়া সে সময় কোনো সমস্যা ছিল না। মুক্তিযোদ্ধা বা বাংলাদেশ থেকে আগত লোকজনের ক্যাম্প ছিল কাছে পিঠেই। খবর দিলেই রক্ত দিতে ছুটে আসতো তারা। এবারও তাই হলো। রক্তদাতাদের কোনো ঘাটতি নেই। শেষে শুরু হলো রক্ত সঞ্চালন ও অপারেশন।



শত্রুকে নিধন করেই থামবে - ওরা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা

ডেলটা কোম্পানির ডাক্তার লেফটেন্যান্ট হোসেনের কাজ শেষ হলো এরপর। রোগী এখন ভালো। তার দায়িত্ব নিয়েছে হাসপাতাল। শেষে সেক্টর কমান্ডার তাকে বললেন – চলো, ফিরে যাই। লেফটেন্যান্ট হোসেন ফিরলেন সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গেই। ক্যাম্পের কাছাকাছি বড়ো একটা রাস্তার মোড়ে এসে তিনি গাড়ি থেকে নামতে চাইলেন। বললেন যে, লেফটেন্যান্ট মোর্শেদের সাথে কথা হয়েছে, তিনি হোসেনকে নিয়ে যাবেন ফেরার পথে। এখান থেকে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে সেক্টর হেডকোয়ার্টার। সেক্টর কমান্ডার তরুণ যোদ্ধাকে রেখে চললেন আপন গন্তব্যে। ধোঁয়া উড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো জিপ। দেখতে দেখতে একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন তিনি।

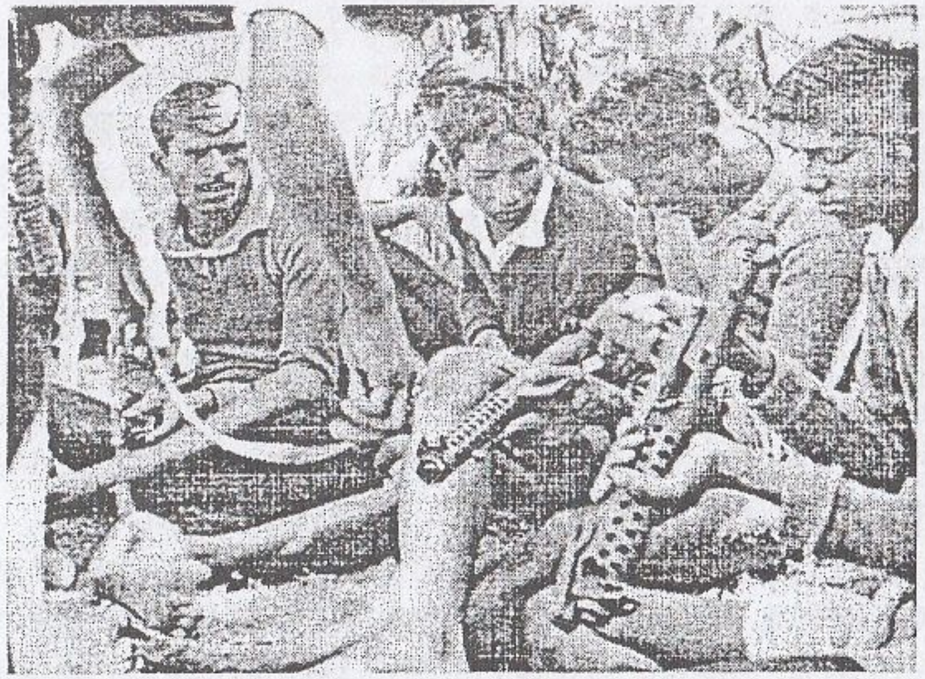
পড়ন্ত বিকেলে গোধুলির কাছাকাছি একা হয়ে গেলেন তরুণ যোদ্ধা লে. হোসেন। রাস্তা নির্জন। ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেখতে দেখতে আলো ফুরিয়ে এলো কিন্তু লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদের দেখা মিললো না। তিনি ভাবলেন খানিকটা বাঁয়ে যেয়ে আধা মাইল হাঁটলেই কাঁচা রাস্তার মোড়। ওখানেই হয়ত তার জন্য অপেক্ষা করছেন কোম্পানি কমান্ডার।

শেষে হেঁটে হেঁটে পৌঁছলেন সেখানে। তখন সেনাবাহিনীর ইউনিফরম পরনে নেই এ যোদ্ধার। কিন্তু সাথে আছে গুলিসহ পিস্তল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এবার সামান্য ভয় ভয় করতে শুরু করলো তার। বড় রাস্তার পাশে কয়েকটা হিন্দু বাড়ি।



এ ছাড়া সেদিকে আর তেমন কোনো ঘরবাড়ি নেই। আছে শুধু নির্জন টি গার্ডেন, অন্তহীন নীরবতা, জঙ্গল, পায়ে চলার ভেজা পথ, একদম কাদায় মাখামাখি। কারণটা স্পষ্ট, বর্ষার ভর মৌসুম তখন। ঝম ঝম বৃষ্টি, যে কোনো সময়ই নামে, চলে একদিন, দু'দিন, কখনো বা অল্প সময়ের জন্য, আবার থামে। কাজেই সাধারণ পায় চলা পথের অবস্থা বেহাল।

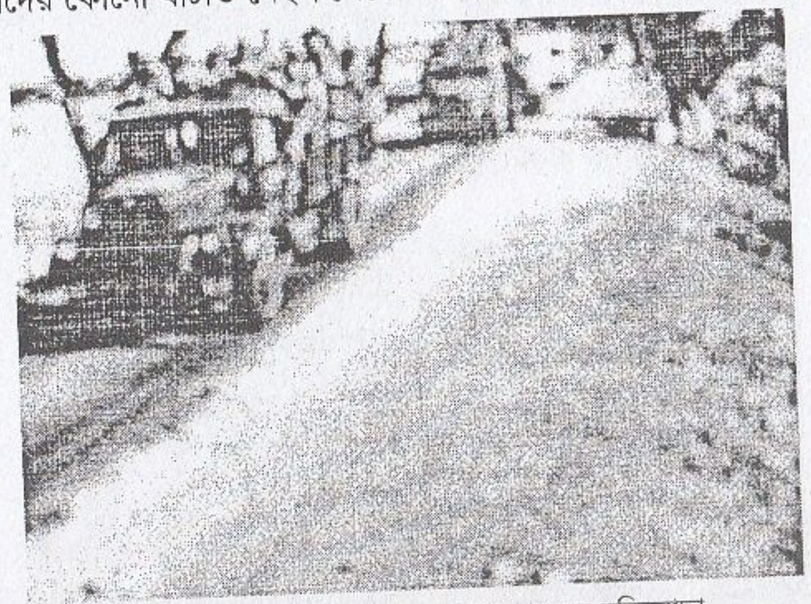
রাত জেঁকে বসেছে, প্রকৃতির নীরবতা আরো বাড়লো। দু'একটা ব্যাঙ ডাকছে হঠাৎ হঠাৎ করেই কো----কা----কো-----কা-----। কিন্তু ওরা থামতেই গভীর নীরবতায় আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে প্রকৃতি। তার উপর কোনো আলো নেই কোথাও। অন্ধকারকে সম্বল করেই পথে পা বাড়ালেন হোসেন, ক্যাম্পের দিকে। বড়ো রাস্তার পাড়ে হিন্দু বাড়ি। সেখানে যেয়ে আশ্রয় নেয়ার কথা বার বার মনে হলেও তারা ভয় পাবে কিনা, তাকে শত্রুপক্ষের কেউ বলে ভাববে কিনা ইত্যাদি ভাবনা তাকে নিরাপদ আশ্রয়ের আগ্রহ থেকে দূর করে রাখলো। কিছুদূর যেতেই দু'তিনজন লোক দেখলেন তিনি, একই পথ ধরে হাঁটছে। এদের পেয়ে তার মনে সাহস বাড়লো অনেক। অপরিচিত লোকজনের সাথেই হাঁটতে থাকলেন তিনি। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। দিনমজুর বলেই মনে হলো তাদের। তবে অন্ধকার রাস্তায় তারা অজান্তেই হয়ে উঠলো একান্ত



ওরা নির্ভীক-দেশের স্বাধীনতাই ওদের একমাত্র লক্ষ্য

আপনজনের মতো, কোনো কথা ছাড়াই। প্রায় মাইল খানেক হাঁটার পরে হঠাৎ করেই নেই হয়ে গেলো তারা। সঙ্গী হয়ে রইলো প্রকৃতির নীরবতা, নিশুতি রাতের নিকষ কালো অন্ধকার আর অটুট গাম্ভীর্য। সেখান থেকে মাইল খানেক গেলে

হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাকে দ্রুত অপারেশনের ব্যবস্থা করা হলো। প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় রক্ত সঞ্চালন জরুরি ছিল। রক্ত দেয়া সে সময় কোনো সমস্যা ছিল না। মুক্তিযোদ্ধা বা বাংলাদেশ থেকে আগত লোকজনের ক্যাম্প ছিল কাছে পিঠেই। খবর দিলেই রক্ত দিতে ছুটে আসতো তারা। এবারও তাই হলো। রক্তদাতাদের কোনো ঘাটতি নেই। শেষে শুরু হলো রক্ত সঞ্চালন ও অপারেশন।



শত্রুকে নিধন করেই থামবে - ওরা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা

ডেলটা কোম্পানির ডাক্তার লেফটেন্যান্ট হোসেনের কাজ শেষ হলো এরপর। রোগী এখন ভালো। তার দায়িত্ব নিয়েছে হাসপাতাল। শেষে সেক্টর কমান্ডার তাকে বললেন – চলো, ফিরে যাই। লেফটেন্যান্ট হোসেন ফিরলেন সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গেই। ক্যাম্পের কাছাকাছি বড়ো একটা রাস্তার মোড়ে এসে তিনি গাড়ি থেকে নামতে চাইলেন। বললেন যে, লেফটেন্যান্ট মোর্শেদের সাথে কথা হয়েছে, তিনি হোসেনকে নিয়ে যাবেন ফেরার পথে। এখান থেকে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে সেক্টর হেডকোয়ার্টার। সেক্টর কমান্ডার তরুণ যোদ্ধাকে রেখে চললেন আপন গন্তব্যে। ধোঁয়া উড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো জিপ। দেখতে দেখতে একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন তিনি।

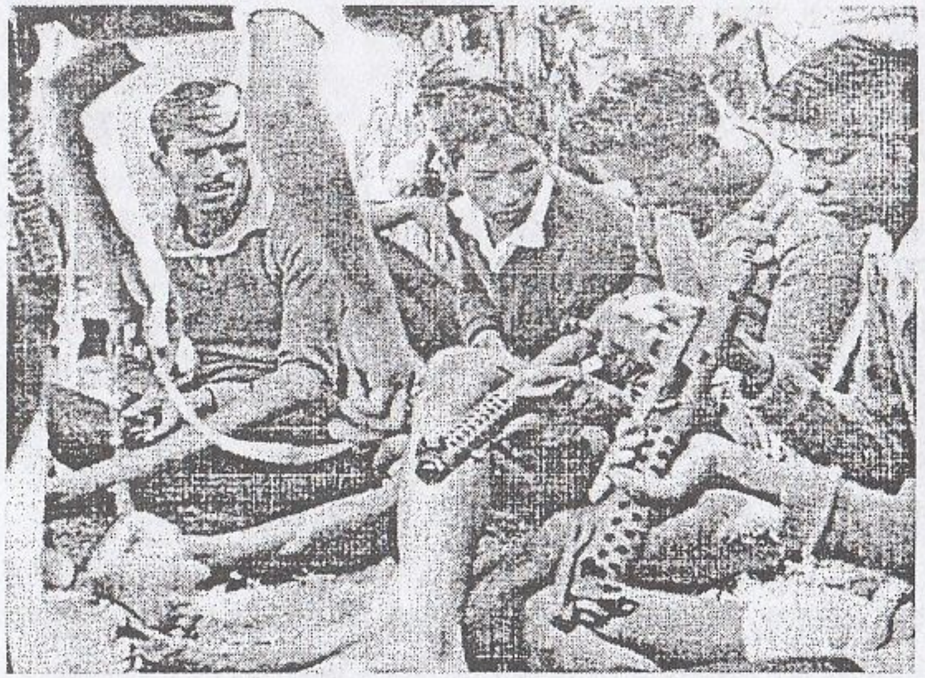
পড়ন্ত বিকেলে গোধুলির কাছাকাছি একা হয়ে গেলেন তরুণ যোদ্ধা লে. হোসেন। রাস্তা নির্জন। ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেখতে দেখতে আলো ফুরিয়ে এলো কিন্তু লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদের দেখা মিললো না। তিনি ভাবলেন খানিকটা বাঁয়ে যেয়ে আধা মাইল হাঁটলেই কাঁচা রাস্তার মোড়। ওখানেই হয়ত তার জন্য অপেক্ষা করছেন কোম্পানি কমান্ডার।

শেষে হেঁটে হেঁটে পৌঁছলেন সেখানে। তখন সেনাবাহিনীর ইউনিফরম পরনে নেই এ যোদ্ধার। কিন্তু সাথে আছে গুলিসহ পিস্তল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এবার সামান্য ভয় ভয় করতে শুরু করলো তার। বড় রাস্তার পাশে কয়েকটা হিন্দু বাড়ি।



এ ছাড়া সেদিকে আর তেমন কোনো ঘরবাড়ি নেই। আছে শুধু নির্জন টি গার্ডেন, অন্তহীন নীরবতা, জঙ্গল, পায়ে চলার ভেজা পথ, একদম কাদায় মাখামাখি। কারণটা স্পষ্ট, বর্ষার ভর মৌসুম তখন। ঝম ঝম বৃষ্টি, যে কোনো সময়ই নামে, চলে একদিন, দু'দিন, কখনো বা অল্প সময়ের জন্য, আবার থামে। কাজেই সাধারণ পায় চলা পথের অবস্থা বেহাল।

রাত জেঁকে বসেছে, প্রকৃতির নীরবতা আরো বাড়লো। দু'একটা ব্যাঙ ডাকছে হঠাৎ হঠাৎ করেই কো----কা----কো-----কা-----। কিন্তু ওরা থামতেই গভীর নীরবতায় আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে প্রকৃতি। তার উপর কোনো আলো নেই কোথাও। অন্ধকারকে সম্বল করেই পথে পা বাড়ালেন হোসেন, ক্যাম্পের দিকে। বড়ো রাস্তার পাড়ে হিন্দু বাড়ি। সেখানে যেয়ে আশ্রয় নেয়ার কথা বার বার মনে হলেও তারা ভয় পাবে কিনা, তাকে শত্রুপক্ষের কেউ বলে ভাববে কিনা ইত্যাদি ভাবনা তাকে নিরাপদ আশ্রয়ের আগ্রহ থেকে দূর করে রাখলো। কিছুদূর যেতেই দু'তিনজন লোক দেখলেন তিনি, একই পথ ধরে হাঁটছে। এদের পেয়ে তার মনে সাহস বাড়লো অনেক। অপরিচিত লোকজনের সাথেই হাঁটতে থাকলেন তিনি। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। দিনমজুর বলেই মনে হলো তাদের। তবে অন্ধকার রাস্তায় তারা অজান্তেই হয়ে উঠলো একান্ত



ওরা নির্ভীক-দেশের স্বাধীনতাই ওদের একমাত্র লক্ষ্য

আপনজনের মতো, কোনো কথা ছাড়াই। প্রায় মাইল খানেক হাঁটার পরে হঠাৎ করেই নেই হয়ে গেলো তারা। সঙ্গী হয়ে রইলো প্রকৃতির নীরবতা, নিশুতি রাতের নিকষ কালো অন্ধকার আর অটুট গাম্ভীর্য। সেখান থেকে মাইল খানেক গেলে

বাংলাদেশি উদ্বাস্তু শিবির। এই ট্র্যাক ধরে হাঁটলেই পাওয়া যাবে, তবে দু'তিনশ গজ ডানে, জঙ্গলে ঢুকে। ডান দিক নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন হোসেন। সেখানে যখন তিনি পৌঁছলেন কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না কোথাও। বর্ষার ব্যাঙ ডাকা রাতে ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়েছে সবাই। লেফটেন্যান্ট হোসেন ডেকে ডেকে ক'জনকে তুললেন। পরিচয় দিলেন নিজের, বললেন তিনি মুক্তিযোদ্ধা। তার ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করলেন ঘুম ভাঙা লোকদের। বললেন, একা একা আলো ছাড়া আর যেতে পারছেন না।

লোকজনের চোখের চাউনিতে কেবল সন্দেহ আর অবিশ্বাস দেখলেন তরুণ যোদ্ধা। তাদের মনের কথা স্পষ্ট পড়তে পারলেন যেন তিনি। ওরা ভাবছে তিনি শত্রু পক্ষের কেউ একজন হবেন না কেন? এমন একজনকেও পেলেন না যে তাকে এগিয়ে দেবে সামান্য পথ। অগত্যা ভাগ্যকে সঙ্গী করে আবারও পথে নামলেন তিনি। সাহায্যের আশায় মাঝাখানে তার কিছুটা সময় নষ্ট হলো।

আর তখন ক্লান্ত শরীরে তার সময়টা খুবই মূল্যবান। কারণ ঐ সময় প্রতিটি মুহূর্তে তার নার্ভের উপর চাপ বাড়ছে। গভীর নীরবতা ছাড়াও এক ধরনের আতঙ্ক তখন তাকে পেয়ে বসেছে। আবার রাতের গভীর অন্ধকার আর নির্জনতাকে সঙ্গী করে তিনি ফিরে চললেন পিছনের দিকে, ফেলে আসা পথ ধরে। তবে ক্যাম্প সেখান থেকে তেমন দূরে নয়, মাত্র আধা মাইল হবে।

ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছতেই সত্যিকারের ভয় আঁকড়ে ধরলো তাঁকে। যে কোনো সময় লুকানো সেন্ট্রির হাতের নিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত হয়ে পড়তে পারেন তিনি। সবচেয়ে খারাপ ঘটনাও ঘটতে পারে, আর সে হলো মৃত্যু! রাইফেলের ব্যারেল থেকে ছুটে আসা তপ্ত সীসার কাছে শত্রু মিত্র কোনো ভেদাভেদ নেই। লেফটেন্যান্ট হোসেন বুদ্ধি করে নিজে নিজেই জোরে জোরে শব্দ করে হাঁটতে শুরু করলেন। সাথে সাথে উচ্চৈঃস্বরে সেন্ট্রিকে ডাকতে ডাকতে বললেন – এই আমি, তোমাদের ডাক্তার। সাবধান, গুলি করো না। শেষে দেখলেন একজন সেন্ট্রি একদম কাছ থেকে বলে উঠলো – আরে স্যার, আপনি কোত্থেকে! হঠাৎ মনে হলো তার বুক থেকে নেমে গেলো একরাশ গলিত পাষাণ। হালকা হালকা লাগতে থাকল তার। নিজেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মনে হতে লাগলো।

টেন্টে পৌঁছে দেখলেন লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদ বেশ আয়েশ করে বসে আছেন। বিধ্বস্ত মেডিকেল অফিসারকে দেখে তিনি অবাক! বললেন – আপনি এখন কোত্থেকে এলেন? এবার হোসেনও অবাক হয়ে বললেন – আমাকে রাস্তার মোড় থেকে নিয়ে এলেন না কেন? আসলে কোম্পানি কমান্ডার এই তরুণ যোদ্ধার কথা বেমালুম ভুলে বসে আছেন। তবে তার খেসারত দিলেন আবুল হোসেন। প্রায় সারারাতই একধরনের ভয় আর ক্লান্তিতে ছটফট করলেন তিনি। ভোর রাতের দিকে নিজের অজান্তেই ঘুমের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে হলেন ভার মুক্ত।





ভারতের সামান্য ভেতরে কলকলিয়া চা বাগানের কাছাকাছি ২ ইস্ট বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি। সে সময়টা ছিল সমুদ্রে ঝড়ো হাওয়ায় সিন্দাবাদের তরির মতো। প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝে হাল ধরে বসে আছে সিন্দাবাদ। পানিতে উত্তাল তরঙ্গ আর গভীরে ডুবো পাহাড়ে আছড়ে পড়ার ভয়। দেখা নেই তীরের, পাল ছিঁড়ে যায় যায়। আছে শুধু বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা, বাতাসের এক টানা শন শন শো শো শব্দ আর উত্তাল তরঙ্গের হৃদয় কাপানো গর্জন। সে সময় একাত্তরের সিন্দাবাদরা ধরেছে হাল, কখনো কৃষকের বেশে, কখনো টান টান করে মুখোমুখি রণাঙ্গনে। ওদের হাত নির্ভীক, চোখ স্থির শত্রুর উপর। কলকলিয়ায় অবস্থারত সিন্দাবাদরাও বসে নেই। ওরা লড়ছে ওদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী।

কলকলিয়ায় অবস্থানরত যোদ্ধাদের মেডিসিন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হতো সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে। তবে কখনো কখনো যেতে হতো বিএসএফ হেডকোয়ার্টার, আগরতলায়। সংগ্রহ হতো সেখান থেকেও। সেক্টর হেডকোয়ার্টার হোক কিংবা আগরতলা, কোনো জায়গা থেকেই পর্যাপ্ত জিনিসপত্র পাওয়া যেতো না। সেক্টর হেডকোয়ার্টারের মেডিক্যাল লজিস্টিকস দেখতেন ক্যাপ্টেন মুক্তার কামাল চৌধুরী (পরবর্তীকালে অর্থোপেডিক সার্জন হিসেবে কর্নেল পদে অবসর গ্রহণ করেন)। সাপ্লাইয়ের জন্য গেলে বলতেন – যা যা লাগে নিয়ে যাও। একদিনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে গেলেন ডেলটা কোম্পানির মেডিকেল অফিসার। দেখা হলো ইএমই'র লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনের সাথে। সেক্টর অ্যাডজুটেন্ট ছিলেন ২/লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল)। ডেলটা কোম্পানির মেডিকেল অফিসার গেলেন তার সাথে দেখা করতে। বসলেন সেখানে কিছুক্ষণ এবং সাধারণ কথাবার্তা হলো। এক ফাঁকে ইএমই'র লেফটেন্যান্ট আবুল জিজ্ঞেস করলেন লে. হোসেন কেন গেছেন সেখানে। জবাবে তিনি জানালেন মেডিসিন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেয়ার জন্য। জবাব একই এলো। যা যা লাগে নিয়ে যান।

আসলে যুদ্ধের সময় পিস টাইমের মতো হিসাব নিকাশ চলে না, করেওনি কেউ। তবে মেডিক্যাল সাপ্লাই স্ট্রীমলাইন করতে দরকার ছিল একজন মেডিক্যাল

বাংলাদেশি উদ্বাস্তু শিবির। এই ট্র্যাক ধরে হাঁটলেই পাওয়া যাবে, তবে দু'তিনশ গজ ডানে, জঙ্গলে ঢুকে। ডান দিক নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন হোসেন। সেখানে যখন তিনি পৌঁছলেন কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না কোথাও। বর্ষার ব্যাঙ ডাকা রাতে ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়েছে সবাই। লেফটেন্যান্ট হোসেন ডেকে ডেকে ক'জনকে তুললেন। পরিচয় দিলেন নিজের, বললেন তিনি মুক্তিযোদ্ধা। তার ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করলেন ঘুম ভাঙা লোকদের। বললেন, একা একা আলো ছাড়া আর যেতে পারছেন না।

লোকজনের চোখের চাউনিতে কেবল সন্দেহ আর অবিশ্বাস দেখলেন তরুণ যোদ্ধা। তাদের মনের কথা স্পষ্ট পড়তে পারলেন যেন তিনি। ওরা ভাবছে তিনি শত্রু পক্ষের কেউ একজন হবেন না কেন? এমন একজনকেও পেলেন না যে তাকে এগিয়ে দেবে সামান্য পথ। অগত্যা ভাগ্যকে সঙ্গী করে আবারও পথে নামলেন তিনি। সাহায্যের আশায় মাঝাখানে তার কিছুটা সময় নষ্ট হলো।

আর তখন ক্লান্ত শরীরে তার সময়টা খুবই মূল্যবান। কারণ ঐ সময় প্রতিটি মুহূর্তে তার নার্ভের উপর চাপ বাড়ছে। গভীর নীরবতা ছাড়াও এক ধরনের আতঙ্ক তখন তাকে পেয়ে বসেছে। আবার রাতের গভীর অন্ধকার আর নির্জনতাকে সঙ্গী করে তিনি ফিরে চললেন পিছনের দিকে, ফেলে আসা পথ ধরে। তবে ক্যাম্প সেখান থেকে তেমন দূরে নয়, মাত্র আধা মাইল হবে।

ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছতেই সত্যিকারের ভয় আঁকড়ে ধরলো তাঁকে। যে কোনো সময় লুকানো সেন্ট্রির হাতের নিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত হয়ে পড়তে পারেন তিনি। সবচেয়ে খারাপ ঘটনাও ঘটতে পারে, আর সে হলো মৃত্যু! রাইফেলের ব্যারেল থেকে ছুটে আসা তপ্ত সীসার কাছে শত্রু মিত্র কোনো ভেদাভেদ নেই। লেফটেন্যান্ট হোসেন বুদ্ধি করে নিজে নিজেই জোরে জোরে শব্দ করে হাঁটতে শুরু করলেন। সাথে সাথে উচ্চৈঃস্বরে সেন্ট্রিকে ডাকতে ডাকতে বললেন – এই আমি, তোমাদের ডাক্তার। সাবধান, গুলি করো না। শেষে দেখলেন একজন সেন্ট্রি একদম কাছ থেকে বলে উঠলো – আরে স্যার, আপনি কোত্থেকে! হঠাৎ মনে হলো তার বুক থেকে নেমে গেলো একরাশ গলিত পাষাণ। হালকা হালকা লাগতে থাকল তার। নিজেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মনে হতে লাগলো।

টেন্টে পৌঁছে দেখলেন লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদ বেশ আয়েশ করে বসে আছেন। বিধ্বস্ত মেডিকেল অফিসারকে দেখে তিনি অবাক! বললেন – আপনি এখন কোত্থেকে এলেন? এবার হোসেনও অবাক হয়ে বললেন – আমাকে রাস্তার মোড় থেকে নিয়ে এলেন না কেন? আসলে কোম্পানি কমান্ডার এই তরুণ যোদ্ধার কথা বেমালুম ভুলে বসে আছেন। তবে তার খেসারত দিলেন আবুল হোসেন। প্রায় সারারাতই একধরনের ভয় আর ক্লান্তিতে ছটফট করলেন তিনি। ভোর রাতের দিকে নিজের অজান্তেই ঘুমের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে হলেন ভার মুক্ত।





ভারতের সামান্য ভেতরে কলকলিয়া চা বাগানের কাছাকাছি ২ ইস্ট বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি। সে সময়টা ছিল সমুদ্রে ঝড়ো হাওয়ায় সিন্দাবাদের তরির মতো। প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝে হাল ধরে বসে আছে সিন্দাবাদ। পানিতে উত্তাল তরঙ্গ আর গভীরে ডুবো পাহাড়ে আছড়ে পড়ার ভয়। দেখা নেই তীরের, পাল ছিঁড়ে যায় যায়। আছে শুধু বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা, বাতাসের এক টানা শন শন শো শো শব্দ আর উত্তাল তরঙ্গের হৃদয় কাপানো গর্জন। সে সময় একাত্তরের সিন্দাবাদরা ধরেছে হাল, কখনো কৃষকের বেশে, কখনো টান টান করে মুখোমুখি রণাঙ্গনে। ওদের হাত নির্ভীক, চোখ স্থির শত্রুর উপর। কলকলিয়ায় অবস্থারত সিন্দাবাদরাও বসে নেই। ওরা লড়ছে ওদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী।

কলকলিয়ায় অবস্থানরত যোদ্ধাদের মেডিসিন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হতো সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে। তবে কখনো কখনো যেতে হতো বিএসএফ হেডকোয়ার্টার, আগরতলায়। সংগ্রহ হতো সেখান থেকেও। সেক্টর হেডকোয়ার্টার হোক কিংবা আগরতলা, কোনো জায়গা থেকেই পর্যাপ্ত জিনিসপত্র পাওয়া যেতো না। সেক্টর হেডকোয়ার্টারের মেডিক্যাল লজিস্টিকস দেখতেন ক্যাপ্টেন মুক্তার কামাল চৌধুরী (পরবর্তীকালে অর্থোপেডিক সার্জন হিসেবে কর্নেল পদে অবসর গ্রহণ করেন)। সাপ্লাইয়ের জন্য গেলে বলতেন – যা যা লাগে নিয়ে যাও। একদিনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে গেলেন ডেলটা কোম্পানির মেডিকেল অফিসার। দেখা হলো ইএমই'র লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেনের সাথে। সেক্টর অ্যাডজুটেন্ট ছিলেন ২/লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল)। ডেলটা কোম্পানির মেডিকেল অফিসার গেলেন তার সাথে দেখা করতে। বসলেন সেখানে কিছুক্ষণ এবং সাধারণ কথাবার্তা হলো। এক ফাঁকে ইএমই'র লেফটেন্যান্ট আবুল জিজ্ঞেস করলেন লে. হোসেন কেন গেছেন সেখানে। জবাবে তিনি জানালেন মেডিসিন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেয়ার জন্য। জবাব একই এলো। যা যা লাগে নিয়ে যান।

আসলে যুদ্ধের সময় পিস টাইমের মতো হিসাব নিকাশ চলে না, করেওনি কেউ। তবে মেডিক্যাল সাপ্লাই স্ট্রীমলাইন করতে দরকার ছিল একজন মেডিক্যাল

অফিসারের, কিছুটা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। হেডকোয়ার্টারে সে রকম কেউ না থাকায় এদিকটায় কিছুটা অনিয়মের ছোঁয়া লাগে।

সম্ভবত এপ্রিলের শেষ কিংবা মে'র শুরু, কোনো একটা সময় হবে। সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহ গেলেন দেখা করতে, জেনারেল ওসমানীর সাথে বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে। অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারও সেখানে আসবেন কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে। মেডিসিন কালেকশন করা দরকার। সেক্টর কমান্ডার মেডিকেল অফিসার লেফটেন্যাট হোসেনকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে আগরতলা। অফিসার মেসে নেমে তিনি মেডিকেল অফিসারকে সি ইউ (See you) বলে গট্ গট্ করে হেঁটে চলে গেলেন তাঁর জন্য নির্ধারিত ভিআইপি রুমে। ঐ দিনগুলোতে ভারতীয়রা সেক্টর কমান্ডারদের খুব সম্মান দেখাতেন। সেক্টর কমান্ডারগণই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের মূল চালিকা শক্তি।

ঐ মেসেই লেফটেন্যান্ট হোসেনের দেখা হলো মেজর শামসুল হকের সাথে (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং একসময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী)। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডিজিএমএস নিযুক্তি পান। তখনও তাঁকে চিনতেন না লেফটেন্যান্ট হোসেন। উনি পোস্টেড ছিলেন বিআরইউ রাজশাহীতে, ছুটিতে ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সীমান্ত পার হয়ে চলে এসেছেন আগরতলায়। বিএসএফ-এর এ মেসেই ছিলেন তিনি তখন। নিজেই এসে হাত বাড়িয়ে পরিচিত হলেন। তরুণ যোদ্ধার পরিচয়ও জেনে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন – জেনারেল ওসমানীর সাথে দেখা করতে চান। এখানে এসেছেন দু'তিন দিন হলো।

একাত্তরের যোদ্ধা লে. হোসেন মেজর শামসুল হককে নিয়ে গেলেন তার সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহর কাছে। সেক্টর কমান্ডার মেজর শামসুল হকের কথা শুনলেন। পরে দেখা করিয়ে দিলেন জেনারেল ওসমানীর সাথে। তার পরের দিনের পরের দিন। কনফারেন্স শেষ করে ফেরার পথে জেনারেল ওসমানী তাঁকে কলকাতায় বাংলাদেশ এক্সাইল গর্ভমেন্টের (Bangladesh Exile Government) সদর দপ্তর অর্থাৎ ৮ থিয়েটার রোডে নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত। আরো ঠিকভাবে বললে বিজয়ের পরেও তাঁকে সেখানে আরো কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। সবকিছু গোছগাছ করে ফেরার জন্য কিছুটা সময়ের দরকার ছিল তখন। সম্ভবত তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ফেরত আসেন।

হ্যাঁ, তবে তিনি জয়েন করার পরে মেডিক্যাল সরবরাহ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হলো। যেখানে যে জিনিসটা দরকার সঠিক সময়ে পৌঁছে যেতে থাকলো। আসলে এতো ব্যাপক বিদেশি সাহায্যে এসেছে যে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং যন্ত্রপাতির কোনো অভাব ছিল না। অভাব কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনার।

আমার মনে একটা প্রশ্ন তাড়া করছিল। জানতে চাইলাম – How well our commanders were looked after by the Indians at the time of liberation



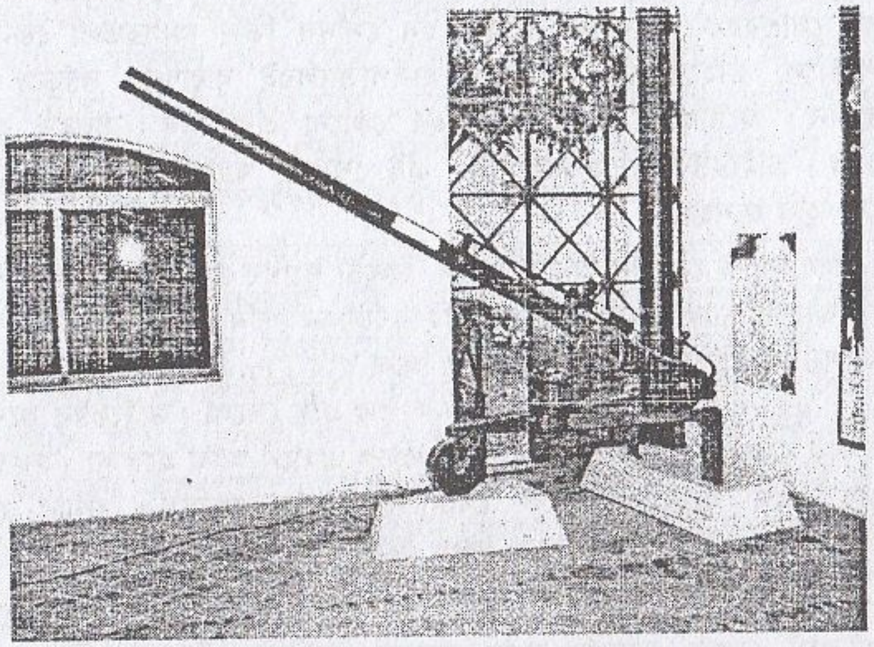
war? সাধারণ মানুষের জন্য তাদের ঐ সময়ের অসাধারণ আতিথেয়তার কথাও ভুলিনি। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দিয়েছে সে সময়। এতে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উপর প্রভাব পড়েছিল বেশ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের চাপ। কারণ শরণার্থীদের নিম্নমানের থাকার জায়গা এবং খাবারের কারণে তাদের রোগ-শোকও কম হয়নি তখন।

একাত্তরের তরুণযোদ্ধা একটা উদাহরণ দিলেন। যেদিন K-Force কমান্ডার খালেদ মোশররফ অ্যাকশনে আহত হন সেদিন তিনি আগরতলা জেনারেল হাসপাতালে, ডাইরেক্টরের সাথে ঐ হাসপাতালেরই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহের কোনো এক দিন। সম্ভবত ২২শে অক্টোবর। ডাইরেক্টর তাকে বললেন– এই শোনো, খালেদ মোশররফ আহত হয়েছে, তুমি শুনেছ?

লেফটেন্যান্ট হোসেন অবাক হলেন, কিছুটা দুঃখিতও। ঐ সময় ক্যাম্পে না থাকার কারণে সকল কমুনিকেশনের বাইরে ছিলেন তিনি। ডাইরেক্টর বললেন – কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে এ হাসপাতালে আনা হবে। Probably he will require surgical intervention. প্রায় ঘণ্টা খানেক পার হয়ে গেলো। ডাইরেক্টর কয়েকটা টেলিফোন করলেন। পরে বললেন – না তাঁকে এখানে আনা হবে না। হয়ত বড় রকমের যখম হয়েছে। তাঁকে গৌহাটিতে নেয়া হয়েছে। ওখান থেকে হেলিকাপ্টারে নেয়া হবে শিলং এবং শিলং থেকে প্লেনে করে সরাসরি দিল্লি।

এরপর ক্যাম্পে ফিরে এলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। ক্যাম্প কমান্ডার লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদ তখন ক্যাম্পে উপস্থিত। ইতোমধ্যেই ক্যাম্পের সবার মাঝে খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে। বরং আবুল হোসেনের চেয়েও খানিকটা বেশি জানে তারা। পরে জানা গেলো বিস্তারিত। ক্যাপ্টেন আয়েন উদ্দিন (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) লেফটেন্যান্ট কর্নেল খালেদ মোশররফের ২নং সেক্টরের মনতলি সাব-সেক্টরের কমান্ডার। মনতলা সাব-সেক্টর কসবা, গঙ্গাসাগর এবং আখাউড়া নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে ক্যাপ্টেন আয়েন উদ্দিন কসবা দখলের জন্য হানাদারদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে আক্রমণ রচনা করেন। আক্রমণের শুরুটা হয় চন্দ্রাপুরে। It was a dawn attack. কমান্ডার খালেদ মোশাররফ যখন স্পটে আসেন তখন ভোর আটটা। সেক্টর কমান্ডার ব্যস্ততার কারণে প্রায়ই সময় ঠিক রাখতে পারতেন না এবং অবশ্যম্ভাবী দেরি করতেন প্রায় সব ক্ষেত্রে। জুনিয়র অফিসারবৃন্দ জোক করে তার নিক নেইম দেয় KMT অর্থাৎ খালেদ মোশাররফ টাইম। প্রচণ্ড গোলাগুলির সময় হঠাৎ করে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি গোলার স্প্লিন্টারে খালেদ মোশাররফ মাথায় আঘাত পান। আঘাতটা ছিল মারাত্মক। তারপরও তিনি নিজেই আঘাতের স্থান চেপে ধরে হেঁটে উঠেন গাড়িতে। শোনা যায় গাড়িতে ওঠার আগে ক্যাপ্টেন আয়েন উদ্দিনের সাথে সামান্য রসিকতাও করেন। দেরি না করে তাঁকে প্রপার ট্রিটমেন্টের জন্য ইভাকুয়েট (Evacuate) করা হয় দিল্লিতে।

ভারত সে দুঃসময়ে আমাদের কতোটা খেয়াল রাখতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ এটা যে, মুক্তিযোদ্ধার ভাষায় – Before Khaled Mosharaf reached Delhi, Professor Jumma Kahn, a very reputed neurosurgeon of India was flown from Bombay to Delhi. শুধু আমাদের এ সেক্টর কমান্ডারকে দেখার জন্য। যদিও এর পরবর্তীতে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জার্মানীতে পাঠানো হয়।



মহান মুক্তিযুদ্ধে শত্রুকে দিশেহারা করতে
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ১০৬ মিমি রিকয়েললেস রাইফেল

সেদিনের তরুণ যোদ্ধা লেফটেন্যান্ট হোসেনের বিবেচনায় ২নং সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এক অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং মনোবলের সামরিক অফিসার ছিলেন। দিল্লির হাসপাতালে যখন তাঁর দীর্ঘ সময়ের অপারেশন হয় তখন ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। খালেদ মোশাররফের জ্ঞান ফিরলে ক্যাপ্টেন আমিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন - Did it pain? খালেদ জবাবে বললেন – You are asking a mother who has just given birth to a child.

লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদের নেতৃত্বে ৪ ইস্ট বেঙ্গলের ডেলটা কোম্পানি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর যে সব চোরাগোপ্তা আক্রমণ করেছে তাতে কোম্পানির মারাত্মক কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বরং বলতে গেলে ওরা রাতের আঁধারে কিংবা দিনের আলোয় মিশন কমপ্লিট করে চলে আসতো সহজেই। না এ কোম্পানির কোনো বড়ো ধরনের ক্যাজুয়ালটি, না হাতে কোনো পিওডব্লিউ (POW)। তবে হ্যাঁ, একবার হেলাল মোর্শেদ বেকায়দায় পড়েছিলেন।



দিনক্ষণ মনে নেই। It could be a company attack on the Pakistani occupation Army. ফেরা যাক প্রসংগে লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদের সাথে ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়াও (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) ছিলেন। জেনারেল এরিয়া হরষপুরেরই কোনো একটা টার্গেট। রাতের আঁধারে এদের নেতৃত্বে এগিয়ে গেলো এ দেশের মুক্তিপাগল যোদ্ধারা। শেষ রাতের দিকে শত্রুর বুকে ছোবল হানলো ওরা হানাদারদের ছিন্নভিন্ন করে দিতে। আক্রমণ যখন পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলেছে, কোনো না কোনো কারণে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া এবং লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। খুব ভোরে দেখা গেলো ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া সদলবলে বেসে ফিরে আসছেন, কলকলিয়া টি এস্টেটের কাছাকাছি, ডেলটা কোম্পানির ঠিকানায়। ঝলমলে সূর্য উঁকি দিল পূর্বের আকাশে এবং বেলা বাড়লো। কিন্তু হেলাল মোর্শেদের কোনো দেখা নেই। সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহ আসলেন। 'এস'-ফোর্স কমান্ডার দুশ্চিন্তাগ্রস্তই হলেন না বরং বলা যায় তিনি চরমভাবে উদ্বিগ্ন। প্রকৃতপক্ষে কমান্ডার হিসেবে তিনি প্রত্যেক অফিসার ও সৈনিকের জন্য গভীরভাবে অনুভব করতেন। তরুণ যোদ্ধা আবুল হোসেন এস-ফোর্স কমান্ডার এবং ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার আলোচনাকালে সে অনুভূতি অনুভব করলেন। কিন্তু ঐ মুহূর্তে হেলাল মোর্শেদ এবং তাঁর বাহিনীর ভাগ্য এবং অবস্থান সম্পর্কে ওরা কেউ নিশ্চিত হতে পারেন নি।

তবে আল্লাহ্ শেষ রক্ষা করলেন। হেলাল মোর্শেদ তাঁর বাহিনী নিয়ে বেলা দশটা কি এগারোটার দিকে ফিরে এলেন। দিনের অত্যুজ্জ্বল আলোয় দেখা গেলো তাদের, নির্ভীক। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত কিছু তরুণমুখ, যাদের বুকে অসীম সাহস, ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হৃদয়, ওরা দেশের মাটির জন্য লালন করেন গভীর মমতা।

না! কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ওরা সবাই ফিরে এসেছে নিরাপদে। সেক্টর কমান্ডারসহ সবার উদ্বিগ্ন মুখে হাসি ফুটলো। শত্রুকে ঘায়েল করে ফিরে আসা জোয়ানদের ইস্পাত কঠিন মুখেও অমলিন হাসি। এরাই প্রয়োজনে হাসতে হাসতে শত্রুর বুকে তপ্ত সীসা ঢুকিয়ে দিতে পারে, না দেখলে বুঝাই যায় না।



লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন জানালেন তাদের এলাকায় নভেম্বরের পূর্বপর্যন্ত আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অপারেশন হয়নি। তার জানা নেই তবে নভেম্বর-ডিসেম্বরের সন্ধিক্ষণে আখাউড়া আক্রমণের কথা তিনি কখনো ভুলবেন না। সেদিনটা তার স্মৃতিতে এখনো অমলিন। ২৮ কিংবা ২৯ নভেম্বর। ব্যাটালিয়ন একটা বড়ো রাস্তার মোড়ের কাছে গ্রিড রেফারেন্স দিলো তাকে। জায়গাটা আগরতলার মধ্যেই। আদেশ পেলেন সেখানে আরএপি (রেজিমেন্টাল এইড পোস্ট) লাগাতে হবে। উদ্দেশ্য যুদ্ধরত ব্যাটালিয়নের ক্যাজুয়ালটির চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরবর্তী ধাপে প্রেরণ। তিনি লোকেশন দেখে বললেন – স্যার, জায়গাটা প্রোমিনেন্ট, easily identifiable by enemy. কমান্ডিং অফিসার তাকে বললেন – অসুবিধা নেই। এখানেই আরএপি লাগাও।

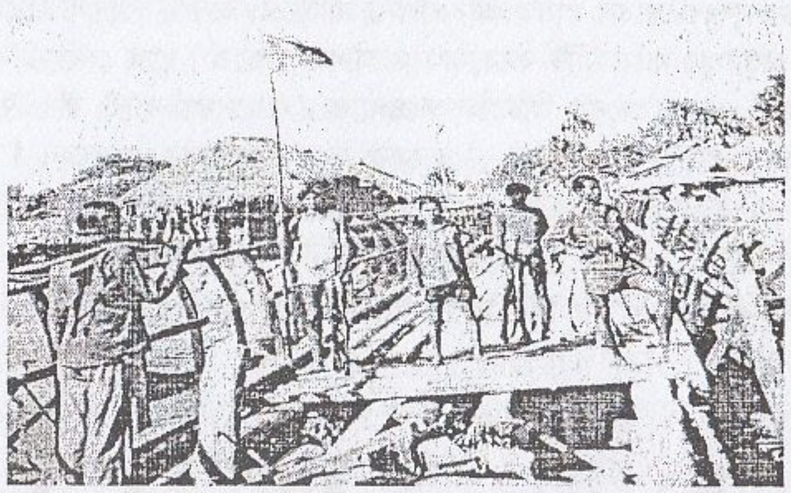
খোদাই শুরু হলো। মেডিকেল ইলিমেন্টের তিন কি চার জন লোক হাত লাগালো উৎসাহের সাথে। এবার শুরু হবে আক্রমণ, অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে। যেহেতু আরএপি'র পুরো খোদাই এতো স্বল্প সংখ্যক প্যারামেডিক দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভব নয় তাই সাহায্যে এগিয়ে এলেন ক'জন পদাতিক সৈনিক। তৈরি হয়ে গেলো আরএপি (RAP) গাছ-পালার আড়ালে, বাগানের ছায়া অরণ্যে। উপর থেকে শত্রু বিমান ওদের সনাক্ত করতে পারবে না, এটা স্পষ্ট হলো। সম্মুখ সমরে ২ ইস্ট বেঙ্গলকে চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার জন্য তখন লেফটেন্যান্ট হোসেনের নেতৃত্বে চিকিৎসা দলটি পুরোপুরি প্রস্তুত।

এখানে বলে রাখা ভালো যে শুধু আখাউড়া নয় বাংলার প্রতিটি এলাকাতেই তখন চলছে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ। এবার হানাদার নিধনের আগে আর থামাথামি নেই।

নিয়মানুযায়ী আরএপি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে লাগাবার কথা। আসলে যুদ্ধে থাম্ব রুল বলে কোনো কথা নেই। অবস্থার নিরিখে ব্যবস্থা। Arragement of quick change of location is kept in hand. ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার আরএপি থেকে প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে। এ লোকেশন থেকে আখাউড়া রেল স্টেশন মাইল খানিক দূর তো হবেই, অবশ্যই

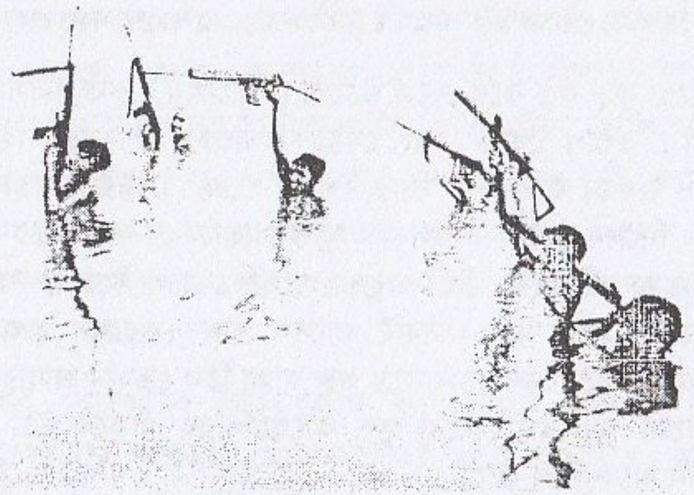


ক্রস কান্ট্রি। আরো বেশিও হতে পারে। আরএপি এবং সেক্টর হেডকোয়ার্টারের যোগাযোগের জন্য একটা ফিল্ড টেলিফোন লাগানো হলো। জরুরি অবস্থায় সহজেই ফাইটিং ফোর্সের সাথেও চিকিৎসা দলটির যাতে যোগাযোগ হয় সে ব্যবস্থা হয়ে গেলো।



সাতক্ষীরা আক্রমণের পর স্বাধীন দেশের পতাকা উড়িয়েছে আমাদের সাহসী যোদ্ধারা

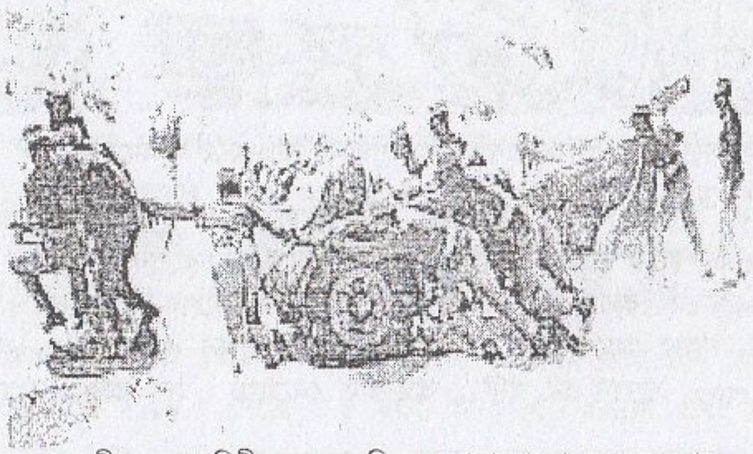
সন্ধ্যার দিকে মেজর মতিউর সদলবলে তাঁর পুরো কোম্পানি নিয়ে আরএপি'র অবস্থানে ঢুকলেন। লে. হোসেন জিজ্ঞেস করলেন স্যার, কি ব্যাপার ? আপনারা এখানে কেন? জবাবে মেজর মতিউর জানালেন, ভয় নেই। ফরওয়ার্ড লোকেশনে যাবার আগে এটা আমাদের কনসেনট্রেশন এরিয়া (Concentration Area). Better, চলেন চা খাই। অন্ধকার নেমেছে। সূর্য অস্ত গেছে কিছুক্ষণ হলো।



যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতা – এগিয়ে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ

তখনও লালের ছোপ লেগে রয়েছে পশ্চিমাকাশে। যোদ্ধারা সবাই রিলাক্সড মুডে। আসলে চা খাবার মতোই সময়। তাই চা দেবার হুকুম দিলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। ব্যাটম্যান চা পরিবেশন করলো। চায়ের কাপে সবে মুখ দিয়েছে ওরা

অমনি যমদূতের মতো উড়ে এলো শেল। ফাটলো মাটি কাঁপিয়ে বোম। লেফটেন্যান্ট হোসেন দৌড়ে আরএপি'র ট্রেঞ্চে নামলেন। মেজর মতিউর কোথায় গেলেন ঠাওর করা গেলো না। তবে তাঁর কোম্পানি অফিসার লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামানও হোসেনের সাথে সাথে ঢুকলেন একই ট্রেঞ্চে। পর পর পাঁচ কি ছ'টা উড়ন্ত শেল ছোবল মারল আরএপি'র মাটিতে। একটা পড়লো ট্রেঞ্চের ঠিক মার্জিনে। ঝুরঝুর করে মাটি ঝরে নামতে থাকলো গর্তে। যুদ্ধে শেলের অভিজ্ঞতা প্রথম বলে ওরা দু'জনেই সিটকে আছেন ভয়ে ! লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামানের মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে আছে। হোসেন তার মুখ আর দেখবেন কি করে! কোম্পানির অন্যান্য জোয়ানরাও যে যার মতো করে আশ্রয় নিয়েছে সম্ভাব্য নিরাপদ জায়গায়। সবাই ট্রেঞ্চে ঢুকতে পারেনি। পারা সম্ভবও নয়। এতোগুলো মুক্তিযোদ্ধাকে ওরা আশাও করেনি আরএপিতে, তাই ট্রেঞ্চের সংখ্যাও অপ্রতুল।



ভারতীয় সেনাবাহিনী অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাড়ালো তাদের সবল বাহু

এরই মধ্যে কড় কড় করে বেজে উঠলো টেলিফোন। দ্রুত রিসিভার তুললেন লে. হোসেন। ওপাশ থেকে স্বয়ং সেক্টর কমান্ডার জানতে চাইলেন ওদের অবস্থা। তিনি জবাবে বললেন – স্যার, শেলিং হচ্ছে। সেক্টর কমান্ডার শফিউল্লাহ তখন নির্দেশ দিলেন দ্রুত। বললেন – মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ হতে যেন কোনো ফায়ার ওপেন না করা হয়। লে. আবুল হোসেন কোম্পানিকে সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশ জানালেন সঙ্গে সঙ্গে। সবাই আদেশ পালন করলেন অক্ষরে অক্ষরে। পাকিস্তানিদের শেলিং যেমন হঠাৎ করে শুরু হলো ঠিক তেমনি আবার হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেলো। এ যেন কোনো ক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরির আঁতকে উঠা এবং আবার দীর্ঘ নিদ্রায় নিজেকে সঁপে দেয়া।

সম্ভবত হানাদারেরা আক্রমণের কোনো জবাব না পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারপর বন্ধ করে দেয় শেলিং। তা না হলে সেদিন যেভাবে পিন পয়েন্ট শেলিং শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত থাকলে বলা যায় না, মুক্তি পাগল যোদ্ধাদের দুর্ভোগ আর ক্ষয়ক্ষতি বাড়তে পারতো অনেক!



শেলিং থামতে ওরা সবাই একে একে বের হয়ে এলো ট্রেঞ্চ ছেড়ে। প্রথমেই কাছাকাছি দাঁড়ানো সেন্ট্রিকে খুঁজলেন। তিনি ডাকলেন নাম ধরে কিন্তু কোনো জবাব এলো না। এ রকমটা হবার কথা নয়। তার উপর ততক্ষণে জেঁকে বসেছে অন্ধকার। যখন তাকে পাওয়া গেলো সে এক করুণ দৃশ্য। বেচারা কলাগাছের মধ্যে হাত পা ছড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে মাটিতে। কে আর জবাব দেবে ! ওর মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রক্ত। এ যুদ্ধে লেফটেন্যান্ট হোসেনের চোখে দেখা প্রথম শহীদ!

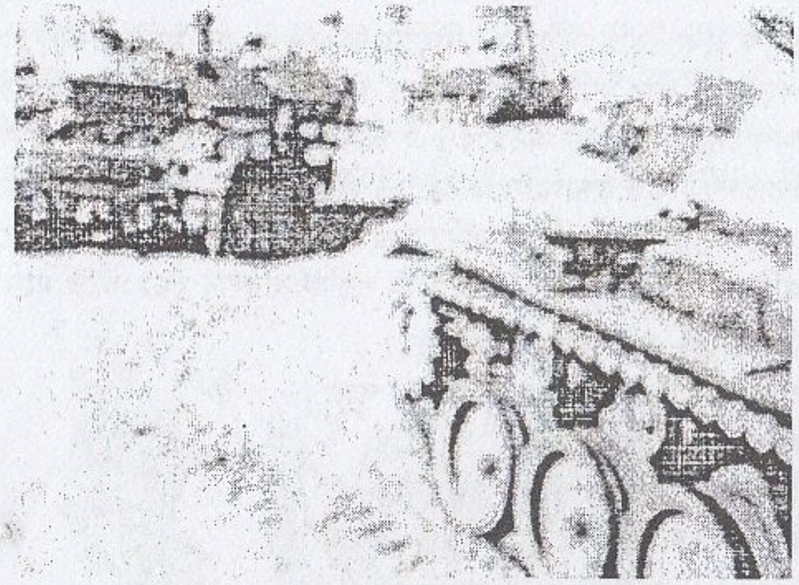
মুক্তিযুদ্ধ এবং যোদ্ধাদের কথা লিখতে লিখতে বুকের মধ্যে একটা চাপা ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো। তার সাথে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালো এক অচেনা অহঙ্কার। ধীরে ধীরে প্রকাশ পেলো পরিপূর্ণ অবয়বে। এ আমার বাংলাদেশ। সবুজ শ্যামল ছায়ায় ঢাকা বাংলাদেশ। যার জন্য হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছে ওরা চেনা এবং অচেনা অনেকে। উপহার দিয়ে গেছে স্বাধীনতার রৌদ্রস্নাত ভোর। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। সুকান্তের কবিতার ক'টি পঙ্‌ক্তি বারবার ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে:

আমি সৈনিক, হাঁটি যুগ থেকে যুগান্তে
প্রভাতি আলোয়, অনেক ক্লান্ত দিনের পরে।
অজ্ঞাত এক প্রাণের ঝড়ে।
আমি সৈনিক, দাসত্ব কাঁধে যুদ্ধে যেতে
দেখেছি প্রাণের উচ্ছ্বাস দূরে ধানের ক্ষেতে

একাত্তরের শহীদদের জন্য আমার ভালবাসা রৌদ্রস্নাত ভোরের তারুণ্যে ভরা। আঁচলের নিচে মুখ লুকানো শিশুর প্রতি মায়ের মমতার মতো। ওদের জন্য ব্যথা আর ভালোবাসা নিয়ে ধীরে ধীরে ফিরলাম বাস্তবে। জানলাম আরো ক'জন আহতকে পেলেন ডেলটা কোম্পানির মেডিকেল অফিসার। সাথে সাথে লেগে পড়লেন কাজে। আহতদের কাউকে কাউকে আরো উন্নত চিকিৎসা দেয়া দরকার। তিনি অনুমতি চাইলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। ভালো মনে নেই তবে তার মনে হয় সেক্টর কমান্ডার অথবা অধিনায়ক মেজর মঈন অনুমতি দিলেন তাকে। কাজেই দেরি না করে রোগী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। পরবর্তী গন্তব্য ছিল অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশন (এডিএস)।

ডেলটা কোম্পানির চিকিৎসককে বলা হয়েছে এডিএস লেগেছে একটা কলেজ কম্পাউন্ডে, আরএপি থেকে ভারতের আরো অভ্যন্তরে। রাতের অন্ধাকারে ঠিক ঠিকই কলেজ আইডেন্টিফাই করতে পারলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। পেলেন মাঠও। কিন্তু এডিএস আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। এমন সময় ভারতীয় আর্মি তাকে থামালো আহত যোদ্ধাসহ। জানতে চাইলো ওরা কারা এবং কি দরকার ? পরিচয় দিতে তারাই এডিএস এর পথ দেখিয়ে দিলো।

এডিএস এ ঢোকার পরে বোঝা গেলো এতোক্ষণ ওটার মাথার উপরেই বিচরণ করেছে ওরা। ক্যামোফ্লেজ এতটাই পারফেক্ট যে বুঝে সাধ্য কার। রোগীদের নামানো হলো সেখানে। ওরা দেখলেন, বেশ মজবুত করে বানানো হয়েছে এডিএস, গজারি গাছের ছাউনি দিয়ে। একটা টানেলের উভয় পাশে বেড এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা। দু'একটা শেল পড়লে এর কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে হলো না। Well fortified and well prepared. এডিএস-এ সংবাদ আগেই



একাত্তরের সুহৃদের হাত যুদ্ধের গতিকে করে ত্বরান্বিত

পৌঁছেছিল। কাজেই চিকিৎসকরা প্রস্তুতই ছিলেন। তারা দেরি না করে রোগীদের চিকিৎসায় লেগে গেলেন। লে. হোসেন আবার ফিরতি পথ ধরলেন আরএপি'র উদ্দেশ্যে।

এরই মধ্যে মেজর মতিউর রহমান এবং লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান তাঁদের কোম্পানি নিয়ে আখাউড়ার পথে চলে গেছেন, রাতের অন্ধকার আর কুয়াশার আড়ালের মধ্যে দিয়ে। তারা এখন ফাইন্যাল অ্যাসল্টের জন্য প্রস্তুত। যে কোনো সময় শুরু হবে আক্রমণ। এই আক্রমণে ২ ইস্ট বেঙ্গলের সাথে ১১ ইস্ট বেঙ্গলও যোগ দিয়েছে, অন্য এক্সিস দিয়ে। সাথে রয়েছে ভারতীয় গোলন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনীর সহায়তা।

রাতে পাকিস্তানিদের হটিয়ে দিতে শুরু হলো প্রচণ্ড আক্রমণ। হঠাৎ আখাউড়া থেকে লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জমানের টেলিফোন পেলেন লেফটেন্যান্ট হোসেন। তিনি বললেন – স্যার, মেজর মতিউরকে বলুন, শেল আমাদের ট্রেঞ্চে পড়ছে। আমাদের সৈনিকেরা অস্থির হয়ে আছে। We need a decision.

জবাবে তিনি বললেন – মেজর মতিউর রহমান আমার এখানে নেই। কোথায় আছে তাও জানি না।



আচ্ছা, বলে টেলিফোন রেখে দিল বদিউজ্জামান।

মধ্যরাত, সাড়ে বারোটা কি একটা বাজে তখন, আবার তিনি আরএপিতে টেলিফোন পেলেন বদিউজ্জামানের। তার কণ্ঠে শঙ্কা। তিনি বললেন আমি আর পারছি না। ট্রুপ্স্ পালাচ্ছে। ওর কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলো। লেফটেন্যান্ট হোসেন ভাবলেন শেলিংএ হয়ত টেলিফোন লাইন বিছিন্ন হয়ে গেছে।

শেলিং এবং ক্রস ফায়ার চললো সারারাত। ভোরের দিকে মনে হলো পাকিস্তানিরা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। রাতে আরএপিতে আর কোনো রোগী এলো না। ঊষার আলো ফুটতে না ফুটতেই মেজর মঈন আসলেন আরএপি'র লোকেশনে। হঠাৎ দেখা গেলো ক'জন ভারতীয় আর্মি অফিসারও হাজির। তারা বললো – Moin, you are supposed to be at Akhaura. What are you doing here ?

মেজর মঈন বললেন– Akhaura is not clear. কিন্তু ভারতীয় অফিসারগণ তাদের সাথে যাবার জন্য মেজর মঈনকে প্রাণিত করতে লাগলো। তখন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট হোসেনকে বললেন– না! এরা আমাকে ছাড়বে না। আমি আখাউড়া যাচ্ছি। সেক্টর কমান্ডার জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলবেন। কিছুক্ষণ পরে মেজর মঈন ফিরে এলেন আখাউড়া থেকে। জানা গেলো আখাউড়ার মুক্ত হবার খবর। এটা তখন স্বাধীন বাংলাদেশের একটা মুক্তাঞ্চল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পিছু হটে গেছে হানাদারেরা।

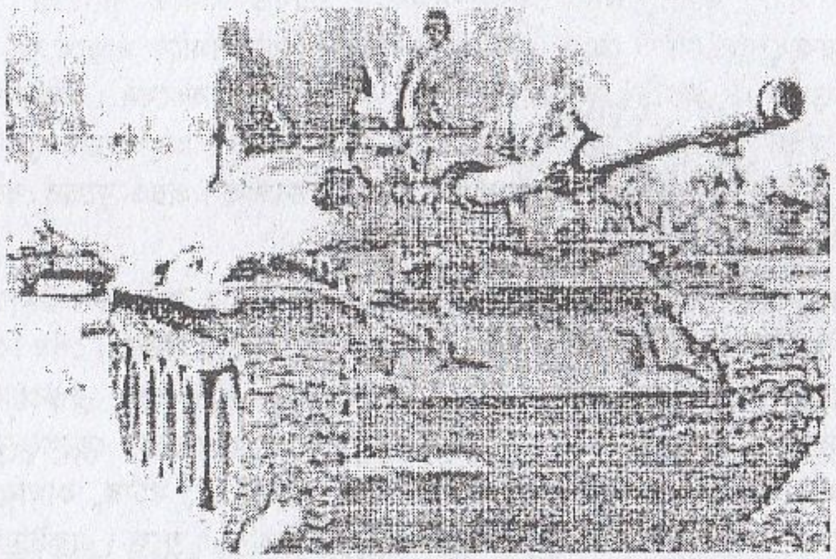
এ সুসংবাদ উল্লাস ছড়িয়ে দিল রণাঙ্গনে। আরএপি'র মেডিকেল ইলিমেন্টের সবাই উৎফুল্ল। স্বাধীনতার পথে তখন এ এক বড়ো ধরনের বিজয়। শেষ বিজয়ের পথে সাফল্যের প্রথম মাইল ফলক। আখাউড়ার যুদ্ধ জয় মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবলকে আরো চাঙা করে তুললো। এটা মুক্তিপাগল সোনার ছেলেদের জন্য এক অগ্নি পরীক্ষা। রাইফেল থেকে শুরু করে মেশিনগান, মর্টার, কামান এমন কোনো হালকা বা ভারি অস্ত্র নেই যা ব্যবহার করা হয়নি এ যুদ্ধে। একটানা ভোর পাঁচটা বা তারও কিছু বেশি সময় ধরে চলে দেশপ্রেমের পরীক্ষা। প্রচণ্ড কুয়াশা আর অন্ধকার বিদীর্ণ করে উল্কার মতো ছুটে আসা শেলকে তোয়াক্কা করেনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। লড়ে গেছে বিজয় পর্যন্ত।

Akhaura is now quiet. এটা অনেক বড়ো সংবাদ তখন। শেষে লেফটেন্যান্ট হোসেনও দেখতে গেলেন মুক্ত আখাউড়া। পথে পথে দেখলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক চলাচল ও রসদের সমাবেশ।

যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন। ইতোমধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের পঁচিশ বছর মেয়াদী এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একের প্রতিরক্ষায় অন্যের সাহায্যের শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেখানে। কাজেই ভারতের মনোবলও তুঙ্গে। তারা বেপরোয়া, যে কোনো বিপদ মোকাবিলায় প্রস্তুত। আর তাছাড়া এ শুকনো মৌসুমেই হয় এসপার নয় ওসপার। এটাই এখনকার মতো শেষ সিদ্ধান্ত।

এ সুযোগে হানাদারদের পরাজয়ের শৃঙ্খলে বাঁধতে না পারলে প্রলম্বিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ! কাজেই এখনই হানতে হবে মরণ ছোবল, সরাসরি মৃত্যুর বুকে, মৃত্যুকে রুখে দিতে। সাথে আছে ওদের আত্মোৎসর্গের অঙ্গীকার।

এর নমুনা দেখা গেলো বিজিতের বিশৃঙ্খল পিছু হটায়। হানাদারদের ট্রেঞ্চ অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। রেল লাইনের ভারি কাঠের সাব আছে না? সেগুলোর দু'স্তর দিয়ে তার উপর পুরু মাটির আস্তর। ভারতীয় অফিসারদের স্বীকার করতে হলো – যদি পাকিস্তানিরা হতোদ্যম হয়ে হটে না যেতো তা হলে তাদের পিছু হটানো বেশ কঠিন ছিল। কারণ শেল সরাসরি এই ট্রেঞ্চে পড়লেও বাংকারের কোনো ক্ষতি হতো না। আর সেই দিনগুলোয় না ছিল এ ট্রেঞ্চ উড়িয়ে দেয়ার মতো ভারি কামান, না ক্লাস্টার বোম, না টমাহক মিসাইল। নতুন নতুন অস্ত্রের আবিষ্কার যেন বিগত কয়েক দশকেই অনেক এগিয়েছে।



ভারতীয় টি - ৫৫ ট্যাঙ্ক এগিয়ে যাচ্ছে শত্রু নিধনে

উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এর গতি বেড়েছে অনেক। চারদিকে শত্রুদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র, রসদ, গোলাবারুদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একজনকে জীবিতও ধরা হয়েছে। হতাহত হয়েছে বেশ। প্রায় বিশ জনের মতো। তবে হতাহতের সংখ্যার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলো না। সংখ্যায় হয়ত আরও বেশি হবে। তবে যাবার সময় শত্রুরা সাথে করে নিয়ে গেছে তাদের সহযোদ্ধাদের। কিন্তু শহীদদের কাতারে নাম লিখিয়েছেন লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান। একটা তরতাজা প্রাণ যিনি গত রাতেও কণ্ঠে প্রত্যয় নিয়ে কথা বলেছেন পিছু হটা নয়। কণ্ঠে ছিল এগিয়ে যাবার দুরন্ত বাসনা। তার বাংকারে শেল পড়ছে। সৈনিকদের ধরে রাখতে পারছেন না তিনি। অন্ধকারে বার বার কমান্ডিং অফিসারকে খোঁজার চেষ্টা। যিনি মৃত্যুর মুখেও নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটার চিন্তা করেন নি। তোমাকে সালাম



বদিউজ্জামান। লেফটেন্যান্ট হোসেন যুগপৎ বিস্মিত ও মর্মাহত হলেন যখন লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামানের মৃতদেহ দেখলেন। নির্দয় শেল আঘাত হেনেছে তাঁর মাথায়। নির্বাক, ভাবলেশহীন হয়ে শুয়ে আছে বদিউজ্জামান। অথচ গত সন্ধ্যায়ও তিনি ছিলেন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, রণাঙ্গনে যেতে স্বতঃস্ফূর্ত। দেশের জন্য লড়াইয়ে প্রবল উৎসাহ। যখন পাকিস্তানি শেল ছোবল হানলো আরএপিতে তখন লেফটেন্যান্ট হোসেনের সাথে একই ট্রেঞ্চে ঢুকেছিলেন তিনি। আখাউড়ায় প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে অটল ছিলেন নিজের পজিশনে। ওর শেষ কথাগুলো শুধু লেফটেন্যান্ট হোসেনকে নয়, ছুঁয়ে যায় স্বাধীনতা পাগল সব বাঙালি মনকে : আমি আর পারছি না, ট্রুপস্ পালাচ্ছে !

কি অসম সাহস! কি আত্মত্যাগ! স্মৃতি জ্যান্ত হয়ে পাখা মেললো আকাশের অন্তহীন সীমানায়। আর একবার আমাদের বীরত্বগাথা রোমন্থন করবো। নয় কেন? আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের The charge of the Light Brigade-এর কথা মনে হলো।

All in the valley of Death!
Rode the Six Hundred!

কোম্পানি অফিসার লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জমান ডিসেম্বরের তীব্র শীত আর কুয়াশায় তাঁর দল নিয়ে পালন করে চলেছেন তার দায়িত্ব। সম্মুখে শত্রু। শেল এসে পড়ছে টেঞ্চে। কিন্তু তার স্থানে অবিচল তিনি।

Their's not to make reply
Their's not to reason why
Their's but to do and die
Into the valley of death
Rode the Six hundred.

আমি চোখ খুলেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জমান নির্ভীক, ফুটন্ত শেলের মাঝে বসে অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন মাতৃভূমির জন্য। সামলে রেখেছেন নিজের বাহিনীকে। খুঁজছেন কোম্পানি কমান্ডারকে তাঁর পরবর্তী নির্দেশের জন্য। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম .....

Canon to right of them
Canon to left of them
Canon in front of them
Valleyed and hundred
Stromed at with shot and shell

বিরতিহীন পাকিস্তানি গোলাবর্ষণের মাঝে আমাদের অকুতোভয় সৈনিক, আমাদের বদিউজ্জামানরা। বীরত্বের অমর গাথার মতো শির উঁচিয়ে বসে আছেন

তরুণ লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান, সামনেই মৃত্যুর খাঁচা। কিন্তু মরণে ডরে না বীর। ওরা ক্ষণজন্মা, ওরা কাল জয়ী, মৃত্যুর চোয়ালের মাঝে বসে পড়ে চলেছে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।

Into the jaws of death
Into the mouth of hell
Rode the Six hundred.

তোমার মতো সোনার ছেলেদের জন্যই আমরা সসম্মানে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো, বদিউজ্জামান। তোমাদের নিয়ে গড়ে উঠবে বীরত্ব গাথা, বাউলের মুখে মুখে ফিরবে বাউল সঙ্গীত। তোমরা যারা ছিলে নিবেদিত। দেশের জন্য দিয়ে গেছো প্রাণ। আমাদের সম্মান আর ভালোবাসায় তোমরা অভিষিক্ত হয়ে থেকো চিরকাল। সুকান্ত তাই হয়ত অনায়াসে বাংলার এই ক্ষণজন্মা ছেলেদের কথা মনে করেই বলে গেছেন :

বন্ধু। তোমরা ছাড় উদ্বেগ সুতীক্ষ্ম কর চিত্ত
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুবৃত্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২ এবং ১১ ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণ পুরো ফ্লাঙ্ক জুড়ে চলে ১ - ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পাকিস্তান একতরফা ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করায় মিত্রবাহিনী ৪ ডিসেম্বর সহজেই ঢুকে পড়ে বাংলাদেশে, মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আখাউড়া এলাকায় এস-ফোর্সের সঙ্গে যোগ দেয় মিত্রবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন। শেষে ৫ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনী পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয় সেখানে। কিন্তু এ ফ্রন্টে যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ দিন ছিল ৩ ডিসেম্বর যেদিন শহীদ হলেন বদিউজ্জামান। ওর সাথে শহীদদের কাতারে শামিল হয়ে গেলো নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খান, সিপাহী আমির হোসেন, সিপাহী রুহুল আমিন, সিপাহী সাহাবুদ্দিন এবং সিপাহী মুস্তাফিজুর রহমান। (সূত্রঃ বাংলাদেশ অ্যাট ওয়ার। পৃ. ২০৫।)

হানাদার বাহিনী আখাউড়া থেকে পিছু হটে গেছে। আমাদের জয় আর হানাদারদের পরাজয়ের চিহ্ন আখাউড়ার সর্বত্র। সেক্টরে প্রথম বড় ধরনের বিজয়। যদিও আমাদের স্বাধীনতার সূচিত হয়েছে এর ঘোষণার দিন থেকেই। এখন শুধু আক্ষরিক অর্থে পাকিস্তানিদের হত্যা কিংবা বন্দি করে বাংলাদেশের মাটিকে অভিশাপ মুক্ত করা। আর তাই এই আত্মত্যাগ! বিজয়কে আলিঙ্গনের উষ্ণিল কামনায় অবলীলায় আত্মাহুতি !





মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলির কথা অম্লান হয়ে থাকবে চিরদিন আমাদের অস্তিত্বে, ভাবনায়। এ ইতিহাস একদিন অনাগত প্রজন্ম জানবে, বুঝতে শিখবে নিজেদের অস্তিত্বের বুনিয়াদ, গড়ে উঠবে এক একজন দেশ প্রেমিক হয়ে। কাজেই জানিয়ে যেতে হবে আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস।

কাজেই আবারও শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি হতে ফেলে আসা মুক্তার অন্বেষণ। শুরু হলো স্মৃতিচারণ, এক অনন্য স্মৃতি, যা প্রত্যেক বাঙালি ও বাংলাদেশের হৃদয়কে আন্দোলিত করে প্রতিনিয়ত, গর্বিত করে মহান ত্যাগের মহিমায় আর উদ্বুদ্ধ করে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার অদম্য বাসনায়।

আখাউড়া জয়ের পরে ব্যাটালিয়ন পুনঃসংগঠিত হতে শুরু করলো। আরএপি বন্ধ করে দিয়ে চিকিৎসা দলকে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হলো। আসলে হেডকোয়ার্টার মানে রিয়ার এলিমেন্ট। পুরো ব্যাটালিয়ন মেইন রুট এড়িয়ে সামান্য ডান দিক দিয়ে চান্দুরার উদ্দেশ্যে রওনা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঐ দিনই বিকালে, হয়ত তিনটা কিংবা সাড়ে তিনটার মতো হবে, ক্যাপ্টেন আজিজ এসে হাজির। তাঁর সাথে আরো কিছু লোকজন। ক্যাম্পে তখন ডেলটা কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন না। তাঁকে দেখে খুব বিমর্ষ মনে হলো। তিনি লেফটেন্যান্ট হোসেনকে বললেন – একটা খারাপ খবর আছে। চলেন, এক জায়গায় যেতে হবে। সঙ্গে ফার্স্ট এইড নিয়ে নিন।

স্বাভাবিক কারণেই লেফটেন্যান্ট হোসেন জিজ্ঞেস করলেন – কোথায় ?

উনি বললেন – চলেন, চলেন। আমাদের দু'একজন আহত হয়েছে। সাথে মেজর নাসিমও আছেন।

ক্যাপ্টেন আজিজের সাথে জিপে উঠে বসলেন লে. হোসেন। ক্যাপ্টেন আজিজ তাকে এমন জায়গায় নিয়ে এলেন যেখানে দু'টো কাঁচা রাস্তা এসে ক্রস করেছে। ওরা নামলেন গাড়ি থেকে সেখানে। অপেক্ষার পালা শুরু হলো। ক্যাপ্টেন আজিজ পায়চারি করছেন। তাঁর মধ্যে অস্থিরতা স্পষ্ট। হোসেন জানতে চাইলেন – Sir, where is Lt Moin ?

আসলে লেফটেন্যান্ট মঈনের সাথে ঘনিষ্ঠতা কলেজ জীবন থেকে লেফটেন্যান্ট হোসেনের। মেডিক্যাল কলেজে তিনি পড়ার পার্টনার ছিলেন।

জয়েন করেছেন ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে একত্রে। কুমিল্লায় হানিমুন লজেও ছিলেন একই রুমে। এর আগে সিলেটেও সে অল্পের জন্য পাকিস্তানিদের হাত হতে আহত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছে। কাজেই মঈনের কোম্পানি কমান্ডারকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে ওর কথাই সবার আগে মনে হলো হোসেনের। ক্যাপ্টেন আজিজ বললেন – দু'তিনজন ভারতীয় অফিসারও মারা গেছে। Moin is traceless !

মন খারাপ হয়ে গেলো হোসেনের। কতটা খারাপ। তার পক্ষে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। তিনি হতবাক এবং মর্মাহত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন খোঁজ করবেন না? জবাব এলো ভাবলেশহীন- সুযোগ নেই। এ একটা মাত্র জবাবই যুদ্ধের কঠোর বাস্তবতাকে চোখের সামনে তুলে ধরলো।

এরই মধ্যে দেখা গেলো গ্রামের ক'জন লোক তক্তার উপরে শুইয়ে কাউকে নিয়ে আসছে। তখন বেলা শেষের দিকে। ডিসেম্বর মাস। খানিক পরে আকাশে ছোপ ছোপ লালের ছোঁয়া ফুটে উঠবে। সূর্য তার রঙ বদলাতে শুরু করেছে। হয়ত পাঁচটা বাজে। মেজর নাসিমকে নামানো হলো নিচে। তিনি রক্তক্ষরণের ফলে অবসন্ন এবং রেস্টলেস হয়ে আছেন। লেফটেন্যান্ট হোসেন জিজ্ঞেস করলেন – স্যার, কেমন আছেন?

জবাবে তিনি বললেন – পানি দাও, পানি।

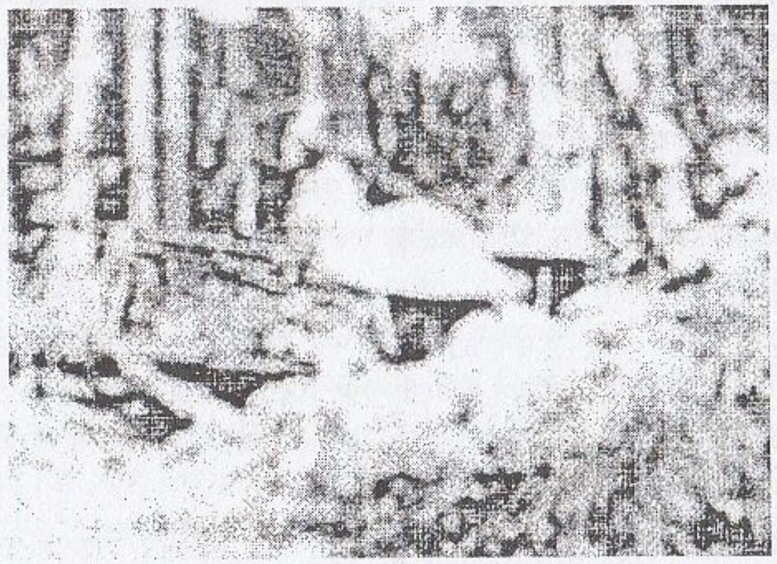
মেডিকেল অফিসার লেফটেন্যান্ট হোসেন তাকে পরীক্ষা করলেন, যতোটা সম্ভব দ্রুত। ভাইটাল অরগানগুলোর কার্যকারিতা যাচাই করলেন। তাঁর গুটিয়াল মাসেলের তিনটা লেয়ারই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। The sciatica nerve was shining. তবে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং সায়াটিকা নার্ভ ছিড়ে যায়নি। দ্রুত তাকে ইনট্রাভেনাস ফ্লুইড দেয়া দরকার এবং দেয়া হলো। মেজর নাসিম তখন সত্যিকার অর্থে চিৎকার করছেন পানির জন্য। হোসেন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, কোনো কারণে যদি ইমিডিয়েট অপারেশন লাগে তাহলে এ পানি তাঁর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তবে পানি দেয়া হলো তার মুখে, সামান্য তুলায় ভিজিয়ে। ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে স্যাম ড্রিঙ্কিং। যতদূর মনে পড়ে তাঁকে ১০০০ এমএল ফ্লুইড রানিং দিয়ে দ্রুত নিকটস্থ ভারতীয় এমডিএস এ নিয়ে গেলো ওরা। ক্যাপ্টেন আজিজও গেলেন সাথে সাথে। এমডিএসএ উপস্থিত ছিলেন মেজর নাসিমের ছোট ভাই। তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে ক্যাপ্টেন আজিজ সকলকে নিয়ে ফিরলেন আবার।

তখন অনেক রাত। তার চেয়ে বলা যেতে পারে Early morning of the following day. তিনটা কি চারটা বাজে। কোথায় সবাই মিলে রাত কাটালেন মনে করতে পারলেন না লেফটেন্যান্ট হোসেন। তবে ভোরে উঠে যখন ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে ওরা ফিরলেন দেখলেন ভোজবাজির মতো সব উধাও। কেউ কোথাও নেই। আসলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহসহ পুরো ব্যাটালিয়ন তখন মুভ করছে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকার দিকে। ব্যাটালিয়নের রিয়ার হয়ত রয়ে গেছে ভারতীয় এলাকায় পুরানো সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। লেফটেন্যান্ট হোসেন তার দু'জন প্যারামেডিকসহ যুদ্ধের এই দুর্যোগের মধ্যে প্রায় একা, প্রায় আশ্রয়হীন হয়ে পড়লেন।



কিন্তু ওরা দমবার পাত্র নয়। দায়িত্ববোধ তাদের তাড়া করছে, অগ্রসরমান ব্যাটালিয়নে পৌঁছতে হবে। এ ছোট চিকিৎসা দলটি আইসোলেটেড হলেও ঘাবড়াল না। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, যে কোনো ভাবেই হোক ব্যাটলিয়নে পৌঁছতে হবে। কাজেই চান্দুরা যাবার রাস্তা ধরলেন ওরা। আসলে চান্দুরার দিকে কোনো রাস্তা ছিল না। ডিসেম্বরের শুকনো মাঠের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলো দলটি। পথ যতটা সংক্ষিপ্ত করা যায় সে ভাবেই চললো ওরা। দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা নেই তাই গ্রামবাসীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হলো ক্ষণে ক্ষণে। তারা জানালো বিকেলের আগে চান্দুরায় পৌঁছান যাবে না। দমে গেলেও মনোবল হারালো না দলটি। পথ চলতে চলতে হঠাৎ ওরা দেখতে পেলো তক্তার উপরে গ্রামবাসীরা কাঁধে করে আহত কাউকে নিয়ে যাচ্ছে। লেফটেন্যান্ট হোসেন এগিয়ে গেলেন দেখতে। কাছে যেতেই দেখলেন তার সুহৃদ ও সহপাঠী এবং আর একজন মুক্তিযোদ্ধা, লেফটেন্যান্ট মঈন।

হোসেন কথা বললেন বন্ধুর সাথে। তার আঘাত গুরুতর নয়। পায়ে বুলেট লেগেছে বটে। তবে ততক্ষণে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। ভালোই কথা বলছেন তিনি। হোসেন জিজ্ঞেস করলেন – কি হয়েছিল বলো দেখি? জবাবে লেফটেন্যান্ট মঈন জানালেন সেক্টর কমান্ডারসহ কয়েকজন দ্রুত এগুচ্ছিল চান্দুরার দিকে। আর সবাই এগিয়ে আসছে পিছন পিছন। সাথে কয়েকজন ভারতীয় আর্মি অফিসারও ছিল। মঈনও ছিলেন এদের কাছাকাছি। হাইওয়েতে উঠে কেউ কেউ রিকসায়ও চেপে বসেছে। হঠাৎ করে সিলেটের দিক থেকে একটা দ্রুতগামী ট্রাক এগিয়ে এলো। এক নজর দেখেই সবাই বুঝলো এরা পাকিস্তানি, ভাগার প্রতিযোগিতায় খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। ট্রাক এসে দ্রুত থেমে দাঁড়াতেই পাকিস্তানিরা লাফিয়ে নামলো রাস্তায়। ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে নেমে এলো গাট্টাগোট্টা এক



একাত্তরের যোদ্ধারা তখন শত্রু নিধনে সক্রিয়

পাকিস্তানি সুবেদার। সেক্টর কমান্ডার শফিউল্লাহর সাথে তার ঝাপটা ঝাপটি শুরু হয়ে গেলো। অন্যান্য পাকিস্তানি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গুলি বিনিময় শুরু

হয়ে গেছে ততক্ষণে। দেখতে দেখতে রণাঙ্গনে পরিণত হলো এলাকাটা। ক'জন ভারতীয় অফিসার গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহকে গুলি করার জন্য এক হানাদার সৈনিক চেষ্টা করছিল। কিন্তু হাতাহাতি লড়াইয়ের মাঝে কার গায় গুলি লেগে যায় সে দ্বিধা তাকে দেরি করিয়ে দিল। দেরি করে হলেও পাকিস্তানিটা গুলি করলো ঠিকই কিন্তু লাগলো সেটা কমান্ডারের কোমরের কাছে পিস্তলের বাটে। রক্ষা পেয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম সারির একজন। সম্ভবত ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর কথা। সেই ভাঙা বাটের পিস্তল মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

লেফটেন্যান্ট হোসেন জানালেন তার সুহৃদ মঈন সে যাত্রাও বেঁচে গেলেন। গুলি লাগতেই হামাগুড়ি দিয়ে ধান ক্ষেতে আশ্রয় নিলেন তিনি। অল্পক্ষণেই অস্ত গেলো সূর্য আর নেমে এলো অন্ধকার। আর সে অন্ধকারের আড়ালে মঈন ক্রল করে নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। একান্ত আপনজনের মতো গ্রামের লোকজন তাকে সাহায্য করেছে। ভোরের আলো ফুটতেই আবার তারাই ওকে চিকিৎসার জন্য কাঁধে করে নিয়ে চলেছে ভারতের দিকে।

কিন্তু হোসেনর নেতৃত্বে তিন জনের এ দলছাড়া চিকিৎসা দলটির মূল উদ্দেশ্য দলের সাথে মিলিত হওয়া। গ্রামবাসীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানালো কোনো পথে গেলে তারা দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। তারা ভালো করেই চেনে। খুব খুশি হলেন হোসেন এবং তার প্যারামেডিক দু'জন। এক রাশ আবেগ ওদেরকে আপ্লুত করে রাখলো গ্রামবাসীদের সহৃদয়তায়।

নাম না জানা ওরা কতো হাজার এবং লক্ষ, ছড়িয়ে আছে বাংলার সর্বত্র। সবার অজান্তে মুক্তিযুদ্ধকে করেছে গতিময়। তারাও মুক্তিযুদ্ধের এবং সাফল্যের সফল অংশীদার! খুঁজে দেখলে দেখতে পাবো, ওদের হৃদয়ে লেখা আছে মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত সার্টিফিকেট। সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়ানো ছিটানো সাধারণ ওরা, ত্যাগের মহিমায় নিজেদের উজ্জ্বল, অসাধারণ করে রেখেছে। অবলীলায় সম্পন্ন করছে অসামান্য সব কাজ। বিনিময়ে সমাজের কাছে এমনকি স্বীকৃতিটুকুও চায়নি। ওরা সাথে আছে বলেই বিজয়ের পথ বন্ধুর নয়। বাংলাদেশ পৌঁছে যাচ্ছে অভীষ্টের কাছাকাছি।

আহত মঈন এবং সাহসী গ্রামবাসীদের বিদায় দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালো ছোটো দলটি। আবার হাঁটতে শুরু করলো ওরা চান্দুরার দিকে। ওরা মাত্র তিন জন। ওরা দলছুট কিন্তু ভয় কি ওদের ! আছে না ওদের সাথে জনতার বন্ধুত্ব! ওদের সীমাহীন ভালোবাসা।

বিকাল নাগাদ দলটি পৌঁছল চান্দুরায়। নদীর কিনারে নিঃসঙ্গ এক বন্দর যেন। যুদ্ধের চাপে সেই মুহূর্তে লোকজনের ভিড় নেই তেমন একটা। এলাকাটা মোটামুটি বড়োই। ছোট বড়ো ক'টা বিল্ডিংও আছে। সামান্য কিছু লোকজন আগলে বসে আছে বিজনেস। ওখানকার লোকজন জানালো দুপুরের আগেই



আমাদের দল শাহবাজপুরের উদ্দেশ্যে চান্দুরা ছেড়ে চলে গেছে। এখন এখানে মুক্তিবাহিনীর লোক বলতে কেবল ওরা তিনজন। যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে রাজাকার কিংবা আলবদরের দল। চলে আসতে পারে পাকিস্তানি হানাদারেরা। এখানকার কাউকেই ওরা চেনে না। এক ধরনের ভয়ের ছায়া ওদের মাথার উপর ছড়িয়ে রইলো। কিন্তু কখনোই সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হলো না এ তিন যোদ্ধা।

দু'জন মাঝ বয়সী ব্যবসায়ী ওদেরকে বললেন – চলেন আমাদের গদিতে। যে অবস্থা তাতে সত্যিকারের ভরসা করতে ভয়, অপরিচিত জায়গা, লোকজনও অচেনা। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতে হবে। নিজেদের ভিতর আলাপ করলেন ওরা। লেফটেন্যান্ট হোসেন সহযোদ্ধাদের বললেন – মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকো। তবে আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকর্তা। এই রাতেই যদি আমরা শাহবাজপুরে রওয়না করি তা হলে এর চেয়েও বড় বিপদ হতে পারে। পথে পাকিস্তানি ছাড়াও ধরে বসতে পারে তাদের দোসরেরা। কাজেই একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিলেন ওরা, চান্দুরাতেই রাতটা কাটাবেন। এখানকার অচেনা জনগণের উপরই ভরসা করবেন। হেফাজতের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

যাদের আশ্রয়ে ওরা থাকলেন তারা ওদেরকে গদিতে ঢুকিয়ে দিয়েই ঝাঁপ নামিয়ে দিলো। জানালো এরই মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে তিনজন মুক্তিবাহিনী আছে চান্দুরায়। তথ্য দিলো বটে কিন্তু তা বলে চান্দুরায় অচেনা ভদ্রলোক একটুও ঘাবড়ায়নি। অতিথেয়তাও ভুললোনা। তার লোকদের খাবার বানাতে বললো যোদ্ধাদের জন্য, গদির মধ্যেই।

চা পান করার পরে ওদের ক্লান্তি কিছুটা দূর হলো। কিন্তু স্থির হতে পারলেন না ওরা। আশ্রয়দাতা ব্যবসায়ী রাতের অন্ধকারে এই দোকান থেকে ওদেরকে অন্য আর এক দোকানে নিয়ে গেলো। কোত্থেকে যেন রান্না করিয়ে এনেছে। সাথে ওরাও খেলো, পাঁচ কি ছ'জন। এতো বিপদের মধ্যেও ব্যবসায়ীরা কিন্তু যোদ্ধাদের জন্য আতিথেয়তায় পাক্কা। মুক্তিবাহিনীর প্রতি তাদের দরদ প্রতিটি কাজে। ভাতের সাথে মুরগির মাংস এবং অন্যান্য তরকারি মিলিয়ে ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক অনন্য ডিনার। সারাদিনের পায় হাঁটার পর কিছুটা শারীরিক বিশ্রাম এবং খাবার যেন অমৃতের স্বাদ বিলালো। এতো আতিথেয়তার পরেও এদের সাথে পরিচয় নেই বলে প্রতি মুহূর্তে এক ধরনের অজানা আশংকায় ভুগছে ওরা তিন জন। মনে মনে ভয় জেগে উঠছে – ওরা কি সত্যি এ তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে মৃত্যুর ফাঁদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? Are they really taking them to a killing ground? A ruthless destiny for the freedom fighters! ওরা কি স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখতে পাবে না ! দেখে যেতে পারবে না মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে! তা হলে সত্যি দুঃখ পাবে ওরা। কারণ বিজয় দেখার জন্যই এতো আত্মত্যাগ আর আয়োজন।

খাবারের পর রাতের অন্ধকারে আর একটা গোডাউনে নিয়ে গেলো তিন মুক্তিযোদ্ধাকে অচেনা সুহৃদেরা। ঘরটা একেবারে নির্জন, থাকার জন্য অপরিসর। ওরা যোদ্ধা তিনজনকে এক জায়গাতেই থাকার জন্য অনুরোধ করলো, আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে। প্রকারান্তরে তা - ই চাচ্ছিল ওরা মনে মনে, একত্রে থাকতে। মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক আশ্বাস দিয়ে বললেন – স্যার, এখানে আপনারা আছেন, আমরা দু'একজন ছাড়া আর কেউ জানবে না। তাছাড়া থাকবো আশপাশেই। কাজেই নিশ্চিত থাকেন।

একাত্তরের সেই দিনগুলি যারা দেখেনি তারা জানে না বাস্তবতা তখন কল্পনাকেও হার মানায়।

অচেনা সুহৃদরা চলে যেতে আবার একা হয়ে গেলো একাত্তরের যোদ্ধারা। গাঢ় অন্ধকার তাড়াচ্ছে সাধারণ টিমটিমে আলো। কেঁপে কেঁপে অন্ধকারকে আরো যেন গভীর করে তুলছে সেটা। ওরা তিনজনই ভোর থেকে একটানা হেঁটে চান্দুরায় পৌঁছেছে। তার উপর রাত এগারোটা পেরিয়ে গেছে। অস্ত্রের মধ্যে লেফটেন্যান্ট হোসেনের কাছে একটা পিস্তল আর বাকি দু'জনার কাছে দু'টো রাইফেল। দলনেতার কাছে বাকি দু'জন জিজ্ঞেস করলো – স্যার, পালা করে কী আমরা রাত জাগবো?

লেফটেন্যান্ট হোসেন খানিকটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলেন। ভাবলেন পারবে কিনা ওরা। আর পারলেই বা কী? যদি সত্যিকারের শত্রুর পাল্লায় পড়ে থাকে তা হলে মাত্র তিনজনে কী টিকতে পারবে শেষতক? শেষে একটা বেপরোয়া সিদ্ধান্ত দিলেন তিনি। বললেন যদি পার থাকো, তবে আল্লাহর উপর ভরসা করে শুয়ে পড়ো।

সত্যি সত্যি তিনজনই ওদের অজান্তেই ঘুমিয়ে গেলো। ঘুমের গভীর গাঢ় বন্ধনে কখন যে রাত পার হয়ে গেলো বুঝে উঠতে পারলো না কেউ। কোনো শব্দ বা শোরগোল ওদের ঘুমের নিবিড় আলিঙ্গনকে ব্যাহত করেনি। জেগে উঠলো যখন অতিথিসেবক মাঝ বয়েসী ভদ্রলোক এসে ডাক দিলেন – ওঠেন এখন আপনারা, বেশ বেলা হয়েছে।

একসময় বিছানা ছাড়লেন যোদ্ধারা একে একে তিনজন। রাতের নির্বিঘ্ন ঘুম ওদের সবার ক্লান্তি তাড়াতে সাহায্য করেছে। দলনেতা হেঁটে হেঁটে চলে এলেন নদীর পাড়ে। আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। শীতের মিঠে রোদে হঠাৎ মনে হলো আর কোনো বিপদ নেই। শীতের কোল থেকে আড়মোড়া ভাঙছে নদী। এখনও ছোপ ছোপ কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে জলের উপর। শান্ত নদীর স্রোত চান্দুরার পাশ ঘেঁষে নীরবে বয়ে চলেছে। যেন আদুরে আলসে মেয়ে মায়ের ডাকে চোখ খুলে আবার চুপচাপ পড়ে আছে বিছানায়। যেন ঘুমের কোল থেকে কোলাহলে ফিরতে চাইছে না কোনো ভাবেই। তারই মাঝে অলস গতিতে ভাসতে



ভাসতে এগিয়ে চলেছে এক ঝাঁক কচুরিপানা। মাথায় একরাশ ফুল, সাদা আর বেগুনিতে, কোনো তন্বীর ফুর ফুরে হাসির মতো। ওপারে গাঁয়ের কোনো কুলবধু কলসি হাতে নেমেছে নদীর ঘাটে। এখনি ঢেউ তুলে তুলে কলসি কাঁখে ফিরবে ঘরে। ভাতের হাড়িটা বসিয়ে ফুঁ দিয়ে উনুনে আগুন জ্বালবে। হয়ত ধোঁয়ায় একাকার হয়ে চোখ দিয়ে গড়াবে পানি। দুপুর হতেই ভাত বেড়ে অপেক্ষা করবে কর্মক্লান্ত স্বামীর ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে হাতে তুলে দেবে পানির গ্লাস। আদুরে শাসনে ভরিয়ে তুলবে সময়।

আহা ! চিরন্তন বাংলার কি এক অপরূপ। ভাবতে ভালো লাগছে। সূর্যটার সোনালি রঙ মুছতে শুরু করেছে অলস গতিতে। গায় লাগছে মিষ্টি গরম রোদের ছোঁয়া। কেউ কেউ দোকানের ঝাঁপ ফেলে দাঁতন হাতে চলেছে নদীর ঘাটে। অলস একটা কুকুর এখনও লেজ গুটিয়ে শুয়ে আছে দোকানের আড়ালে। শীতের হাত থেকে বাঁচতে ওর লোমগুলো ফুলে ফেঁপে একাকার। হঠাৎ দোকানের চালে উড়ে এসে বসলো একটা দাঁড়কাক। হর হর করে পিছলে গেলো কয়েক পা। চেঁচিয়ে উঠলো কা কা করে।

একাত্তরের বাংলাদেশে আপামর জনগণই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। হয় সরাসরি, নয়তো যোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহায়তা করে। অবশ্য দু'একটা ব্যতিক্রমও যে ছিল না তা নয়। না হলে রাজাকার, আলবদর বা আলশামস তৈরি হতো না। যুদ্ধ অপরাধী শব্দটা বার বার উচ্চারিত হতো না বিভিন্ন প্রসঙ্গে। তবে সেদিন দল ছুট তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে যে ভদ্রলোক অসাধারণ আতিথেয়তা দেখালেন তা ভুলবার নয়। একসময় হাঁটতে হাঁটতে অতিথিপরায়ণ সুহৃদ নদীর পাড়ে লেফটেন্যান্ট হোসেনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন– কাল রাতে নদী দিয়ে গেছে তারা। একাত্তরের যোদ্ধা জানতে চাইলেন– পাকিস্তান আর্মি? হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। বললেন– স্যার, ভয় ভয় আছিলাম। যদি তারা নামতো তা হলে চারদিকে খোঁজ নিতে শুরু করতো। সম্ভাব্য শত্রু শেষ না করে বিশ্রাম নিতো না তারা। যাক, আল্লাহ বাঁচাইছে।

ঝলমলে সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে উজ্জ্বল কিরণ। যেন প্রাণের পরশ লেগে আছে। যোদ্ধাদের জন্য নাস্তার আয়োজন করলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সেই সুহৃদের নামটা কিছুতেই মনে এলো না লে. হোসেনের। কম তো নয়, তিন যুগ পার হয়ে গেছে। নাস্তার পরে ওখানকার অনেকেই ওদের এমনভাবে বিদায় জানাল যেন কোনো পরম আপনজনকে কেউ অল্প সময়ের জন্য কোথাও বেড়াতে পাঠাচ্ছে। একসময় রিকসায় চড়ে বসলেন ওরা। হাত নেড়ে বিদায় জানালেন চান্দুরার অচেনা স্বজনেরা।



শাহবাজপুরের দিকে এগিয়ে চললো তিনজন যোদ্ধা। কখনো রিকসায় আবার কখনো হেঁটে। তবে তখন আর ভয় বলতে কিছু নেই ওদের। রাস্তাঘাটে লোকজন খুব কম দেখা গেলো। যুদ্ধের ভয় ছড়িয়ে আছে সবখানে। যদি রাজাকার কিংবা পাকিস্তানিদের সাথে মুক্তিযোদ্ধারা মুখোমুখি হয়, যুদ্ধ অনিবার্য। ওরা তিনজন প্রায় ফাঁকা রাস্তাতেই শাহবাজপুরের ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছলেন। ব্রিজের ওপারেই দেখা গেলো কিছু ভারতীয় সেনাদলের চলাচল। মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো দলছুট যোদ্ধাদের। ওরা আন্দাজ করলো এখানে ওদের ব্যাটালিয়ন না থাকলেও তাদের খোঁজ পাবে নির্ঘাৎ। কিন্তু আসলে খোঁজ নিতে হলো না। ব্রিজ পার হতেই দেখা গেলো পুরো ব্যাটালিয়নই সেখানে উপস্থিত।

ভার মুক্ত হলো ওরা। দলনেতা দেখা করলেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর মঈন এবং এস-ফোর্স কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহর সাথে। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন ওরা। যাক এখন আর একা নয়, সাথে আছে যোদ্ধাদের বিশাল দল। সাথের প্যারামেডিক দু'জনও অন্যান্য সৈনিকদের সাথে যোগ দিল। সেক্টর কমান্ডারকে লেফটেন্যান্ট হোসেন বললেন – স্যার, আমরা এসে গেছি। পথে পথে যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাও তাকে অবহিত করলেন।

তবে তিনি তাদের বিশাল অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগের ভিতর সময় কাটানোর কথা বললেন না কমান্ডারের কাছে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে ব্যাটালিয়ন মুভ করছিল দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। তা শুধু ওদের তিনজনার জন্য পিছিয়ে দেয়া সম্ভবও নয়, উচিৎ ও নয়। সেক্টর কমান্ডার হয়ত ভেবেছিলেন মেজর নাসিমকে ইভাকুয়েট (Evaquate) করার পর ওরা এসে অ্যাডভানসিং কলামকে (Advancing column) ধরে ফেলতে পারবে। ওরা শেষমেশ তা পেরেছেও। যুদ্ধের সময় কিছু সুবিধা কিছু অসুবিধা তো থাকবেই।

শাহবাজপুর থেকেই ব্যাটালিয়ন জানতে পারলো বি.বাড়িয়া শত্রুমুক্ত। মিত্রবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন বি. বাড়িয়ায় পৌঁছেছে ৮ ডিসেম্বরে। পাকিস্তানিরা তখন প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে সেখান থেকে। যোদ্ধারা তাদের নাগাল পাবার আগেই এ মহকুমা শহর ছেড়ে গেছে তারা। বি.বাড়িয়া যাত্রার জন্য ২ ইস্ট



বেঙ্গল তখন রেজিমেন্ট প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকলের মনোবল একদম আকাশচুম্বি। হয়ত আকাশকেও ছাড়িয়ে যাবে। কষ্টকে আর কষ্ট বলে মনে হচ্ছে না কারো। শাহবাজপুরে দিনের বাকি অংশ বিশ্রাম নিলেন সবাই। পরের দিন সকাল সকাল মার্চ শুরু হলো বি.বাড়িয়ার উদ্দেশ্যে, সদলবলে।

যখন সেখানে ব্যাটালিয়ন পৌঁছলো দেখা গেলো মানুষের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস। শত্রুমুক্ত হয়ে নিজেদের স্বাধীন ভাবতে শুরু করেছে সেখানকার লোকজন। বি.বাড়িয়ার সকল স্তরের জনগণই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ৪ ইস্ট বেঙ্গলের বিদ্রোহে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়েছিল মাত্র ক'মাস আগে। স্বাধীনতার জন্য এদের উৎসাহ প্রেরণা এবং কর্মতৎপরতা ঐতিহ্যবাহী। তবে তুলনামূলকভাবে লোকজনের ভিড় কিছুটা কমই মনে হলো। হঠাৎ আগত শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এখানে ব্যাটালিয়নের স্থিতি হবে স্বল্প সময়ের জন্য। তবুও লেফটেন্যান্ট হোসেন পরিচিত সুহৃদদের খুঁজলেন।

প্রথমবার যখন হোসেন ৪ ইস্ট বেঙ্গলের সাথে বি.বাড়িয়ায় আসেন এবং হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে কাজ শুরু করেন তখন তাকে সাহায্যের জন্য অনেকেই হাত বাড়িয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের বাসায় মুক্তিযোদ্ধা হোসেন ক'টা দিন ছিলেন। তাদের আন্তরিকতার কাছে হার মানতে হয়েছিল তাকে। বি.বাড়িয়ায় ফেরত আসার পরে হোসেন খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হলেন তাদের বাসায়। কিন্তু পাকিস্তানিদের ভয়ে সে পরিবার তখন ঘর ছাড়া। তাদের অপরাধ হানাদারদের কাছে ছিল অনেক বড়ো। কেননা তারা ৪ ইস্ট বেঙ্গলের মতো দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করেছেন। সেই বাসায় হোসেনের ইউনিফরমসহ কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছিল। বাঁচার জন্য ঐ সমস্ত কাপড়-চোপড় মাটির অনেক গভীরে পুঁতে রেখে গেছেন ভদ্রলোক। হোসেন ভাবলেন, গেলো সবস্মৃতি যা কিছু ছিল, কিছু কুমিল্লায়, কিছু বি.বাড়িয়ায়। উপকারী বন্ধুরা তার কারণে বিপদগ্রস্ত হবেন তা কখনেই আশা করা যায় না। গেলোই না হয় কিছু জিনিসপত্র, কিছু স্মৃতি। ঐ পরিবার যা করেছেন নিশ্চয় আত্মরক্ষার তাগিদেই। ভাবতে ভাবতে একাত্তরের যোদ্ধা প্রশান্তি লাভ করলেন। আর কিছু না হোক তারা জীবন নিয়ে বেঁচে আছেন সেটাই অনেক বড় কথা।

বি.বাড়িয়ায় বিজয়ীদের যাত্রা বিরতি দীর্ঘ সময়ের হলো না। এগিয়ে চললেন তারা ভৈরবের দিকে। লেফটেন্যান্ট হোসেনের অবস্থান দীর্ঘ কলামের মাঝে, আবার কখনো সামনের দিকে। দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে চললেন ওরা, প্রতি মুহূর্তে। সতর্ক সবাই, লুকানো শত্রুর আক্রমণ যাতে ওদের প্রতিহত করতে না পারে। চলতে চলতেই হোসেন লক্ষ্য করলেন ব্যাটালিয়ন পুরোপুরি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। গত আট ন'মাসে যখন যেভাবে খুশি চলেছেন সবাই। যুদ্ধ করেছেন লুঙ্গি পরে খালি পায়ে, কখনো প্যান্টে, কখনো আধা ইউনিফরমে বা পায়ে জঙ্গল বুট নিয়ে কিন্তু প্রায় দীর্ঘ ন'মাসের কাছাকাছি সময়ে সে অবস্থার অবসান হয়েছে।

এ অগ্রযাত্রায় কোনো শত্রুর মুখোমুখি হতে হলো না ২ ইস্ট বেঙ্গলকে। এগিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যার কাছাকাছি ওরা একটা বাজারের মতো ছোটো জায়গায় থামলেন। কিছু ঘর এবং দোকানপাট নিয়ে বাজার। ভৈরব মাত্র দু'তিন কি.মি. দূরে। এরই মধ্যে ব্যাটালিয়নে সংবাদ পৌঁছল, ভৈরবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ছাউনি রয়েছে। কাজেই ভৈরব নয়, দ্রুত সিদ্ধান্ত হলো, By pass Bhairab অর্থাৎ ভৈরবকে এড়িয়ে এগিয়ে চলো। অন্য পথে ঢাকা যাবে ব্যাটালিয়ন। কিন্তু তার আগে রাতের মতো দরকার বিশ্রাম। ঐ বাজারেই যে যার সুবিধা মতো রাতের জন্য জায়গা করে নিল। সাথে সাথে জোরদার নিরাপত্তা। এতো বড়ো মুভে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে বিপর্যয় আসতে পারে বৈকি!

এখানেও গ্রামবাসীদের ভালোবাসা সকলকে অভিভূত করলো। এতো লোকের জন্য কোত্থেকে তারা খাবার জোগাড় করলো বুঝে ওঠা গেলো না। কিন্তু সবাই রাতের বিশ্রামের আগে খাবার পেলেন যথেষ্ট পরিমাণে। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সাধারণ জনগণের সহমর্মিতা ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নজির। প্রায় সারাদিন হাঁটাহাঁটির কারণে সবাই ক্লান্ত তখন। কাজেই সকলের চোখে ঘুমের আবেশ। সারা দিনের ক্লান্তির পর ওরা একে একে ঘুমিয়ে গেলেন এবং ঘুমালেন পরের দিন সূর্যের মুখ দেখা পর্যন্ত। ভোরে আলো ফুটতে সবাই জেগে উঠলো একে একে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য একটাই – চলো চলো, ঢাকা চলো। এটা প্রতিটি সৈনিকের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটি যোদ্ধার কামনা। ওরা মুক্ত দেখতে চায় ঢাকা, মুক্ত দেখতে চায় স্বাধীন বাংলাদেশ।

চা-নাস্তার পরে নতুন উদ্দীপনায় ব্যাটালিয়নের অভিযাত্রা শুরু হলো আবারও। প্রথমে রেললাইন ধরে হাঁটা শুরু করলেও অল্পক্ষণেই ওরা দক্ষিণ দিকে মাঠে নেমে গেলেন। উদ্দেশ্য ভৈরব এড়িয়ে যাওয়া। গ্রামের মধ্য দিয়ে হেঁটে ভৈরবের প্রায় দু'কিলোমিটার নিচের দিকে (Down Stream) ব্যাটালিয়নের সকলে মেঘনা পার হবার প্রস্তুতি নিলেন। ওখানে একটা খেয়াঘাট আছে। এক সময় গ্রামের কিনারায় পৌঁছলো ওরা। সেখান থেকে ভৈরব ব্রিজ দেখা যায়। ব্রিজের উপর পাক সেনাদের অবস্থানও প্রায় স্পষ্ট।

অগ্রসরগামী এ দলের ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ঘাটে খেয়া নৌকাগুলো স্বাভাবিক পারাপার করছে তখনও। পাকিস্তানিরা ভৈরবে থেকেও সে ঘাটের নৌকাগুলো কেন সরিয়ে নেয়নি বোঝা গেলো না। অথবা তারা নিশ্চিত যে চোখের সামনে দিয়ে কেউ যাওয়া-আসা করবে না। তাও হবার নয় কারণ সে সময় হারের পাল্লা ওদের দিকেই পুরোপুরি। বিভিন্ন রণাঙ্গনে হেরে চলেছে একের পর এক হানাদার বাহিনী। নাকি টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে খেয়া ঘাটকে? যেই পার হবার চেষ্টা করবে অমনি শুরু হবে আক্রমণ। বলা তো যায় না। যুদ্ধে সবই সম্ভব।



কাজেই ব্যাটালিয়ন নদী পারাপারে সাবধানতা অবলম্বন করলো। একেকবারে জনাকয়েক গিয়ে উঠলো নৌকায়। পাকিস্তানিদের ছোট অস্ত্রের পাল্লায় না থাকলেও ভারি অস্ত্রের পাল্লায় যে খেয়াঘাট আছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তা ছাড়া গ্রামের কিনারা থেকে নৌকা পর্যন্ত খোলা জায়গাটাও প্রায় পাঁচশ মিটার তো হবেই। হ্যাঁ, নদী পার হতে কিছুটা সময় লাগলো বটে কিন্তু পার হয়ে ব্যাটালিয়ন আর অপেক্ষা করলো না। জোয়ানরা প্রথমে কিছুটা ক্রস কান্ট্রি (Cross-country) হেঁটে আবার উঠে এলো রেল লাইনে। ভৈরব এখন ওদের পেছনে। একটা বাধা অতিক্রম করা গেলো।

আবার সোজা এগিয়ে চললেন ওরা রেল লাইন ধরে। লক্ষ্য নরসিংদি। উদ্দেশ্য নরসিংদিতে রাত্রি যাপন। হাঁটতে হাঁটতে বেলা পড়ে এসেছে। নরসিংদি আর তেমন একটা দূরে নয়। মাত্র এক কিলোমিটার হবে। গ্রামের লোকজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। দেখছে ওদের সদম্ভে এগিয়ে যাওয়া।

এ রেল লাইনের কোল ঘেঁষেই হোসেনের বাড়ি। এতোক্ষণ তিনি কাউকেই বলেন নি বাড়ির পাশ দিয়েই যাচ্ছেন তিনি। আজন্ম ভালোবাসা তার অতি প্রিয় এ গ্রাম। যেখানে বড়ো হয়েছেন মাটির সাথে মিশে, বুনোলতার মতো। তাইতো এর প্রতি মমতার ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে ইচ্ছে করে। সে-ই গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে লেফটেন্যান্ট হোসেন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। এক সময় প্রায় দৌড়ে চলে এলেন সামনে।

যে রেল লাইন ধরে হাঁটছেন সবাই, সত্যিকার অর্থে গেছে তাদের জমির উপর দিয়ে। রেল লাইন উঁচু করার মাটিও তোলা হয়েছে সে জমি থেকে। ১৯০১ সালের ঘটনা সেটা। তিনি শুনেছেন তার বাবার কাছে। রেল লাইন থেকে তার ঘর মাত্র পঁচিশ গজ দূরে, দক্ষিণে। অর্থাৎ রেললাইন চলে গেছে সে বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে।

এখানে এসে হোসেন আবেগে অপ্লুত হলেন। তার কিছু স্মৃতি আছে যা সারা জীবনই হয়ে থাকবে। রেললাইন উঁচু করতে যে ডোবা তৈরি হয়েছে তার মাঝে মাঝে আবার প্রশস্ত উঁচু জায়গা, যাতে গ্রামের লোকজন রেললাইনে উঠে আসতে পারে। যোদ্ধার বাড়ি বরাবরও এ রকম একটা উঁচু জায়গা, প্রায় পঁচিশ গজ চওড়া। এ জায়গাটাতে ছেলেবেলায় তিনি দেখতেন এক বয়স্ক চাচা রোজার দিনে পথচারীদের জন্য ইফতার নিয়ে বসতেন। তাঁকে সবাই বদু চাচা বলে ডাকত। সবার বদু চাচা হবার সুবাদে তার ভালো নাম তখনকার ছোটোরা জানতো না। বাজার থেকে ফেরার পথে ইফতারের সময় হলে বদু চাচা লোকজনকে ডেকে ডেকে ইফতার করাতেন। সে উঁচু জায়গাটায় প্রচুর লোকজন জমা হয়েছে বিজয়ী বেশে যোদ্ধাদের প্রত্যাবর্তন দেখতে।

লেফটেন্যান্ট হোসেন যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময়ে দেখলেন তার পুরো ডাইনেস্টিকে জনতার মাঝে। দেখলেন গ্রামের লোকজনদের মধ্যে তার বাবা,

চাচা, ভাই, চাচাতো ভাই এবং আরো অনেক চেনা মুখ দাঁড়িয়ে। তারাও কল্পনা করেনি যে হোসেন এদের সাথে আছে। সে এক আবেগঘন মুহূর্ত তার জন্য। হৃদয় দিয়ে চেনা মুখগুলোর মাঝে যেন নিজেকে আবার আবিষ্কার করলেন। চোখ যেন ভিজে ভিজে উঠছে কি এক পরম পাওয়ায়।

কল্পনায় দেখা যাচ্ছে অল্পবয়সী এক ছটফটে তরুণ, রণাঙ্গনে ছুটে বেড়াচ্ছে নিজের দায়িত্ব নিয়ে। কখনো ভয় আর কখনো অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করছেন সাহসের সাথে। নির্ভীক অগ্রাভিযানে অকুতোভয়, সঙ্গী পরিবেষ্টিত। হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেছেন নিজেকে তাঁর অতি প্রিয়জনের মাঝে। আনন্দে নেচে উঠেছে বুক। দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন একান্ত প্রিয়জনদের মাঝে। মা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে খুশির কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। বাবার চোখেও অশ্রুর ধারা। তিনি মুছতে মুছতে ধরা গলায় বলেছেন – কষ্ট করে এসেছে, ওকে ঘরে নিয়ে যাও। কতো দিন খায়নি ভালো করে। মা একবার গালে হাত দিচ্ছেন, একবার বুকে। বারবার বলছেন– বাবা, তুই শুকিয়ে গেছিস। ঠিকমতো খাসনি এতোদিন! তাদেরও আনন্দের অশ্রু গড়াচ্ছে চোখে। কিন্তু মুখে ফুটে আছে তৃপ্তির হাসি। এক সময় দেখা গেলো জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছেন পিতা পুত্র।

এ-রকম কতো আবুল হোসেন গেছেন যুদ্ধে বাংলার মাটিতে। কতোজন অনুভব করতে পেরেছে এই পুনর্মিলনের আনন্দ! আহা সবাই যদি পারতো!

তরুণ হোসেন একসময় দৌড়ে চলে এলেন সামনে। সেক্টর কমান্ডারকে বললেন – স্যার, এইতো আমার বাড়ি। পরিচয় করিয়ে দিলেন তার বাবার সাথে। কমান্ডার দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন গর্বিত পিতার সাথে। হেসে হেসে কথা বললেন উপস্থিত সকলের সাথে। আপনজনরা তরুণ যোদ্ধাকে ধরে বসলেন থেকে যেতে। কিন্তু তা তো হবার নয়। হোসেন সেক্টর কমান্ডারকে বললেন – অল্পসময়ের মধ্যেই আসছি স্যার। সেক্টর কমান্ডারের চোখে অনিশ্চয়তা। জবাবে বললেন – এখন থাকাটা কি ঠিক হবে? হোসেন জবাবে বললেন – বেশি সময় লাগবে না স্যার, এক্ষুণি চলে আসবো।



একাত্তরের যোদ্ধা গেলেন সবার সাথে বাড়ির মধ্যে। তার তিন চাচা এবং চাচি সবাই চোখে পানি কথা বলছেন। চাচাতো ভাইয়েরা এবং অন্যান্য আত্মীয়-



স্বজনরাও হাজির হলো একে একে। তাদের কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা পরে যোদ্ধা পরিচিত পথ ধরে চলে এলেন নরসিংদি কলেজে। ঐ দিন দেশের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারা, ২ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার ও জোয়ানবৃন্দ অবস্থান নিয়েছেন সেখানে। অফিসারবৃন্দ উঠেছেন অবিবাহিত শিক্ষকদের ডরমিটরিতে। এ কলেজেই লেখাপড়া করেছেন হোসেন। হেঁটে হেঁটে দেখলেন মাঠ, ক্লাসরুম। যোদ্ধার অনেক স্মৃতি জড়িত এখানে। ভাবতে ভালো লাগে। অনুভবের কি এক অপার আনন্দ বার বার তাকে উদ্বেলিত করছে! হারানো মানিক ফিরে পাবার আনন্দ তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

সে দিনের যোদ্ধা হোসেন মূল দলের সাথে যদিও নরসিংদি কলেজে এলেন কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো তার চাচাতো ভাইয়েরা লেগে থাকলো তার সাথে সাথে। বাড়িতে নেবেই, না নিয়ে ছাড়বে না। ব্যাটালিয়নের ডাক্তার হোসেন ইতোমধ্যেই সবার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছেন। শারীরিকভাবে কেউ অসুস্থ নেই। নরসিংদির মেডিক্যাল অফিসারদের সাথেও কথা বললেন তিনি। তারা যে কোনো সময়ই যে কোনো সহায়তা দিতে রাজি হলো। শেষে সেক্টর কমান্ডারকে বললেন যে তিনি রাতের মতো বাড়িতে থাকতে চান, সকালে চলে আসবেন। সেক্টর কমান্ডার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কিছুক্ষণ আগে সে এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানিরা গেছে। একাকী বাড়িতে থাকলে কে তাকে নিরাপত্তা দেবে? জবাবে তিনি কমান্ডারকে জানালেন, দরকারে চাচাতো ভাইয়েরা পাহারা দেবে। আসলে চাচাতো ভাইয়েরাও তা-ই বলেছে হোসেনকে। শেষে কমান্ডার সম্মতি দিলেন তার বাড়িতে রাত্রি যাপনের জন্য। বললেন – You can go at your own risk.

লেফটেন্যান্ট হোসেন যুদ্ধের ডামাডোলের মাঝে বাড়ির এতো কাছে অথচ বাড়িতে যাবেন না শত্রুর ভয়ে, ভাবতেই খারাপ লাগলো তার। শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন ঝুঁকিটা নেবেন। শেষে রাত ন'টার দিকে পৌঁছলেন বাড়িতে। গিয়ে বুঝলেন অনেকের চোখের জল এখনো বাকি। হারিকেনের মান আলোয় মা'র হাতের রান্না খেলেন অনেকদিন পর। সবাই দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে। যেন এক পরম পাওয়ার দিন। এ রকম সৌভাগ্য ক'জন মুক্তিযোদ্ধার হয়েছে স্মৃতি বিজড়িত একাত্তরের সে সব দিনগুলিতে।

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। কথাটা মিথ্যে নয়। হোসেন কোথায় খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নেবেন, তা নয়। বসতে হলো বিচার করতে। রাত দশটার দিকে এলাকার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ধরে নিয়ে এলো ওখানকার রাজাকার লিডারকে। যাকে নিয়ে এলো তার ভালো নাম জানা গেলো না। তবে এলাকায় সে মধু নামে পরিচিত। বহু বছর থেকেই সে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন। সে তার বাবার একমাত্র ছেলে। তার বাবাও তার দাদার একমাত্র ছেলে ছিল। ডাইনেস্টির

ট্র্যাডিশনটা ভেঙেছে এসে তার বেলায়। তার ছেলে গোটা চারেক। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে তার বাসায় ছিল পুলিশ, মিলিটারি এবং রাজাকারদের আড্ডা। তারা আসতে যেতে তার বাড়িতে থাকতো, খেতো, বিশ্রাম নিতো তাদের প্রয়োজন মোতাবেক।

মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা জেদ ধরলো। রাতেই বিচার করে তার মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। ওরা চাচ্ছে সেটা কার্যকর করতে। বিপদের মধ্যেও মুধু ভূঁইয়া ঘাবড়ে গেলো না। সাবধানি এবং বুদ্ধিমান মানুষ সে। তরুণ যোদ্ধাকে সে বললো – আমার যে কোনো বিচার করার আগে তোমার বাবা এবং মাকে একবার জিজ্ঞেস করো। তাঁরা যে ভাবে বলেন তার উপর ফয়সালা করো।

তার এ কথাটা রাখলেন হোসেন। গেলেন ঘরের ভিতর এবং জিজ্ঞেস করলেন তার মা ও বাবাকে মধু ভূঁইয়া সম্পর্কে। তার বাবা জানালেন যে হোসেন আর্মিতে জয়েন করেছে এবং তারপর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ভারতে আছে, এটা মধু ভূঁইয়া জানতো। হোসেনের ছোট ভাই আবুল হাসান ভারতের আগরতলায় প্রশিক্ষণ নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অত্র এলাকায় কাজ করছে, মধু ভূঁইয়া সে কথাও জানতো। সে ইচ্ছে করলে এ সব খবরগুলো পাকবাহিনী কিংবা রাজাকারদের বলে ওদের পরিবারের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো। এসে হয়তো দেখতে পেতো বংশের কেউ আর বেঁচে নেই। তার সাথে পাকিস্তানিদের দহরম-মহরম থাকলেও এ এলাকায় কারও কোনো ক্ষতি করেনি সে। তার মাও একই কথাই বললেন।

হোসেন মা-বাবার বক্তব্যের ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধা এবং চাচাতো ভাইদের সাথে আলাপ করলেন। তারা সবাই একবাক্যে এ বক্তব্য মেনে নিল। চাচাতো ভাইয়েরা বললো – সে ইচ্ছে করলে অনেক ক্ষতি করতে পারতো, কিন্তু করেনি। কাজেই মধু ভূঁইয়াকে হত্যার হুকুম দেয়া গেলো না। তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের বললেন হোসেন। ভদ্রলোককে কিন্তু এরা সবাই দাদা বলে ডাকতেন। আর হোসেনের বাবা কিংবা চাচারা তাকে চাচা বলে ডাকতেন। কিন্তু বাড়ি যাবার ছাড় পেয়েও বাড়ি যেতে রাজি হলো না মধু। বললো– বাড়ি যাবো না। আমাকে মেরে ফেলবে ওরা।

তরুণযোদ্ধা মধু ভূঁইয়াকে আশ্বস্ত করে বললেন– ভয় নেই, ওদের বলে দিচ্ছি, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। মধু ভূঁইয়া রাতটা ঐ বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ জানালো কিন্তু রাজি হলেন না হোসেন। তাকে বাড়িতে না রাখার প্রধান কারণ তিনি নিজেই বাড়িতে রাত্রি যাপন করবেন। তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তবে তার বন্ধুক এবং পিস্তল রেখে যেতে বললেন। মধু ভূঁইয়া শুধু বললো – এগুলো আমার লাইসেন্স করা গান। তবে তার গলায় জোর ছিল না। হোসেন তাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে ওগুলো তার কাছে নিরাপদে থাকবে। মধু ভূঁইয়া আর কোনো কথা না বলে চলে গেলো।



কয়েক মাস পরের কথা, দেশ স্বাধীন এবং তরুণ যোদ্ধা তখন ঢাকায় থাকেন সেনাসদর মেসে। জানুয়ারি'র শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ হবে। মধু ভূঁইয়া এসে তার সাথে দেখা করলো। সাথে করে নিয়ে এলো রক্ষীবাহিনীর পরিচালক নুরুজ্জামান সাহেবের একটা চিঠি। যার মর্মার্থ তিনি মধু ভূঁইয়াকে চেনেন। বন্দুক এবং পিস্তলের আইনসম্মত মালিক সে। সম্ভব হলে যেন এগুলো তাকে দিয়ে দেয়া হয়। অস্ত্রগুলো রাখা ছিল ২ ইস্ট বেঙ্গলের অস্ত্রাগারে। সেগুলো আনা হলো অস্ত্রাগার থেকে। ফিরিয়ে দেয়া হলো মধু ভূঁইয়ার অস্ত্র তার হাতে।

এর পরেও সে বেঁচে ছিল বহু বছর, স্বাভাবিক ভাবেই। বলতে দ্বিধা নেই, মধু ভূঁইয়ার ফ্যামিলি নরসিংদিতে অনেক ভালো কাজ করেছে। ওখানকার ঈদগাহ এবং ফুটবল মাঠ তাদেরই দেয়া। ফুটবল মাঠটি পরে মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ করা হয়। কারণ খেলোয়াড় এবং খেলার উদ্যোগ পরবর্তীতে দু-ই কমে গিয়েছিল।

একাত্তরের সেদিনের নরসিংদিতে যেখানে ছাউনি ফেলেছে মুক্তিযোদ্ধারা, সেটা আট কিংবা নয় ডিসেম্বরের ঘটনা। পিন পয়েন্ট করে তারিখ বলা গেলো না। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে হোসেন মূলদলের কাছে কলেজ কম্পাউন্ডে চলে এলেন। এখন যোদ্ধাদের একমাত্র লক্ষ্য এগিয়ে চলা ঢাকার দিকে। ঢাকাকে শত্রুমুক্ত করতে হবে।

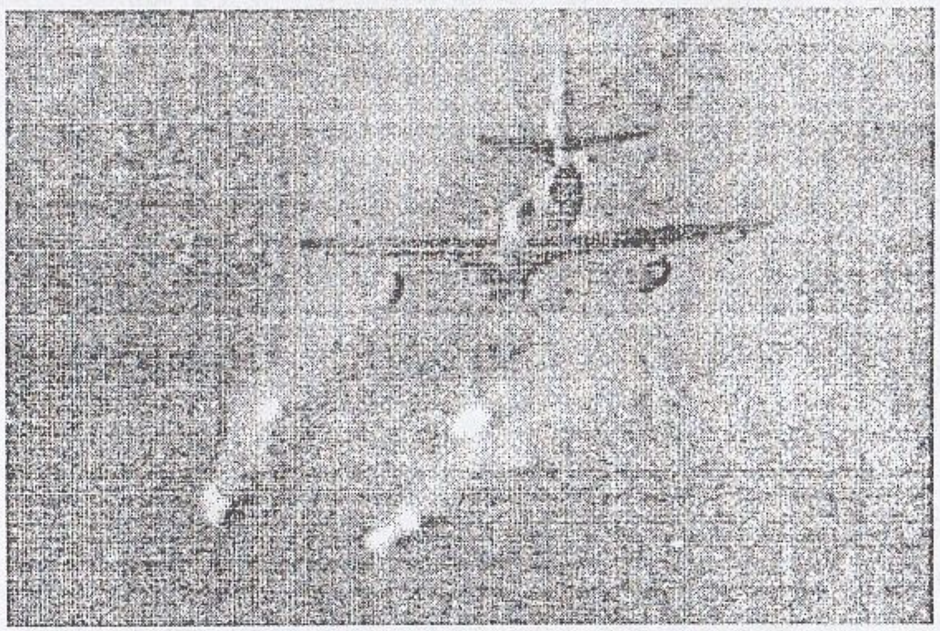


ওরা সাহসী মুক্তিযোদ্ধা – ওদের এখন একমাত্র লক্ষ্য ঢাকা

যথারীতি অগ্রাভিযান শুরু হলো আটটা কিংবা সাড়ে আটটার দিকে। নরসিংদির পথে পথে দল বেঁধে দাঁড়ানো লোকজন কুশল বিনিময় করছে অগ্রসরমান জোয়ানদের সাথে। এ বিনিময়ের ভাষা কখনো হ্যান্ডশেক আবার কখনো কোলাকোলি। ওদের ভালো লাগছিল উৎফুল্ল লোকজনের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরতে, হ্যান্ডশেক করতে। আনন্দ-আবেগে যেন নরসিংদিবাসীকে পেয়ে বসেছে সেদিন। সকলেই যেন একান্ত আপনজন। যোদ্ধারাও সে আনন্দ অকুণ্ঠ

ভাবে উপভোগ করছে এগিয়ে যেতে যেতে। আর এভাবেই আনন্দ আর ভালোবাসা নিয়ে নরসিংদি পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো ওরা, একমাত্র লক্ষ্য ঢাকা জয় আর শত্রুর শেষ।

এতেদিনে মুক্তিযুদ্ধ গতি পেয়েছে প্রচণ্ড। বিজয়ের খবর যেন বাঁধ ভাঙা হাসি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনীর কাছে, ডিসেম্বরের শুরু থেকেই। ডিসেম্বর শুরুর দিকে বাঙালির প্রতিরোধ আরও ঔজ্জ্বল্য পেলো। সারা দেশেই চলছে আকাশ যুদ্ধ-আক্রমণে ভারতীয় হান্টার মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধা একের পর এক এলাকায় তাঁদের বিজয় কেতন উড়াতে শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর এসব সাফল্যের খবর দেশবাসীকে উৎসাহিত করতে থাকে। ঢাকায় গেরিলা বাহিনী আরও তৎপর, দুঃসাহসী হামলা চালায় তারা। একাত্তরের ২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মুক্তিযোদ্ধারা সারা দেশে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহোযোগীদের ওপর হামলা চালায়। বগুড়ায় সদর উপজেলার পিরগাছা ক্যাম্পের কাছে এক পাকিস্তানি সেনাকে গুলি করে হত্যা করে ওরা। মহাস্থানের অদূরে গাবতলি উপজেলার কদমতলি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হামলা চালালে পাল্টা আক্রমণে পাকবাহিনীর পুরো দলকেই নিশ্চিহ্ন করে তারা। আখাউড়ার কাছে আজমপুর রেলস্টেশন এলাকায় পাকসেনাদের আক্রমণে পিছু হটা ২ বেঙ্গলের মুক্তিযোদ্ধারা পাল্টা আক্রমণ করে আবার দখল করে নেয় আজমপুর রেলস্টেশন।



চলছে আকাশযুদ্ধ– আক্রমণে ভারতীয় হান্টার

সম্ভাব্য পরাজয়ের মুখে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ইয়াহিয়ার সরকার বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর যেখানেই মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেতে শুরু করে, সেখানেই অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় বাহিনীর কথা বলে সীমান্তে হামলা চালাতে থাকে। পাকিস্তানের তখনকার



প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি দেখতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক পাঠাতে মহাসচিব উ-থান্টের কাছে যে আহবান জানায়, তা ২ ডিসেম্বরে পাঠানো হয় নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনার জন্য।

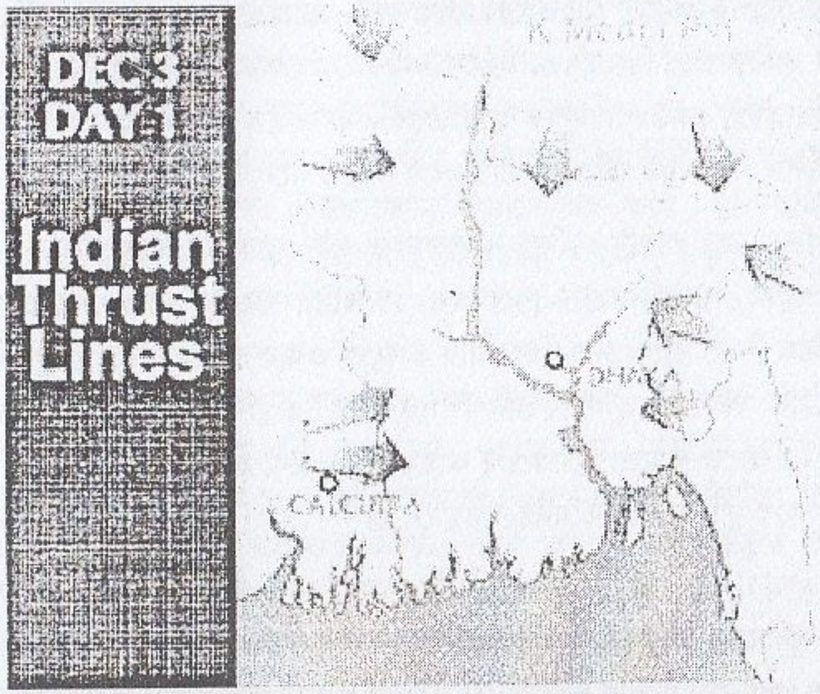
বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ পর্যবেক্ষক পাঠানোর দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বললেন যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে কেউ পরিদর্শক হয়ে এলে এবং তাতে কোনো অঘটন ঘটলে এ প্রস্তাবের উদ্যোক্তাদেরই তার দায়ভার বহন করতে হবে।

০২ ডিসেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তান সফররত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমির গোলাম আযম সাংবাদিকদের বলেছেন, পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব কোনো পূর্ব পাকিস্তানিকে দিলে বাংলাদেশ তামাশা'র উপযুক্ত জবাব দেওয়া যাবে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সভাপতিত্বে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সভায় সত্যিকার প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানানো হয় সে দিন। এ দল দু'টি প্রস্তাবের সাথে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অবস্থানে।

মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা আসন্ন বিজয়ের সুবাতাস পাচ্ছেন। পাকিস্তানিরাও শুনছে পরাজয়ের পদধ্বনি। তাই বিষদাঁতের শেষ ছোবলে এ দেশীয় দোসরদের নিয়ে নতুন জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার এক ছক আঁকতে শুরু করেছে ওরা। শোনা যায় রাজাকার, আলবদর, আল-শামস দেশের সেরা সন্তানদের তালিকা করা শুরু করেছিল এ সময় থেকেই।

তখন আমাদের দরকার স্বীকৃতি একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে। স্বীকৃতি মানে শির উঁচু করে দাঁড়াবার আর এক পদক্ষেপ। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে একটি খবর - স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ০৩ ডিসেম্বরের স্বীকৃতি পেতে পারে বাংলাদেশ। স্বীকৃতি দিলে প্রথমে ভারতই দেবে এ স্বীকৃতি, এটাই ছিল সবার ধারণা। ধীরে ধীরে পাওয়া যাবে অন্যান্য দেশেরও স্বীকৃতিও। দিনটি ছিল শুক্রবার। সকাল থেকে বিকেল, দিনটি চলে গেলো, কোনো ঘোষণা এলো না। বরং এদিন পাকিস্তান সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। আর যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই পাকিস্তান ভারতের অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রা বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। মধ্যরাতে ভারতও সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। শেষতক শুরু হলো দু'দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ। পূর্বাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধা ও সাত ডিভিশন ভারতীয় সেনার যৌথ আক্রমণের মুখে পড়ে পাকিস্তানের চার ডিভিশন সেনা। ০৩ ডিসেম্বরে নারায়ণগঞ্জ বিমানবাহিনীর

সার্থক হামলায় মিত্রবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলল ঢাকার দিকে গোদানেইল ও চট্টগ্রামের ফুয়েল পাম্প ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এ সময় একের পর এক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানি




ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলল ঢাকার দিকে

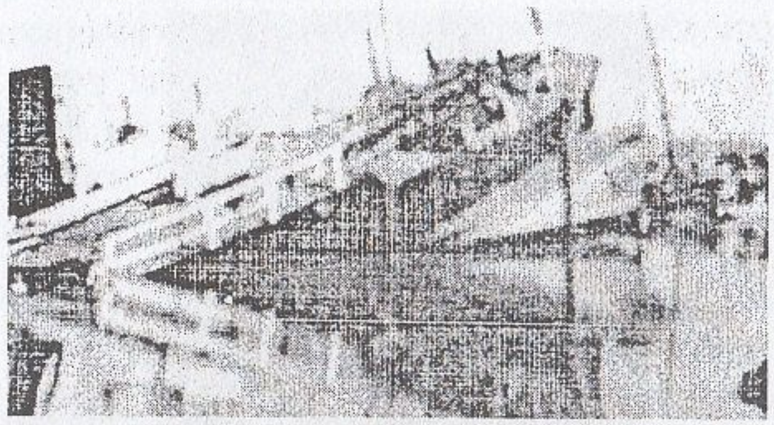
সেনাদের ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো কোণঠাসা করে ফেলে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সমর পরিকল্পনা নিয়ে ভারতীয় সেনা সাহায্য বিশেষ করে ছত্রীসেনাদের অবতরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে থাকে সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা।

এদিন কুমিল্লায় মেজর আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী মিয়াবাজারে পাকসেনাদের ওপর হামলা চালায়। ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধারা মিয়াবাজার দখল করে নেয়। আখাউড়া আজমপুর স্টেশনে দু'পক্ষই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দিনভর যুদ্ধ চালিয়ে যায়। যে কথা ইতোমধ্যেই এসেছে। সিলেটের ভানুগাছায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। নোয়াখালীতে সুবেদার মেজর লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সোনাইমুড়ি মুক্ত করে। এরপর তারা চৌমুহনীতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আক্রমণ চালায় পাকিস্তানিদের ওপর।

মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী মাইজদিতে আক্রমণ চালায় পাকবাহিনীর ওপর। রংপুরের পলাশবাড়িতে ১২ জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। সাতক্ষীরা থেকে পিছু হটে দৌলতপুরের দিকে যায় পাকিস্তান বাহিনী। সব সেতু ভেঙে দেওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু নিলেও বাধাগ্রস্ত হন। (সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, দশম খণ্ড)।



মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেও হাল ধরে রাখার চেষ্টা শত্রুদের। ওই দিন জুমার নামাজের পর ভারতীয় হামলার প্রতিবাদের নামে স্বাধীনতাবিরোধীদের একটি মিছিল চট্টগ্রাম শহর প্রদক্ষিণ করে লালদিঘি ময়দানে জড়ো হয়। জামে মসজিদের ইমাম মৌলানা আল-মাদানীর সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য দেন কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধান ফজলুল কাদের চৌধুরী, পিডিপি'র মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, ছাত্রনেতা আবু তাহের, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী অধ্যাপক



ভারতীয় বিমান হামলায় বিধস্ত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর

শামসুল হক প্রমুখ। ঐ দিন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ভবিষতে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে সংশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকেই এ ব্যাপারে দায় বহন করতে হবে (বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র, সপ্তম খণ্ড)।

যৌথ বাহিনীর লড়াই রণাঙ্গনের যুদ্ধের গতিকে দ্রুততর করলো। কিন্তু তখনও ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় নি। ৪ ডিসেম্বর আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ পুনরায় ভারতের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আহবান জানালেন। স্পষ্ট কারণ ছিল এর পিছনে। ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত ভূমিকা সফলতর হতে পারে যদি এ দু'দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে পাহাড়ি রাষ্ট্র ভুটান এদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অস্তিত্বের এ যেন এক নতুন সোপান। সূত্র : [মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঁইয়া]

ব্যাপক যুদ্ধ চলছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিগত ক'দিন ধরেই। পূর্ব ফ্রন্টে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে আনছে। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ঢাকার আকাশ শত্রু বিমান মুক্ত হয়ে গেলো। আর সৌভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের প্রতি তার পুরো সমর্থন অব্যাহত রাখলো।

মার্কিন সরকারের উদ্যোগে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসল ৫ ডিসেম্বর। উদ্দেশ্য চলমান স্বাধীনতা সংগ্রামকে রহিত করা। সৌভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলো। সম্ভবত এ ভেটো একটা জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে দিল।

আর ৬ ডিসেম্বর আমাদের জন্য নিয়ে এলো সুসংবাদ। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল্লাহ নিয়াজির বাহিনী অনেক ঘাঁটি থেকে পুশব্যাক শুরু করেছে। ওদের প্রতিরক্ষার ফাটল প্রসারিত হচ্ছে দ্রুত রিকটার স্কেলের ভূমিকম্পের মত। যেন সর্বগ্রাসী ভূমিকম্প আঘাত হেনে চলেছে হানাদারদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়।



ভারতের প্রধানমন্ত্রী - শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

আর এ দিনটিতেই শান্তির দূতের মতো বাতাসে ভর করে ভেসে আসল বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির কথা। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর স্বহস্তে স্বাক্ষরিত পত্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা দিলেন। বাংলাদেশের অস্তিত্বের পক্ষে এ হলো ২য় স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতির পর বক্তব্যের এক পর্যায়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বললেন – শুধুমাত্র ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে আমরা স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি। বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিবেচনা করেই স্বীকৃতি দিচ্ছি। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানি হামলা প্রতিহত করার জন্য জীবনপন সংগ্রামরত ভারতের জনগণ আজ একই লক্ষ্যের ও পথের পথিক।

এদিকে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রীসহ অন্য সদস্যরা জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন বাংলাদেশের জন্য বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে।

পাকিস্তানের হাতে তখন একটা কাজই বাকি, ভারতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং তারা তাই করলো ঠিক পরের দিনই। পাকিস্তান ভারতের সাথে তার



কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতি টানলো। কিন্তু ওদের পরাজয়ের ঘণ্টা বেজে উঠেছে অনেক আগেই। এখন শুধু অপেক্ষার পালা, কখন তাদের শৃঙ্খলিত হবার ক্ষণ উপস্থিত হবে। একাত্তরের ৫ ডিসেম্বর ৫৫ হাজার বর্গমাইল ছড়িয়ে সারা বাংলাদেশই যেন হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধেদের রণাঙ্গন। নির্বিচারে বাঙালি নিধনের মধ্য দিয়ে যে সংঘাতের শুরু করে পাকিস্তানি শাসকেরা, অসীম সাহসিকতায় তা মোকাবিলাসহ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দেশের বুকে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে নেয় বাঙালি। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলে কূটনৈতিক যুদ্ধ। দখলদার বাহিনী ও তার দোসরদের জন্য পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. এম এ মালেক এ দিন 'দেশবাসীর' প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, 'আমরা আক্রান্ত। কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের সহযোগিতায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এ পবিত্র দেশের ওপর আক্রমণ করছে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিরক্ষা তহবিল। আপনারা সবাই ওই তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন'।



এরই মধ্যে ভেঙে পড়েছে ঘাতকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা

এ যেন ডা. মালেকের মোড়লিপনা। তার প্রিয় দেশবাসীর প্রতি পাকিস্তানিরা যে অপ্রিয় কর্ম ঘটিয়ে চলেছে তার কথাতো তিনি জানেন না বলে মনে হচ্ছে।

একই দিনে ইসলামাবাদে মন্ত্রিসভায় আকস্মিক রদবদল করেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান। আসন্ন পরাজয়ের মুখে নুরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে উপপ্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেন তিনি।

এ দিন যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব জাতিসংঘে পাস করাতে ব্যর্থ হয় যুক্তরাষ্ট্র। তাদের নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করে সে দেশের পত্রপত্রিকা। বাল্টিমোর সান তার প্রতিবেদনে নিক্সন সরকারের নীতির সমালোচনা করে। সাধারণভাবে মার্কিন পত্রপত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করা হলেও সান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশকে পূর্ববাংলা বলে উল্লেখ করে। তারা বলে, পূর্ববাংলার সমস্যার মূলে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না।

বাল্টিমোর সান লিখেছে, শক্তিপ্রয়োগ আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে ধরে রাখতে চাইছে পাকিস্তান। শক্তি প্রয়োগের এ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তানিরা জিহাদের কথা বলছে। মুসলমানদের ধর্মীয় এ যুদ্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববাংলায়। এ অঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দুরা হয় মারা গেছে, না হয় তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এ অবস্থায় জিহাদের ডাক দিয়ে পাকিস্তান সরকার নিজেদের মুণ্ডুহীন ও অসহায় হিসেবে তুলে ধরেছে।

একই সুর ধ্বনিত হয়েছে প্রভাবশালী নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়। তারাও নিক্সন প্রশাসনের সমালোচনা করে অভিযোগ তোলে যে বিশ্বসংস্থাকে পাশ কাটিয়ে পাক - ভারত সমস্যায় তারা গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে।

একাত্তরের দুর্দিনে ভারত পরম বন্ধুত্বের পরিচয় দেয় বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের সাথে। তাদের উদার সহযোগিতা আমাদের বিসর্জনের ভিত করে দিল মজবুত। মুক্তিযোদ্ধাদের বলিষ্ঠ হাতকে করলো আরও বলিষ্ঠতর।

নিজেদের পরাজয় ঠেকাতে পাক হানাদার বাহিনী যুদ্ধের মাঠে নামে সর্বশক্তি দিয়ে। পাকিস্তান একই সঙ্গে কূটনৈতিক পর্যায়ে সর্বশক্তি দিয়ে লড়ে চলেছে। কিন্তু যুদ্ধের মাঠের মতো কূটনৈতিক মাঠেও একের পর এক পরাজয় মেনে নিতে হচ্ছে তাদের। সীমাহীন পরাজয়ের গ্লানি তাদের ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলেছে বিশাল পাইথনের মতো।

যুদ্ধে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো মুক্তিবাহিনী। রক্তাক্ত আর নিষ্ঠুর একটি যুদ্ধের সূচনাকারী পাক হানাদারদের বিমান বাহিনীও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এ দিনে। স্বাধীন হয়ে যায় বাংলার আকাশ। এখন সেখানে যৌথ বিমান বাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন, আমরা যে স্বাধীন হচ্ছি তা দেখার দূরদৃষ্টি যদি ইয়াহিয়ার থাকে, তাহলে তাকে যুদ্ধবিরতি এবং শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, মুজিবকে মুক্ত করতে হবে এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর শান্তিপূর্ণ ভাবে করতে না চাইলে আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

এ সময় ঢাকাকে মুক্ত করতে মুক্তিবাহিনী দ্রুত বিভিন্ন দিক থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ দিনেই যশোরে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাদের কাছে পরাস্ত হয় ঘাতক পাকিস্তানি বাহিনী। লেজ গুটিয়ে তারা আশ্রয় নেয় সেনানিবাসে। প্রথম হানাদারমুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জনকারী জেলায় পরিণত হয় যশোর। যদিও একেবারেই স্বাধীন শহরের মর্যাদা পেতে তাদের আরও একদিন অপেক্ষা করতে হয়। পাকবাহিনী ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে থমথমে শহরে অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এসে আনন্দ-উল্লাস শুরু করে।

এ দিন মুসলিম দেশগুলোর সংবাদপত্রেও পাকিস্তানের সমালোচনা করে সংবাদ প্রকাশ পায়। ইন্দোনেশিয়ার পত্রিকা ইন্দোনেশিয়া রায়া ৭ ডিসেম্বরের

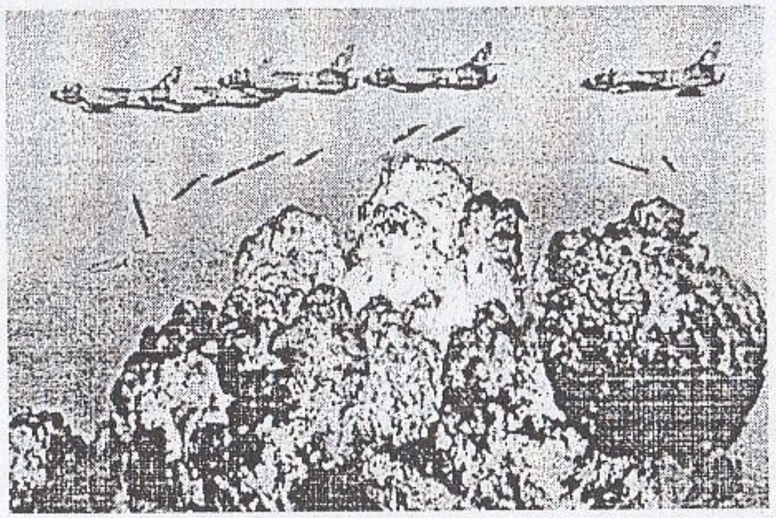


সংখ্যায় লিখেছে যে যুক্তি পরাজিত, আওয়াজ তুলেছে বন্দুক। আর এখন পাকিস্তান এ নিয়ে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায়। সারা বিশ্ব দেখেছে পাকিস্তান কিভাবে তার নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে জঘন্য আচরণ করেছে। নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ ও এর অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেনি তারা। বিশ্বের কোনো দেশের পক্ষেই লাখ লাখ শরণার্থীর বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। ইয়াহিয়ার চাপিয়ে দেওয়া নির্যাতনেই লাখ লাখ মানুষ আশ্রয় নেয় ভারতে। পাকিস্তানের উচিত বাংলাদেশকে মেনে নেওয়া এবং নিজেদের ভুল সংশোধন করা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমেও এদিনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ব্যাপক প্রচার পায়। সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গার্ডিয়ান, দ্য টেলিগ্রাফ ও দ্য টাইমস। গার্ডিয়ান তাদের সম্পাদকীয়তে লিখল – নিক্সন হয়ত খুশি হবেন না, চীনেরও এটা ভালো লাগবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সদিচ্ছা এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশকে আর দমিয়ে রাখা যাবে না।

এদিকে দেশের ১১টি সেক্টরের সবগুলোতেই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ কমান্ড আক্রমণ জোরদার করেছে। এদিনেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি যৌথ সহযোগিতা চুক্তি সই হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, মুক্তিবাহিনী ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নেতৃত্বে থাকবে। আরোরা উভয় সরকার প্রধানকে প্রতিবেদন দেবেন জেনারেল মানেকশ'র মাধ্যমে।

এ দিনেই মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাদের মিলিত বাহিনীর আক্রমণে কুড়িগ্রাম ছেড়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। যশোর মুক্ত করার জন্য মুক্তিবাহিনী নড়াইল আক্রমণ করে হটিয়ে দেয় দখলদার পাকবাহিনীকে। এদিকে ৫ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলী ৩ বেঙ্গলের দু'টি কোম্পানি নিয়ে ছাতকে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর হামলা চালান। সারাদিন একটানা যুদ্ধের পর রাতে পাকিস্তানিরা পালিয়ে যায়। মুক্ত হয় ছাতক। চারদিকে তখন শুধু মুক্তির খবর।

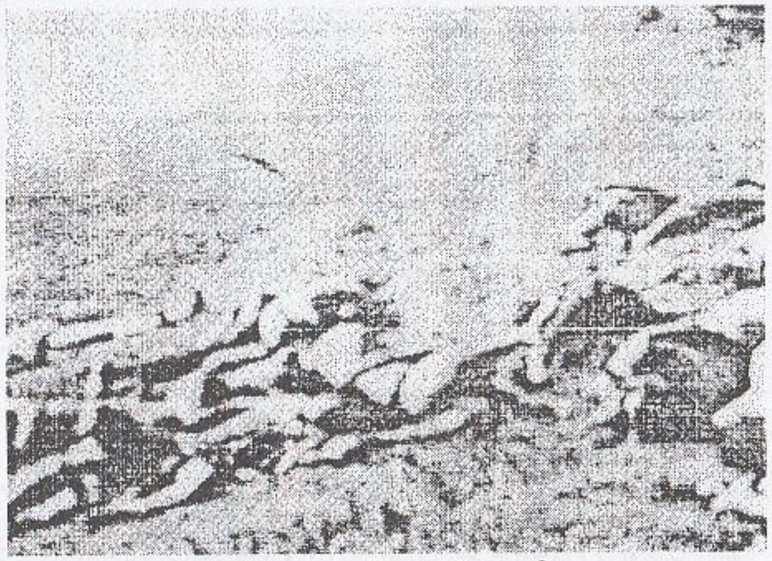


একাত্তরে অ্যাকশনে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স

শোনা যায় ০৮ ডিসেম্বরে ভারতীয় যুদ্ধবিমান ঢাকায় আক্রমণের পর থেকে সাইরেনের শব্দের সঙ্গে এখন ঢাকাবাসী কমবেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে। সাইরেন বাজলেই বাতি নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে বসে থাকার কথা ঘরের শিশুটিকেও বলে দিতে হয় না। ভারতীয় বিমানের আক্রমণ প্রতিরোধ দূরে থাক, তখন সাইরেন দিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করাও অনেক সময় সম্ভব হয় না সামরিক জান্তার পক্ষে। কবি সুফিয়া কামাল তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, কোনো খবর বা আসা-যাওয়ার কোনো উপায় নেই। সাইরেন অথবা সাইরেন ছাড়াও তেজগাঁওয়ের দিকে বিমান হামলা চলছে। এটাই এখনকার ঢাকার সঠিক চিত্র।

ডেইলি টেলিগ্রাফ এর প্রতিবেদক ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ ৮ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে লিখেছেন – বিমান হামলার সময় নিরাপদ আশ্রয় নিতে ঢাকার সাধারণ মানুষের খুব আগ্রহ নেই। কারণ ভারতীয় বিমানগুলো শুধু সামরিক অবস্থান লক্ষ করে হামলা চালাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আব্দুলাহ খান নিয়াজি ঢাকায় তাঁর মিশন শুরু করেছিলেন 'পিকনিক মুডে'। তার আফসোস, দুনিয়ার সেরা সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে এক দল বয়স্ক স্কাউটের সঙ্গে। ডিসেম্বরের ৮ আসতে না আসতে ওই সৌখিন বয়স্ক স্কাউটরাই ঘুম হারাম করে দিয়েছে নিয়াজির। অভিজ্ঞ এ যোদ্ধার কোনো হিসেবই মিলছে না এখন আর। যদিও সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুসারে সহযোদ্ধাদের মরাল হাই রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু এখন তার নিজের মরাল হাই আছে তো? এ দিনেই পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য বেতার



পরাজয় যেন ঘাতকের নিত্য সঙ্গী

মারফত পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের আহবান জানানো হলো। একই বক্তব্য দিয়ে বিমান থেকে ছাড়া হলো প্রচুর লিফলেট। ভারতের সরকারি মুখপাত্র ঘোষণা করলেন– পাকিস্তান পূর্ববাংলায় পরাজয় স্বীকার করে নিলে সব অঞ্চলেই



ভারত যুদ্ধ বন্ধ করবে। এ সময় পশ্চিম ফ্রন্টেও পাকিস্তান ভারতের হাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছে মার খেয়ে খেয়ে।

কিন্তু ৮ ডিসেম্বরে রাজধানী ঢাকায় একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করে সামরিক জান্তা। উদ্দেশ্য বেসামরিক প্রতিরক্ষা জোরদার করা। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য জনগণের প্রতি ইয়াহিয়ার আহবান প্রচারিত হচ্ছে সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে নিয়মিত বিরতিতে। আর এ প্রচারণা সামরিক জান্তার পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে ইঙ্গিত বহন করে পৌঁছার।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম সাক্ষাৎকার দেন নূরুল আমিন। দৃঢ় আস্থা নিয়ে তিনি বলেছেন– পাকিস্তান ধৈর্য ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে শত্রুর ওপর চরম আঘাত হানবে। আর উপ-প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো যাত্রা করেন সেদিন নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে, জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে। এদিকে ঢাকায় এক বিবৃতিতে শত্রু নিধনে সেনাবাহিনীকে সবরকম সহযোগিতা করতে আহবান জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর জামায়াতের আমির।

এ দিনটিতে সিলেটের এমসি কলেজ টিলায় অবস্থান নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায় মুক্তিযোদ্ধারা। দু'পক্ষের ব্যাপক গুলি বিনিময় ঘটে। এতে আট বেঙ্গলের দু'টি কোম্পানির ব্যাপক ক্ষতি হয়। অন্যদিকে হরিপুরের কাছে ডারবোস্টে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করলে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে গিয়ে আশ্রয় নেয় হরিপুরে। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে ২৩ জন রাজাকার আটক করে।

এ দিন পটুয়াখালিতে দেশের সোনার ছেলেরা পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর হামলা চালায়। টিকতে না পেরে পাকিস্তানিরা দু'টি লঞ্চে করে পটুয়াখালি ছেড়ে বরিশালের দিকে পালিয়ে আসে।

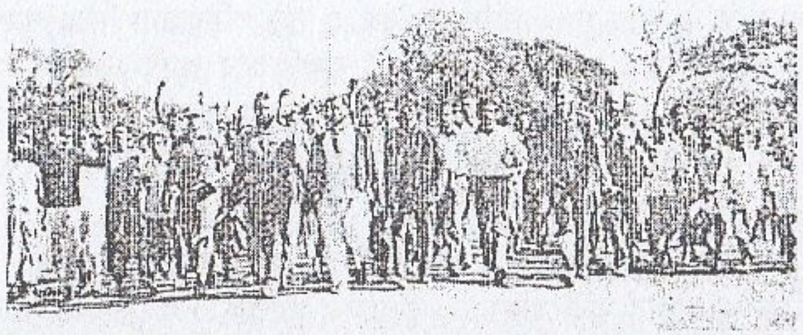
কিন্তু পালাবে কোথায় ? কোথাও না কোথাও থমকে দাঁড়াতেই হবে। জবাব দিতে হবে অত্যাচারের।

৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জলসীমার উদ্দেশ্যে রওনা হয় মার্কিন সপ্তম নৌবহর। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে দেয়া নাকি পাকিস্তান হানাদারদের মনোবল চাঙা করা?

পরাক্রমশালী সে ফ্লিটের উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হয়নি। বাঙালির মনোবল ভাঙা দূরে থাক, বেতার মারফত এ খবর প্রচার হওয়ার পর দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বাধীনতা প্রত্যাশী মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর উপর।

৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারই দাউদকান্দির পতনের মধ্য দিয়ে মুক্ত হয়ে যায় পুরো কুমিল্লা। আর দাউদকান্দির পতনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় মেঘনাতীরের অঞ্চলগুলো মুক্তির প্রক্রিয়া। দিন না পার হতেই মেঘনার পুরো পূর্বাঞ্চলসহ বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। এ দিনে মুক্ত হয় নোয়াখালি। একই দিনে স্বাধীন দেশের পতাকা উড়ে গাইবান্ধা, গাজীপুরের শ্রীপুর, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ ও নেত্রকোণায়। এ যেন মুক্ত বলাকার দল আকাশে ওড়ার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে।

৯ ডিসেম্বর ছাপা হয় নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় মুক্ত যশোর থেকে পাঠানো সংবাদ। সিডনি এইচ শনবার্গ লেখেন, বাসের ছাদে বাঙালিরা নাচছে। রাস্তায় স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছে মানুষ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা আবেগের প্রকাশ করছে। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে। বিদেশিদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে।



ময়মনসিংহ মুক্ত - গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনী শির উঁচিয়ে প্রবেশ করছে সেখানে

এ দিন পূর্ব জার্মানির নিউজ ডেসল্যান্ড এক নিবন্ধে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানোর আহবান জানায়। মালয়েশিয়া থেকে প্রকাশিত নেইইয়াং নিং পু এর প্রতিবেদনে বলা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের মানুষের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে। সংকট এখন পরিণত হয়েছে যুদ্ধে। শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় মনে হয় পার হয়ে গেছে। আর এখানে যা ঘটেছে তার জন্য ইয়াহিয়া খানই দায়ী।

দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত আগেই বন্ধ। কিন্তু সামরিক জান্তা এক ঘোষণায় এদিন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতীয় হামলার অজুহাতে বন্ধ করে দেয়। একই সঙ্গে নেয়া হয় চরম দুরভিসন্ধিমূলক এক সিদ্ধান্ত। দেশের শিক্ষকদের বেসামরিক প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত হতে হবে।

জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রতিনিধিত্বকারী পাকিস্তানি দলের নেতা মাহমুদ আলী দেশে ফিরে এসে এ-দিনে দেখা করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের উচিত বিশ্ব শান্তির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ভারতের পাশ থেকে সরে দাঁড়ানো। (সৌজন্যে : প্রথম আলো, ঢাকা, ২ ডিসেম্বর হতে ০৯ ডিসেম্বর ২০০৭)





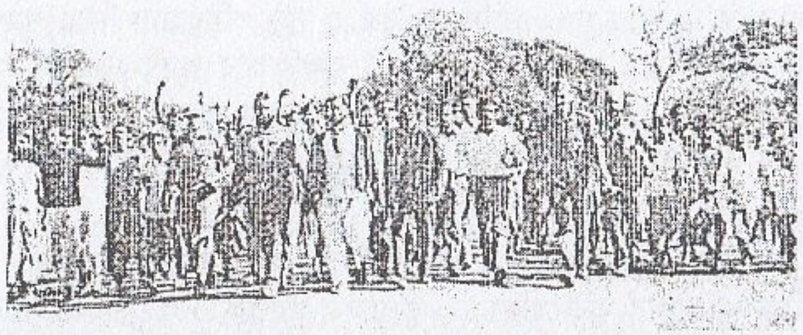
ঢাকার দিকে অগ্রসরমান ২ ইস্ট বেঙ্গল। সেদিন মাধবদী বাজার এবং ভুলতা পার হয়ে তারাবোর ঘাটে। এ বিশাল দলটি ডান দিকে সরে এগুতে থাকলো। সেখানে ওরা পেলো নদী এবং তার পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা নিরিবিলি এক শান্ত গ্রাম। শীতালক্ষ্যার পাড় ঘেঁষে দাঁড়ানো সে গ্রামেই এস-ফোর্স কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহর বাড়ি, রূপগঞ্জ নাম। মেজর মতিউরের (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) শ্বশুর বাড়িও সে গ্রামে। সন্ধ্যা নামছে। ওখানেই অবস্থান গ্রহণের হুকুম জারি করা হলো। যে যার মতো বিশ্রামের আয়োজন করছে। রাত পার হলো সাদামাটা ভাবেই শীতলক্ষ্যার পূর্ব পাড়ে। অন্যান্য দিন যে ভাবে রাত পার করেছে দলটি, অনেকটা সেভাবেই।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। সূর্যোদয়ের পরে ব্যাটালিয়নে সত্যিকারের যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হলো। রেকি করে বিভিন্ন পর্যায়ের কমান্ডারগণ প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা ঠিক করে। জোয়ানরা সে ভাবে ত্বরিত গতিতে কাজে লেগে গেলো। তৈরি হলো বাংকার। শত্রু ধ্বংসকারী গানগুলো পজিশনে গেলো, মুখ ঘুরিয়ে পিপাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো শত্রুর দিকে, নদীর অপর পাড়ে। প্রয়োজনে যুদ্ধ, শেষ বাধাকে বিচূর্ণ করে বিজয়কে করতে হবে নিশ্চিত, নিশ্ছিদ্র।

লেফটেন্যান্ট হোসেন ডাক্তার হিসেবে ঘুরে ঘুরে কোম্পানি লোকেশনে গেলেন। দেখলেন সুস্থ আছে সবাই। তার কাছে কেউই এলো না অসুস্থতার কারণে। সবাই হাসিমুখে ছুটাছুটি করে নিজের কাজ শেষ করছে। লক্ষ্য, প্রয়োজনে শত্রুর মোকাবেলা, তাদের শেষ বাধাকে বিদীর্ণ করা কঠোর আঘাতে। এটা সম্ভবত এগারোই ডিসেম্বরের কথা।

ওদিকে ছত্রী সেনা নামবে মধুপুরে কাদের সিদ্দিকীর নিরাপত্তা ছাউনির নিচে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা এসেছেন মধুপুরে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি তার সদর দপ্তরে বসে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে একটি সমর পরিকল্পনা করেছেন মধুপুরে ভারতীয় ছত্রীসেনা নামানোর জন্য। সূক্ষ্ম এ পরিকল্পনা এত কম সময়ে কাদের সিদ্দিকী বুঝতে পারবেন কিনা, এ নিয়ে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তার মনে দ্বিধা। কাদের সিদ্দিকীকে পাওয়া গেলো তাঁর ক্যাম্পেই।

৯ ডিসেম্বর ছাপা হয় নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় মুক্ত যশোর থেকে পাঠানো সংবাদ। সিডনি এইচ শনবার্গ লেখেন, বাসের ছাদে বাঙালিরা নাচছে। রাস্তায় স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছে মানুষ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা আবেগের প্রকাশ করছে। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে। বিদেশিদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে।



ময়মনসিংহ মুক্ত - গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনী শির উঁচিয়ে প্রবেশ করছে সেখানে

এ দিন পূর্ব জার্মানির নিউজ ডেসল্যান্ড এক নিবন্ধে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানোর আহবান জানায়। মালয়েশিয়া থেকে প্রকাশিত নেইইয়াং নিং পু এর প্রতিবেদনে বলা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের মানুষের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে। সংকট এখন পরিণত হয়েছে যুদ্ধে। শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় মনে হয় পার হয়ে গেছে। আর এখানে যা ঘটেছে তার জন্য ইয়াহিয়া খানই দায়ী।

দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত আগেই বন্ধ। কিন্তু সামরিক জান্তা এক ঘোষণায় এদিন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতীয় হামলার অজুহাতে বন্ধ করে দেয়। একই সঙ্গে নেয়া হয় চরম দুরভিসন্ধিমূলক এক সিদ্ধান্ত। দেশের শিক্ষকদের বেসামরিক প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত হতে হবে।

জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রতিনিধিত্বকারী পাকিস্তানি দলের নেতা মাহমুদ আলী দেশে ফিরে এসে এ-দিনে দেখা করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে। পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের উচিত বিশ্ব শান্তির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ভারতের পাশ থেকে সরে দাঁড়ানো। (সৌজন্যে : প্রথম আলো, ঢাকা, ২ ডিসেম্বর হতে ০৯ ডিসেম্বর ২০০৭)





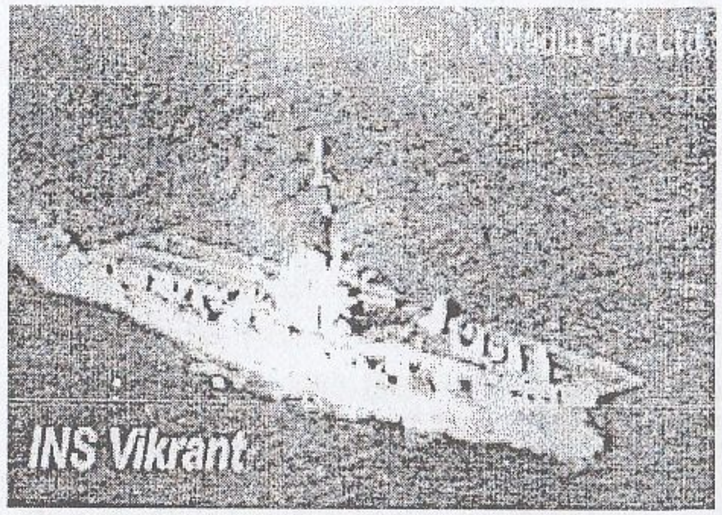
ঢাকার দিকে অগ্রসরমান ২ ইস্ট বেঙ্গল। সেদিন মাধবদী বাজার এবং ভুলতা পার হয়ে তারাবোর ঘাটে। এ বিশাল দলটি ডান দিকে সরে এগুতে থাকলো। সেখানে ওরা পেলো নদী এবং তার পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা নিরিবিলি এক শান্ত গ্রাম। শীতালক্ষ্যার পাড় ঘেঁষে দাঁড়ানো সে গ্রামেই এস-ফোর্স কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহর বাড়ি, রূপগঞ্জ নাম। মেজর মতিউরের (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) শ্বশুর বাড়িও সে গ্রামে। সন্ধ্যা নামছে। ওখানেই অবস্থান গ্রহণের হুকুম জারি করা হলো। যে যার মতো বিশ্রামের আয়োজন করছে। রাত পার হলো সাদামাটা ভাবেই শীতলক্ষ্যার পূর্ব পাড়ে। অন্যান্য দিন যে ভাবে রাত পার করেছে দলটি, অনেকটা সেভাবেই।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। সূর্যোদয়ের পরে ব্যাটালিয়নে সত্যিকারের যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হলো। রেকি করে বিভিন্ন পর্যায়ের কমান্ডারগণ প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা ঠিক করে। জোয়ানরা সে ভাবে ত্বরিত গতিতে কাজে লেগে গেলো। তৈরি হলো বাংকার। শত্রু ধ্বংসকারী গানগুলো পজিশনে গেলো, মুখ ঘুরিয়ে পিপাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো শত্রুর দিকে, নদীর অপর পাড়ে। প্রয়োজনে যুদ্ধ, শেষ বাধাকে বিচূর্ণ করে বিজয়কে করতে হবে নিশ্চিত, নিশ্ছিদ্র।

লেফটেন্যান্ট হোসেন ডাক্তার হিসেবে ঘুরে ঘুরে কোম্পানি লোকেশনে গেলেন। দেখলেন সুস্থ আছে সবাই। তার কাছে কেউই এলো না অসুস্থতার কারণে। সবাই হাসিমুখে ছুটাছুটি করে নিজের কাজ শেষ করছে। লক্ষ্য, প্রয়োজনে শত্রুর মোকাবেলা, তাদের শেষ বাধাকে বিদীর্ণ করা কঠোর আঘাতে। এটা সম্ভবত এগারোই ডিসেম্বরের কথা।

ওদিকে ছত্রী সেনা নামবে মধুপুরে কাদের সিদ্দিকীর নিরাপত্তা ছাউনির নিচে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা এসেছেন মধুপুরে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি তার সদর দপ্তরে বসে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে একটি সমর পরিকল্পনা করেছেন মধুপুরে ভারতীয় ছত্রীসেনা নামানোর জন্য। সূক্ষ্ম এ পরিকল্পনা এত কম সময়ে কাদের সিদ্দিকী বুঝতে পারবেন কিনা, এ নিয়ে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তার মনে দ্বিধা। কাদের সিদ্দিকীকে পাওয়া গেলো তাঁর ক্যাম্পেই।

পুরো পরিকল্পনাটি বর্ণনা করে থামলেন উক্ত সেনা কর্মকর্তা। জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন সামনের একহারা লম্বা মানুষটির দিকে। দুরন্ত সাহসী এ মানুষটি ততদিনে বাঘা সিদ্দিকী বলে খ্যাতিমান। কাদের দৃঢ়তার সাথে বললেন, আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু করা হয়েছে। সামরিক মানচিত্রের দিকে নির্দেশ করে তিনি বললেন– আপনাদের ছত্রী বাহিনী মধুপুরের এ জায়গায় এক্ষুনি নামতে পারে। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই ওই ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা পুরো বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তরে বার্তা পাঠালেন।




মিত্রবাহিনী সক্রিয় সমুদ্রেও– অ্যাকশনে যুদ্ধ জাহাজ ভিকরান্ত

একাত্তরের ১১ ডিসেম্বর ৭০০ ছত্রীসেনা কাদের সিদ্দিকীর নিয়ন্ত্রিত মধুপুরে নিরাপদে অবতরণ করলো। পাকিস্তানি ব্রিগেডের সঙ্গে যৌথ কমান্ডের ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয় এদিনে। হতবিহবল পাকবাহিনী সাহায্যের আবেদন জানাতে থাকে ঢাকা সদর দপ্তরে। শোনা গেলো আজই চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ও উপকূলীয় অবকাঠামো, জাহাজ, নৌযান ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমান ও যুদ্ধজাহাজের চূড়ান্ত তৎপরতাও শুরু করেছে।

একের পর এক এলাকা হাতছাড়া হচ্ছে দেখে ঢাকাকে নিরাপদ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি। মুক্তিবাহিনীর তাড়া খেয়ে পাকিস্তানি সেনারা তখন সবাই ঢাকা মুখী। ঠিক তেমনি সময়ে ঢাকা বিমানবন্দর পরিদর্শন করেছেন নিয়াজি। অনুগত সেনাদের সাহস জোগানোর জন্য বললেন, যে কোনো মূল্যে শত্রুকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ ঢাকা থেকে তাদের রাখতে হবে দূরে।

ভারতীয় ১৯ রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানি আশুগঞ্জের অপর পারে অবতরণ করেছে। ভৈরব সেতুর ভৈরবসংলগ্ন অংশ বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামালপুর শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের অবরোধ কোনোভাবে ভাঙতে না পেরে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট। চট্টগ্রামে



বিকেল থেকে ৪ ইস্ট বেঙ্গলের দু'টি দল ফটিকছড়ির হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। গভীর রাতে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিছানাপত্র রেখে এক সময় পালাতে বাধ্য হয় হানাদার বাহিনীর সদস্যরা।

আজ যুক্তরাজ্যের ওয়ার্কার্স প্রেস পত্রিকায় চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো খবরে বলা হয়েছে, পূর্ববাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পালাচ্ছে। ইয়াহিয়া বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, পাকিস্তান বাহিনী সেখানে গণহত্যায় মেতে উঠছে। যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসায় পাকিস্তানি সেনারা বেসামরিক মানুষের ওপর আবারও হামলে পড়েছে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর যুগপৎ আক্রমণে হানাদার ঘাতকদের দল দিশেহারা। পাকিস্তানের মিত্ররা যুদ্ধবিরতির জন্য তৎপর। যুক্তরাষ্ট্রে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র রেনাল্ড জিগলার বললেন – জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নেয়া ভারত-পাকিস্তান উভয়ের জন্যই আবশ্যক। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট নিক্সন এ ব্যাপারে নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিসিঞ্জারের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। (দৈনিক প্রথম আলো - ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ এর সৌজন্যে)



২ ইস্ট বেঙ্গল ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেমরার পশ্চিমে বালু নদীর অপরপারে শক্ত অবস্থান নিয়ে থাকলো। এ ক'দিনে যোদ্ধাদের পরিকল্পনা ছিল :

১। নিজের অবস্থান মজবুত করা।

২। বালু নদীর বাধাকে অতিক্রম করা।

৩। হানাদারদের সাথে দালান কোঠার আড়ালে যুদ্ধ করা।

শেষ পয়েন্টটা কেন আসলো? এ জন্য যে ডেমরা এবং পাশ্ববর্তী এলাকা, সত্যিকার বলতে পুরোটাই তো বিল্ট আপ এরিয়া। এখানকার যুদ্ধের কৌশল সাধারণ রণাঙ্গনের মতো হবার নয়। ভেবে ভেবে অনেকেই শংকিত হচ্ছিল যে, এ শেষ যুদ্ধে ঢাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে যাবে। ক্ষয়ক্ষতি তো ইতোমধ্যে হয়েছে অনেক। আরো ক্ষতি হলে তা পুষিয়ে নিতে বাংলাদেশকে বেগ পেতে হবে বেশ।

ব্যাটালিয়নের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে স্বাভাবিক যুদ্ধ প্রস্তুতি অব্যাহত রইলো। দেখতে দেখতে ষোলোই ডিসেম্বরের ভোরকে আলিঙ্গন করলো ২ ইস্ট বেঙ্গল। কুয়াশার বাঁধন ভেঙে সূর্য উঁকি দিয়েছে। আড়মোড়া ভাঙছে পৃথিবী। হঠাৎ দেখা গেলো এই ব্যাটালিয়নের উভয় পার্শ্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী অবস্থান নিচ্ছে। এরা সেই হেলিবর্ন গ্রুপ যারা নরসিংদি আর মাধবদির মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানে অবস্থান নিয়েছিল। উদ্দেশ্য, To find out a suitable place for concentration before final assault on to Dhaka. যে দিন ২ ইস্ট বেঙ্গল বি.বাড়িয়া থেকে ভৈরবের দিকে অগ্রসর হয় তখন এদের চলাচল দেখতে পেয়েছিল ওরা। শত্রুর গর্জে উঠা কামান তাদের নাগাল পাচ্ছে না। দল বেঁধে একের পর এক উড়ে যাচ্ছে চপার, কড়কড় শব্দে মুখর করে তুলছে পরিবেশ।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এরই মধ্যে বাংলার আকাশ পুরোপুরি শত্রুমুক্ত। নির্দ্বিধায় উড়ে বেড়াচ্ছে মিত্রবিমান, যেখানে সেখানে। হাজার হাজার লিফলেট উড়ছে ঢাকার আকাশে বিগত চার পাচ দিন ধরে। রেডিওতে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ আহবান। মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনী চাচ্ছে রক্তপাতহীন বিজয়। মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চলছে পাশাপাশি। পাকিস্তানি সাধারণ সৈনিকেরাও যাতে বুঝতে পারে সে জন্য তাদের ভাষাতেই অস্ত্র সমর্পণ আহবান ঘোষণা করা হচ্ছে রেডিওতে বার বার। একই সাথে ঢাকার আকাশের উপর দিয়ে সে দিনের যুদ্ধ বিমান ডিগবাজি খেতে খেতে উড়ে যাচ্ছে চোখের আড়ালে। শোনা গেলো ভারতীয় বিমানবাহিনী শত্রুর অবস্থান নড়বড়ে করে দেয়ার জন্য প্রয়োজনে আরো বোমা বর্ষণ করবে। তবে, তখনও বোঝা যায়নি যে সহজে সারেন্ডার করবে পাকিস্তানিরা। কেবল ষোলোই ডিসেম্বরের ভোর থেকেই জোর গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে - ঘনিয়ে আসছে সারেন্ডার, হানদারদের শক্তি আর মনোবল ভাঙনের মুখোমুখি। As per intelligence report Pakistani Army will not be able to sustain combined assault on Dhaka.

ষোলোই ডিসেম্বর দিনের সূর্য আলোর বৃষ্টি ছড়াতে শুরু করেছে। তখন বাড়ন্ত বেলা। যদিও সূর্য ডানে ঢলে যায়নি। শোনা গেলো পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত। তখন এক ধরনের আনন্দ আর উৎকণ্ঠায় পেয়ে বসলো অনেককেই। সে এক মিশ্র অনুভূতি। একটানা নয় মাস যুদ্ধের পর বিজয় এখন দ্বার প্রান্তে।

যদি হানাদার বাহিনী পরাজয় মেনে নেয়, অস্ত্র সমর্পণ করে, আজকেই হবে চূড়ান্ত বিজয়। ভাবতেই যোদ্ধাদের আনন্দ ধ্বনি উঠল মনের গভীরে। আর যদি তা না হয় ধ্বংস আর শুধু রক্তপাতের নগরী হতে পারে ঢাকা!

শীতলক্ষ্যার পূর্বপারে পশ্চিমে হেলে গেছে সূর্য। সতর্ক সৈনিকদেরও ক্ষুধা আছে। ওরা খেতে বসেছে তখন। দু'টো কিংবা আড়াইটা হবে। সবে খানা পরিবশেন করা হচ্ছে অফিসারদের। এমন সময় ওয়্যারলেসে এক টুকরো মেসেস ভেসে আসল। Pakistani surrender is settled. Move to Dhaka.



আর যায় কোথা! পুরো ব্যাটালিয়ন আনন্দে নেচে উঠলো। আর কিসের খাবার। অনেকেই খেলেন না। বিজয়ের অনুভূতি তখন ওদের রক্তে ডেকে উঠেছে আনন্দের বান। হুকুম হলো- ঢাকা চলো। অল্পক্ষণেই পুরো ব্যাটালিয়ন সজ্জিত হয়ে গেলো। শুরু হলো যাত্রা।

ন'মাস ধরে অস্থিতি এবং যুদ্ধের ধকলের পর নিজের ঘরে ফেরার যে সে কি আনন্দ সেদিনের যোদ্ধারাই কেবল বলতে পারবে। বলতে পারবে ঘর ছাড়া মানুষেরা, নিজের সব হারিয়ে যারা প্রবাসে উদ্বাস্তু। ফিরছে ন'মাসের যুদ্ধের ক্ষত বুক নিয়ে, হারাবার মাঝেও ফিরে পাবার আনন্দ নিয়ে। নতুন করে ঘরে ফেরার অনুভুতি নিয়ে। আকাশে পাখা মেলে দুরন্ত মেঘের মতো করে বলতে ইচ্ছে করছে – আমরা বিজয়ী, আমরা স্বাধীন। পদ্মা আর মেঘনার বৈশাখি ঢেউয়ের মতো উত্তাল হয়ে বলতে ইচ্ছে করছে– এ আমার স্বাধীন দেশ, এ আমার বাংলাদেশ!

২ ইস্ট বেঙ্গল ভুলতা বাজার অতিক্রম করে তারাবো ঘাটের দিকে অগ্রসর হলো। ঐ ঘাট ছাড়া স্বাভাবিক পারাপার সম্ভব নয়। নদীর পশ্চিম পাড়েই ডেমরা। সবাই যখন ঘাটে পৌঁছলো তখন বেলা পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। দেখা গেলো খেয়া নৌকাগুলো ছেড়ে দিয়েছে পাকিস্তানিরা। এরই মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল ট্রুপ্স্ (troops) জড়ো হয়েছে ঘাটে। ওরা সবাই নৌকায় করে পার হলো নদী। তরতর করে বয়ে যাওয়া স্রোতের মতো সহজ ভঙ্গিতে। একে একে সবাই নামলো ঘাটে। দৃপ্ত পদক্ষেপ উঠে এলো উপরে, বিজয়ের পদচিহ্ন এঁকে এঁকে, বালুর তীরের নরম বালুতে। ওদের পায়ে গ্রিক যোদ্ধার অশ্বের গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, যারা যোদ্ধাদের সাথে এতোদিন মুখোমুখি অবস্থানে ছিলো লড়াইয়ের জন্য, তারাও ফুল ব্যাটেল ড্রেসে রাস্তার দু'পাশে দণ্ডায়মান। ওদের চার কি পাঁচজন অফিসার এগিয়ে এসে মুক্ত বাংলার গর্বিত অফিসারদের স্যালুট করলো। তারা মেজর, ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার। সবাই হাত বাড়ালো হ্যান্ডশেক করার জন্য। যোদ্ধাদের অনেকেই হ্যান্ডশেক করলেন কিন্তু মেজর মঈন মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চোখে মুখে তার ক্ষোভ স্পষ্ট। তার ব্যক্তিগত অপছন্দের অভিব্যক্তি তিনি লুকাবার কোনো চেষ্টাই করলেন না।

মেজর মঈনের ধারালো আচরণে কোনো একজন পাকিস্তানি অফিসার বললো – Don't take it personal. We fought because we were asked to fight. It was a decision of the leaders and politicians. We just carried out their orders.

কিন্তু ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর মঈনের আচণের কোনো হেরফের হলো না। দেখতে দেখতে ক'জন ভারতীয় অফিসারও এসে জয়েন করলো ২ ইস্ট বেঙ্গলের সাথে। তারা ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের সাথে আলাপ করলো। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো সবাই ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হবে।

তখন প্রায় চার কি সাড়ে চারটা। বাংলাদেশের শীতের বিকেল। দ্রুত তাপ হারাচ্ছে সূর্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই রঙ বদলাতে শুরু করবে আকাশ। কিন্তু ফৌজি জীবনের এ এক শিক্ষা। যে কথা সেই কাজ। এবার সবাই মিলে ঢাকা চলো।

কিন্তু প্রশ্ন এলো কিভাবে যাবে ওরা ঢাকায়? এতো গাড়ি নেই। তো সিদ্ধান্ত এলো দ্রুত এবং নিখুত। Move on foot.

সাথে সাথে ব্যাটালিয়নের সবাই হাঁটা শুরু করলো ঢাকার দিকে। দু'পাশে পাকিস্তানি মিলিটারি, মধ্যখানে বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধার দল or otherwise। ওদের অফিসারেরা আমাদের অফিসারদের সাথে হাঁটলো না। হতে পারে হ্যান্ডশেক না করার জন্য তারা মনক্ষুণ্ন হয়েছে অথবা নির্দেশই হয়ত এমন যে তারা যার যার কোম্পানির সাথে হাঁটবে। ভারতীয়রাও মুভ করছে একই সাথে তবে অন্য পথ ধরে।

হাঁটতে হাঁটতে যখন টিকাটুলি পর্যন্ত যোদ্ধারা পৌঁছল তখন সন্ধ্যা। ঢাকায় যত্রতত্র গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। স্পষ্টতই বুঝা যায় ফূর্তিবাজ ছেলেদের কাজ। সেই ফূর্তিবাজ ছেলেদের ছোঁয়া কি পুরো ব্যাটালিয়নে লাগলো? নয়তো কি?

তা না হলে পুরো ব্যাটালিয়ন হঠাৎ করে বন্দুকের নল উঁচিয়ে আকাশের দিকে গুলি ছুড়লো একসাথে কি করে? এতোগুলো গান একবারে ফায়ার করায় চারদিক কেঁপে উঠলো। ঢাকার নীরবতা খান খান হয়ে ভেঙে গেলো কড় কড় কড়াৎ শব্দে। ঝটপট বন্ধ হয়ে গেলো এলাকার সব ঘরের বাতি। চারদিকে নেমে এলো অন্ধকার। স্পষ্টতই বুঝা গেলো, সাধারণ মানুষ যুদ্ধের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে আছে।

কমান্ডিং অফিসার রাগী মানুষ। ক্ষেপে গেলেন তিনি। বকলেন আচ্ছা করে সবাইকে। পুরো ব্যাটালিয়নকে নিল ডাউন (Kneel Down) করালেন রাস্তায়। তারপর তাঁর রাগ প্রশমিত হলো খানিকটা। সাধারণ কিছু সাজার পরে ব্যাটালিয়ন আবার চলতে শুরু করলো। এবার লক্ষ্য হলো ঢাকা স্টেডিয়াম। যখন ব্যাটালিয়ন সাজা দিতে রাস্তায় কিছুটা দেরি করলো সেই ফাঁকে পাকিস্তানিরা এগিয়ে গেলো সামনে। ওরাও যাবে স্টেডিয়ামে। কারণ ওখানে আত্মসমর্পণের স্বাক্ষর করেছে বিজিত সেনানায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি।

পাকিস্তানি সমর নায়কদের আত্মসর্মপণের বিষয়টি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তাই এর খানিকটা বিস্তারিত অলোচনায় আসা উচিৎ।

ডিসেম্বরে যৌথ বাহিনীর আক্রমণে হানাদারেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। পরাজয় এবং রক্তের বন্যা যখন দ্বার প্রান্তে উপস্থিত তখন জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানি সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদের সাথে আলাপ করেন যাতে শেষ রক্ষার জন্য যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করা হয়। এটা ১৩/১৪ ডিসেম্বরের সন্ধিক্ষণের কথা। ১৪ ডিসেম্বর নিয়াজী ইয়াহিয়ার কাছ থেকে এক বার্তায় এ ব্যাপারে সম্মতি লাভ করেন।



এ বার্তা পেয়ে রাও ফরমান আলী ইউএনও কনসাল জেনারেল হার্বাট স্পিভ্যাকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিষয়টি জাতিসংঘের আওতাভুক্ত না হবার কারণে স্পিভ্যাক উৎসাহ দেখাননি। তবে রাও ফরমান আলীর দেয়া যুদ্ধ বিরতির শর্তাবলিসহ একটি বার্তা পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ওয়াশিংটনে পাঠান বলে অনুমতি হয়। ১৪ ডিসেম্বর বিকাল পাঁটটার দিকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেএফআর জ্যাকব কলকাতাস্থ একজন কূটনীতিকের



ভারতীয় সি-ইন-সি জেনারেল মানেকশ

মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারেন এবং তাদের কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল মানেকশকে বিষয়টি অবহিত করেন। জেনারেল মানেকশ এ বিষয় বার্তা পান ১৫ ডিসেম্বর। পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মানেকশ রাজি হন। এ ব্যাপারে পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডকে ফোর্ট উইলিয়ামের ইস্টার্ন কমান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন তিনি। নিয়াজী তাঁর আত্মসমর্পণ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লাভ করেন। কাজেই ১৫ ডিসেম্বর বিকাল থেকে আলোচনা ও মতবিনিময় যোগাযোগ শুরু হয়। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ন'টার মধ্যে আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা থাকলেও তা সম্ভবপর হয়নি বলে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়।

জেনারেল মানেকশ'র নির্দেশ অনুযায়ী জেনারেল জেকব ঢাকায় আসেন এবং পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেকবের সাথে কর্নেল খারা (ইনটেলিজেন্স) এবং এয়ার কমোডর পুরুষোত্তমও ঢাকায় আসেন। তবে সিদ্ধান্ত হয় ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাবাহিনী প্রধান, নৌ বাহিনী প্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধান আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। আর বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান কর্নেল ওসমানী ও উইং কমান্ডার খন্দকার থাকবেন সেখানে। জেনারেল জেবক যখন হেলিকপ্টারে ঢাকায় আসেন তখন তাঁকে বিমানবন্দরে গ্রহণ করেন পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ডের



জেনারেল জেকব

চীফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী। জেনারেল জেকব তার সহকর্মীদের নিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীর সদর দপ্তরে আসেন। নিয়াজীর সাথে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল জামশেদ, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ, বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার কমোডর ইমাম ও ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী। জেনারেল নিয়াজীকে কর্নেল খারা আত্মসমর্পণের শর্তাবলি পড়ে শোনান। নিয়াজীর চোখে তখন শিশুর কান্না।



আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারতীয় বাহিনী পৌছে গেলো ঢাকায় – তাদের মাঝে মলিন মুখে নিয়াজি

রাও ফরমান আলী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু আসলে ওদের পায়ের তলায় তখন একটুকরো মাটিও নেই। না করার উপায় কোথায়। বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় 'হ্যাঁ' বলা এবং শেষ পর্যন্ত নিয়াজী মুখে হ্যাঁ না বললেও তার নীরব চাউনি 'হ্যাঁ'কেই বুঝিয়ে দিল। জেনারেল জেকব নিয়াজীর একটা প্রস্তাব মানলেন। যেমন ঢাকায় যথেষ্ট ভারতীয় বাহিনী উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানিদের নিরস্ত্র করা হবে না। কারণটা একজন শিশুও বুঝবে। ওরা যে নিপীড়ন করেছে নিরস্ত্র বাঙালির উপর একবার হাতের আওতায় পেলে তাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলাটাই স্বাভাবিক। বরং অস্বাভাবিক হবে স্বাভাবিক এবং মানবিক আচরণ করা।



বিকেল চারটার দিকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরা এবং তাঁর সফর সঙ্গীরা পাঁচটি এম আই ও চারটি অ্যালুয়েট চপারে করে ঢাকায় পৌছলেন। আত্মসমর্পণের স্থান নির্ধারণ করা হয় রেসকোর্সকে। আমাদের স্বাধীনতার অভিযাত্রা এখানেই শুরুআর এখানেই সামরিক জান্তার পরাজয়ের শেষ স্বাক্ষর



আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন জেনারেল নিয়াজি

থেকে যাবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে গার্ড অব অনার দেয়া হলো আরোরাকে। গার্ড অব অনার পরিদর্শনের পর আরোরা এবং নিয়াজী টেবিলের দিকে এগিয়ে যান। জেনারেল আরোরার নিয়ে আসা ঐতিহাসিক দলিল টেবিলের উপর রাখা হলো, তার উপর পরাজয়ের শেষ স্বাক্ষর করলেন নিয়াজী।



ইতিহাস ক্ষমাহীন - আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন
জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজী

তারপর সই করলেন আরোরা। এরপর নিয়াজী তাঁর উঁচু কাঁধ থেকে অ্যাপোলেট খুলে ফেললেন। ৩৮ ক্যালিবরের রিভলবার সমর্পণ করলেন আরোরার কাছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চিকি চিক করে উঠলো নিয়াজীর দুই চোখ। এ যেন পাকিস্তানের হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়া, তাদের সীমাহীন অপরাধের জন্য। সত্যের শাশ্বত বিজয় – পরাজয়ের দলিলে স্বাক্ষর করলেন জেনারেল নিয়াজী।

পাকিস্তানের সারেন্ডার অনুষ্ঠান ২ ইস্ট বেঙ্গল দেখতে পারল না। কেননা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তখন ওরা ডেমরা থেকে ঢাকার পথে পায় দল চলছে। তবে তার কিছু নমুনা ওরা হাঁটার সময় পথে পথেই টের পেয়েছে। বিভিন্ন ডাইরেকশন থেকে হেলিকপ্টার আসছে ঢাকার দিকে, আবার ফিরেও যাচ্ছে।

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল





এক সময় ২ ইস্ট বেঙ্গল স্টেডিয়ামের কাছে এসে পৌঁছলো। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হলো না ওদের। শেষে স্থান নিতে হলো সেদিনের জিন্নাহ এভিনিউ'র (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ) মেইন গেটের কাছে। সে সময় ঢাকার চার্জে ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার। তিনিই সব কো-অরডিনেট করছিলেন। যাক, ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দেখল ওরা ঢাকার মাটিতে। ব্যাটালিয়নের জোয়ানরা এসে যে যার মতো হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করলো। এস-ফোর্স কমান্ডার কোথাও চলে গেলেন। অধিনায়ক মেজর মঈন, উপ-অধিনায়ক মেজর মতিউর, ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ, লেফটেন্যান্ট সাঈদ, লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম এরা সবাই বসে গল্প শুরু করেলেন। ঐ সময় সব চেয়ে বেশি দরকার খাবার, পরিশ্রান্ত সৈনিকদের জন্য। কেননা ব্যাটালিয়নের কুক হাউজে আসতে এবং রান্না হতে সময় লাগবে। ঐ রাতে রান্না করা খাবার জোয়ানদের দেয়া সম্ভব নয় সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ব্যাটালিয়নের ডাক্তার লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ঐ হাসপাতালের রোগীদের খাদ্য সরবরাহের উৎস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তিনি। কাজেই তিনিই উৎসাহ নিয়ে বলে ফেললেন - Possibly I can arrange some food. সহকর্মী ও সিনিয়রগণ সম্মতি দিয়ে তাকে বললেন – Then try.

হোসেনের কনফিডেন্স ছিল হাসপাতাল এবং এর রোগীদের খাবারের ঠিকাদারের কথা ভেবে। আটশ' থেকে বারশ' রোগীর নাস্তার জন্য রোজ রাতেই স্টুয়ার্ট রুটি পৌঁছে দেয় হাসপাতালে। সুযোগের সৎ ব্যবহার করা যেতে পারে বৈকি। কিন্তু তিনি যাবেন কিভাবে? ঢাকা যে অন্ধকারে ডুবে আছে তখন। যানবাহনও নেই। শরীরের ভার বয়ে বেড়াচ্ছে মাত্র দু'টো পা, খালি পেটে।

শেষে তিনি দু'জন প্যারামেডিককে সাথে করে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ দেখা গেলো নবাবপুরের দিক থেকে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। এ যেন চৈত্রের দুপুরের হঠাৎ আসা ঝম ঝমে বৃষ্টি। হাত উঁচু করে তিনি থামালেন গাড়িটা। দেখলেন একটা জিপ। ওদেরকে দেখে ড্রাইভার কেঁপে উঠল। একা একাই বলতে শুরু করলো– স্যার, এটা ডিসি পুলের গাড়ি। একটা ডিউটি করে ফিরছি। আমাকে ডিসি সাহেব পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর ড্রাইভার। কিন্তু লে.

পাকিস্তানের সারেন্ডার অনুষ্ঠান ২ ইস্ট বেঙ্গল দেখতে পারল না। কেননা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তখন ওরা ডেমরা থেকে ঢাকার পথে পায় দল চলছে। তবে তার কিছু নমুনা ওরা হাঁটার সময় পথে পথেই টের পেয়েছে। বিভিন্ন ডাইরেকশন থেকে হেলিকপ্টার আসছে ঢাকার দিকে, আবার ফিরেও যাচ্ছে।

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল





এক সময় ২ ইস্ট বেঙ্গল স্টেডিয়ামের কাছে এসে পৌঁছলো। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হলো না ওদের। শেষে স্থান নিতে হলো সেদিনের জিন্নাহ এভিনিউ'র (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ) মেইন গেটের কাছে। সে সময় ঢাকার চার্জে ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার। তিনিই সব কো-অরডিনেট করছিলেন। যাক, ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দেখল ওরা ঢাকার মাটিতে। ব্যাটালিয়নের জোয়ানরা এসে যে যার মতো হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করলো। এস-ফোর্স কমান্ডার কোথাও চলে গেলেন। অধিনায়ক মেজর মঈন, উপ-অধিনায়ক মেজর মতিউর, ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ, লেফটেন্যান্ট সাঈদ, লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম এরা সবাই বসে গল্প শুরু করেলেন। ঐ সময় সব চেয়ে বেশি দরকার খাবার, পরিশ্রান্ত সৈনিকদের জন্য। কেননা ব্যাটালিয়নের কুক হাউজে আসতে এবং রান্না হতে সময় লাগবে। ঐ রাতে রান্না করা খাবার জোয়ানদের দেয়া সম্ভব নয় সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ব্যাটালিয়নের ডাক্তার লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ঐ হাসপাতালের রোগীদের খাদ্য সরবরাহের উৎস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তিনি। কাজেই তিনিই উৎসাহ নিয়ে বলে ফেললেন - Possibly I can arrange some food. সহকর্মী ও সিনিয়রগণ সম্মতি দিয়ে তাকে বললেন – Then try.

হোসেনের কনফিডেন্স ছিল হাসপাতাল এবং এর রোগীদের খাবারের ঠিকাদারের কথা ভেবে। আটশ' থেকে বারশ' রোগীর নাস্তার জন্য রোজ রাতেই স্টুয়ার্ট রুটি পৌঁছে দেয় হাসপাতালে। সুযোগের সৎ ব্যবহার করা যেতে পারে বৈকি। কিন্তু তিনি যাবেন কিভাবে? ঢাকা যে অন্ধকারে ডুবে আছে তখন। যানবাহনও নেই। শরীরের ভার বয়ে বেড়াচ্ছে মাত্র দু'টো পা, খালি পেটে।

শেষে তিনি দু'জন প্যারামেডিককে সাথে করে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ দেখা গেলো নবাবপুরের দিক থেকে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। এ যেন চৈত্রের দুপুরের হঠাৎ আসা ঝম ঝমে বৃষ্টি। হাত উঁচু করে তিনি থামালেন গাড়িটা। দেখলেন একটা জিপ। ওদেরকে দেখে ড্রাইভার কেঁপে উঠল। একা একাই বলতে শুরু করলো– স্যার, এটা ডিসি পুলের গাড়ি। একটা ডিউটি করে ফিরছি। আমাকে ডিসি সাহেব পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর ড্রাইভার। কিন্তু লে.

হোসেন ড্রাইভারের কথার জবাবে কোনো কথা বললেন না। কেবল জিজ্ঞেস করলেন – পেট্রোল আছে? ড্রাইভার তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লো। বললো – আছে স্যার।

ওটাই তখন দরকার ছিল। ফুয়েল এবং জিপ পেয়ে গেলো ওরা। কাজেই কোনো কথা না বলে দু'জন প্যারামেডিককে সঙ্গে করে জিপে চেপে বসলেন হোসেন। চললেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের দিকে। অন্ধকারের বুকে গাড়ির উজ্জ্বল আলো ওদের জন্য পথের দিশা দিলো সহজেই। তখনকার দিনের জিন্নাহ অ্যাভিনিউ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ দূরে নয়। তার উপর রাস্তাও একদম ফাঁকা। মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে পৌঁছে গেলো ওরা।

What a surprise! বেশ কিছু পরিচিত লোকজন ও ডাক্তার পেয়ে গেলেন হোসেন। ওরাও বেজায় খুশি। ফেলে আসা বিদ্যাপিঠের অনেকেই এলো হোসেনের সাথে দেখা করতে। তাদের মধ্যে দু'একজন লেডি ডক্টরও ছিলেন। সবার মুখেই কথার খই ছুটছে। আনন্দের বন্যা যেন বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। একে অন্যের সাথে কুশল বিনিময় করছে। কেউ কেউ আবার হাত ধরে থাকলো অনেকক্ষণ। হারাবার মাঝে ফিরে পাবার আনন্দের এ এক অপার অনুভব।

সেদিন জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত ডাক্তার ছিলেন ডা. আদিল, হোসেনের সিনিয়র বলে তাকে ভাই বলে ডাকতেন তিনি। ডা. আদিল তো রীতিমতো হৈ চৈ জুড়ে দিলেন। কি প্রয়োজনে এসেছেন হোসেন তা-ই বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। শেষে ডা. আদিলকে বললেন - I will come and talk to you tomorrow. But I have come today with a job to do. শেষে উনি জানতে চাইলেন কী কাজ নিয়ে সেখানে গেছেন হোসেন। জবাবে তিনি বললেন – স্টুয়ার্টকে দরকার।

সব বন্ধুরাই উৎসাহী। সবাই ওদের সাহায্যে করতে তৎপর। ওয়ার্ডবয় ছুটলো স্টুয়ার্টকে খুঁজতে। কিছুক্ষণ পর এসে জানালো, সে বাসায় চলে গেছে। তখন খোঁজা হলো স্টুয়ার্টের অনুপস্থিতিতে যে কাজ করে তাকে। ২য় জনকে পাওয়া গেলো। সে এসে হাজির। তাকে হোসেন বললেন – আমাদের শ্রান্ত সৈনিকদের জন্য ব্রেড দরকার। সে জবাবে বললো – স্যার, ব্রেড নেই। গত ক'দিন ধরে আমরা ভাত রান্না করে ভোরের নাস্তা সারছি। শেষে হোসেন ওকে নিয়েই সদলবলে চললেন স্টুয়ার্টের বাসায়।

এরই মধ্যে কেউ একজন এসে বললো – অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অব সার্জারী, প্রফেসর জামান হোসেনকে ডাকছেন। উনি হোসেনের শিক্ষক। ব্যস্ততার মাঝেও শিক্ষকের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না তিনি। হোসেন প্রফেসর জামানকে যেয়ে পেলেন রেডিওলোজী ডিপার্টমেন্টে। এক্সরে মেশিনের ফাঁক ফোকরে সপরিবারে ঠাঁই নিয়েছেন তিনি। যোদ্ধাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন রাশভারি প্রফেসর। একাত্তরের যোদ্ধা তাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। বললেন – স্যার, ভয়ের দিন শেষ। বিজয় অর্জিত হয়েছে।



শুনে অনুমতি নেয়ার ভঙ্গিতে বললেন– তা হলে এখনি বাসায় যাই ? জবাবে যোদ্ধা বললেন– না স্যার, রাতটা পার হোক। এতো অন্ধকারে বাইরে যাওয়াটাই বিপজ্জনক। এ মুহূর্তে ঢাকা বিপদমুক্ত নয়। প্রফেসর জামান শুনলেন যোদ্ধার কথা। রাতেই তাঁর বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছা থাকলেও তিনি আবার বাধ্য শিশুর মতো শুয়ে পড়লেন।

প্রফেসর জামান ফর্সা, একটু রাশভারি ধরনের। সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম প্রয়াত প্রফেসর জামান আমারও ডাইরেক্ট টিচার ছিলেন। অবশ্য আমি যখন তাকে পেয়েছি তখন তিনি বেশ বয়স্ক, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজে ভুগছেন, কিন্তু তারপরও বেশ করিৎকর্মা। প্রথম সারির সার্জনদের একজন তিনি। আমি সেনাবাহিনীতে জয়েন করার পর তাঁর সাথে যেয়ে ডিপার্টমেন্টে দেখা করেছিলাম। গিয়েছিলাম দোয়ার জন্য। উনি আমাকে আদর করে মাওলানা বলে ডাকতেন। বললেন – মাওলানা তো এখন পাওয়ারফুল লোক।

প্রফেসর জামান আজ আর পৃথিবীতে নেই। গত হয়েছেন বহু বছর আগে। তাঁর স্মৃতিচারণে এক ধরনের বোবা ব্যথায় আক্রান্ত হলাম।

যেহেতু একাত্তরের তরুণ যোদ্ধা সেদিন ব্যস্ত ছিলেন তাই প্রফেসর জামানের কাছ থেকে বিদায় নিতে হলো। জিপটা সঙ্গত কারণেই ছাড়েননি তিনি। ওটাই আবার ব্যবহার করলেন। সহকারী স্টুয়ার্ট ওদের নিয়ে পুরান ঢাকায় ঢুকলো। নাজিমউদ্দিন রোডে, কাফে কাশের কাছে। ওদের গাইড দরজায় নক করলো। একসময় দরজা খুললো স্টুয়ার্ট। কিন্তু সশস্ত্র লোকজন দেখে বেচারা ভয়তে আধমরা আর কি। তাকে বুঝিয়ে বলতে হলো যোদ্ধাদের খাবারের প্রয়োজনের কথা। মুক্তিযোদ্ধারা সারাদিনের পথ শ্রান্তির পর অভুক্ত অবস্থায় রয়ে গেছে।

স্টুয়ার্টের শরীরে হঠাৎ যেন শক্তি ফিরে এলো। করিৎকর্মা হয়ে উঠলো মুহূর্তে। বললো – চলেন, কারখানায় যাই, দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।

কারখানায় পৌঁছে লোকজনকে ডেকে তুললো স্টুয়ার্ট। জানতে চাইল ব্রেড আছে কি না। কর্মচারীরা বললো – আছে। পাওয়া গেলো একবারে চার'শ ব্রেড। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের ২ ইস্ট বেঙ্গলের যোদ্ধাদের রাতের খাবারের জন্য যথেষ্ট। জিপের পিছনে তোলা হলো সব ব্রেড। তখন স্টুয়ার্টকে হোসেন জিজ্ঞেস করলেন – এগুলো খাবো কি দিয়ে ?

কথাটা সত্যি। শুকনো রুটি কি শুধু পানি দিয়ে খাওয়া যাবে? তাহলে ফেসে যাবে না গলায়? এর সাথে আরও কিছু দরকার। এ দরকার কথাটা স্টুয়ার্টের মাথায় ঢুকে গেলো। আবার কাজে লাগলো সে। পাশেই রেশনের দোকান। ভদ্রলোক তাদেরও ঘুম ভাঙালো। দু'বস্তা চিনি নিল সেখান থেকে। তারপর জিপের পিছনে প্রায় ঠাসাঠাসি করে ঢুকালো সব। রুটি কারখানার কর্মচারীদের বললো – তোরা ক'বস্তা আটা নিয়ে যা। রাতেই রুটি বানাবি যাতে ভোরে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াতে পারি।

হোসেনের পকেট খালি। অথচ ব্রেডের দাম শোধ করা দরকার। কথাটা আস্তে করে বললেন স্টুয়ার্টকে। বললেন সে মুহূর্তে ব্রেডের দাম দেয়া সম্ভব নয়, উচ্চারণটা ছিল বিব্রত কণ্ঠের।

জিভ কাটালো স্টুয়ার্ট। বললো – বলেন কি! দাম? আপনাদের কোনো দাম দিতে হবে না।

খাদ্য সংগ্রহের পুরো অভিযান ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে সেরে ওরা ফিরলো লোকেশনে। ইতোমধ্যে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে, বাকি প্রায় সবাই শুয়ে বসে। রুটি আর চিনি রাতের খাবার হিসেবে ক্লান্ত যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করার জন্য একজন এনসিও কে দায়িত্ব দেয়া হলো।

কথায় কথায় যোদ্ধার মুখেই জানলাম, সে রাতে যত্রতত্র যে গুলির আওয়াজ তা হয়েছে পুরান ঢাকাতেই সবচেয়ে বেশি। কে যে কার দিকে কখন গুলি ছুড়ছে তার কোনো হিসেব ছিল না। পুরো অ্যাকশন চলছিল চোরা গোপ্তাভাবে।

সৈনিকদের জন্য খাবার নিয়ে ফেরার পর ওরা অনুভব করলো দু'একটা ছুটে আসা গুলি মৃত্যুর ঠিকানায় পৌছে দিতে পারতো ওদেরও। অনুভব করলো কতো বড়ো ঝুঁকি নেয়া হয়েছে সেদিনের অভুক্ত যোদ্ধাদের জন্য। কিন্তু অনেক সঙ্গীর ক্ষুধা নিবারণের দায়িত্ব নেবার পর অন্য কোনো বিপদ-আপদের কথা মাথাতেই আসেনি তখন। ফেরার পরে সঙ্গী অফিসারগণও হোসেনকে বললেন– কাজটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। It was not wise to go like that.

ভাবলাম বিজয়ের শেষে যদি হঠাৎ মৃত্যু এসে যেতো ওদের দুঃখের শেষ থাকতো না তা হলে। যদিও মৃত্যুর মুখোমুখি বেশ ক'বার হয়েছে ওরা। স্বাধীন বাংলাদেশ দেখার শখ অনেকের মতো ওদেরও ছিল বইকি। সেই শখ অঙ্কুর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ বৃক্ষের অবয়ব ধারণ করেছিল সেদিন সকল যোদ্ধাদের বুকে। শুধু যোদ্ধা নয়, যারা সরাসরি যুদ্ধ করেন নি তাদেরও স্বপ্ন ছিল একটাই – মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ, যার বাতাসে পৎ পৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা লাল সবুজের পতাকা।

লেফটেন্যান্ট হোসেন ফিরে আসার পর অধিনায়ক মেজর মঈন জিজ্ঞেস করলেন– Where is the jeep? জিপ আছে শুনে উনি বললেন– চলেন, এক জায়গায় যাই। তো হোসেন চললেন তাঁর সাথে আবার। পুরান ঢাকায় গোলাগুলির শব্দ চলতে থাকলো। ঢাকার নতুন অংশের পরিস্থিতি অনেক ভালো তখন। জিপ মেজর মঈনের দেখানো পথে পথে এক সময় চলে এলো পরিবাগে। এখনকার বাংলা মটরের কাছাকাছি। একটা বাসার সামনে এসে থামলো গাড়ি। দরজায় নক করলেন অধিনায়ক। কোনো সাড়া শব্দ নেই। বেশ ক'বার নক করেও কোনো উত্তর পাওয়া গেলো না। এবার মেজর মঈন গলা বাড়ালেন। ক্রমান্বয়ে গলার সুর উচ্চ করে বললেন – আমি মঈন, দরজা খোল।



অনেকক্ষণ পর কার যেন সাহস হলো। উঁকি দিয়ে দেখলো মেজর মঈনকে। বললো – আরে, স্যার আপনে। বলে দরজা খুললো সে। ওরা ঢুকলেন বাড়ির ভিতর, একটা অত্যন্ত সাজানো গোছানো ড্রইং রুমে।

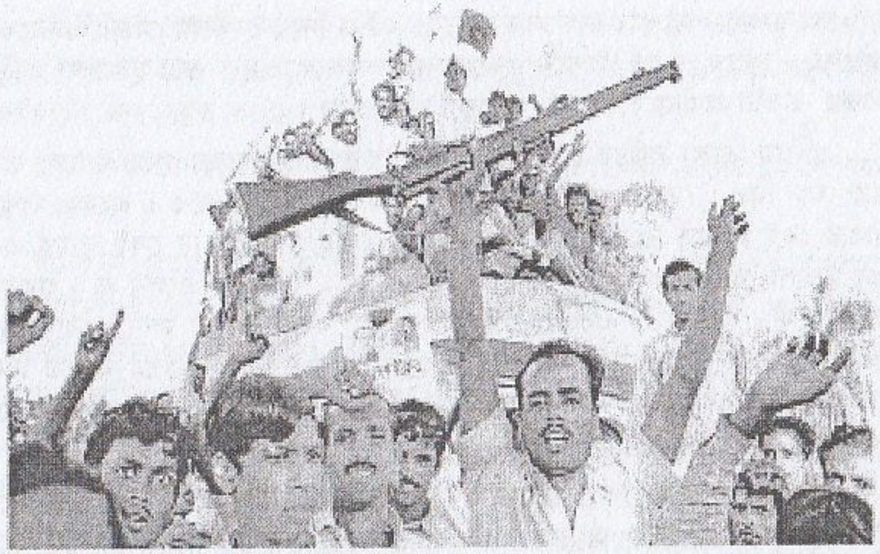
এগিয়ে এলো বাড়ির লোকজন। এতোক্ষণে ঘরে সাড়া পড়ে গেছে, ওরা শত্রু নয় মিত্র। মেজর মঈন বললেন– আমাদের খেতে দাও। এদের ঘরেও খাবার নেই। হয়ত রান্না হয়নি। ওদের খাওয়াতে পারবেন না সেই দুঃখে এক ভদ্র মহিলা কেঁদে ফেললেন। ওরা অবশ্য একদম না খেয়ে এলেন না। শুকনো খাবার (মুড়ি, বিস্কুট) এবং চা পরিবেশন করা হলো ওদের জন্য। যোদ্ধাদের ইউনিফর্ম এবং বুটের এমনি দুরাবস্থা যে এতো সুন্দর ড্রইং রুমে বসতে দ্বিধা হচ্ছিল হোসেনের। কিন্তু আপ্যায়নকারীদের আন্তরিকতা এবং আতিথেয়তার কাছে ওদেরকে হার মানতে হলো।

ঢাকায় আঁধার কাটার কোনো লক্ষণ নেই। যেন কালো চাদর বিছিয়ে দিয়েছে পৃথিবী, সকল কলঙ্ককে আড়াল করে রাখতে চাইছে। যোদ্ধাদের ফিরতে হবে এবং ফিরলেন অন্ধকারকে খানিকটা আলোকিত করে, সেই হঠাৎ পাওয়া স্বজনদের পিছনে ফেলে। খারাপ লাগছিলো না ওদের কারণ পেটে কিছু পড়েছে। এতোক্ষণে মাথা কাজ করতে শুরু করছে ঠিকঠাক।

রাতের মতো বিশ্রাম দরকার। কিন্তু জায়গা কোথায়? প্রথম থেকেই সেদিনের জিন্নাহ এভিনিউর ক'জন দোকানদার যোদ্ধাদের আপ্যায়ন করার চেষ্টা করছিল। চেয়ার দিয়েছিল যাতে ওরা অন্তত বসতে পারে।

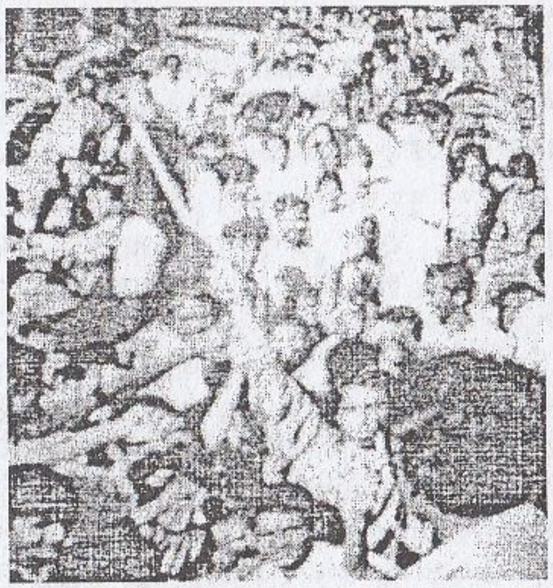
আবারও ওরাই এগিয়ে এলো। বললো– স্যার, দোকান খুলে দিই। আপনারা রাতে এখানে ঘুমান। ওরা রাজি হলো। এ ছাড়া উপায়ও নেই। রণাঙ্গনে না ঘুমিয়ে রাত পার করা যায় কিন্তু শান্তিকালীন অবস্থাতে শীতের দীর্ঘরাতে ঘুম একদম বাদ, ঠিক ভাবতেও যেন কেমন লাগে। তাছাড়া রণাঙ্গনের টেনশন দূর হয়ে যাওয়ায় কেমন হালকা লাগছে শরীর, যেন কাল বৈশাখির ছোবলের পরে শান্ত সকাল। দোকান মালিক কাঁথাটাথা বিছিয়ে কোনো রকম বিছানা করলো। ওখানেই রাতভর ঘুমালো ওরা।

একাত্তরের যোদ্ধাদের ঘুম ভাঙলো ভোরে। চোখ মেলল একে একে সবাই। ভাবতেই ভালো লাগছে, স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে শুয়ে আছে ওরা। অনিশ্চয়তার নয় মাস শেষ। বুকে ওদের আনন্দের বন্যা। ভালো লাগা যেন বাঁধ ভেঙেছে সবার মাঝে। ভালো লাগছে ভাবতে, ভালো লাগছে হাসতে। দীর্ঘ ন'মাস লড়াইয়ের পরে ফিরে পেয়েছে ওরা স্বাধীন বাংলাদেশ। এ ন'মাসে কতো শত, হাজারো এবং লাখো মানুষ দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের মহিমায় নিজেদের মহিমান্বিত করেছে। কতো না জানা জন দিন কিংবা রাতের পরোয়া না করে সাহায্য করেছে নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাদের। নৃশংস হানাদার জ্বালিয়ে দেবে ঘর, দিক না। তাই বলে আমাদের সোনার ছেলেদের আমরা সাহায্য করবো না, তাও কি হয়! আর রণাঙ্গনে একের পর এক মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মাহুতি। তারই ফসল আজকের এ স্বাধীনতা। আহা! হে স্বাধীনতা। তোমাকে সালাম।



বিজয়ের পরে আনন্দ যেন বাধ ভেঙেছে ঢাকার বুকে

১৭ ডিসেম্বরের ভোরে গভীর তৃপ্তি আর সুখের অনুভূতি নিয়ে বিছানা ছাড়লো সবাই। দোকানের সাথেই সাধারণ টয়লেট এবং হাত মুখ ধোয়ার জায়গা। ফ্রেশ হলেন যোদ্ধা অফিসারগণ কিছুক্ষণের মধ্যেই। আসলেন বাইরে। ঝরঝরে সূর্য। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। কুয়াশা মিলিয়ে গেছে। শীতের ভোরে রোদের ছোঁয়ায় মন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো ওদের। অফিসারবৃন্দ বাইরে চেয়ার নিয়ে আবার একত্রে বসলেন। জোয়ানরা প্রয়োজনীয় এলাকা জুড়ে ব্যাটালিয়নের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে ইতোমধ্যে। যে কেউ ইচ্ছে করলেই নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে কেউ ঢুকতে পারবে না আর।



ওরা উচ্ছ্বল, ওরা স্বাধীন - ঢাকার চক বাজারে আনন্দ মিছিল



কিন্তু লোকজনের ঢল নেমেছে পথে পথে। দেখতে চায় ওদের, মুক্তিযোদ্ধাদের। সাধারণ মানুষ, মুখে হাসি, হাতে ফুল, আসছে স্রোতের মতো। আসলে বাঙালি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কপোতাক্ষ আর করোতোয়া কিংবা শীতালক্ষার অববাহিকায় বেড়ে ওঠা। কাজেই বিজয়ের পরে নদীর স্রোতকে এরাই তো হার মানাবে। আসছে লোক দলে দলে, মহিলা কিংবা পুরুষ, কিশোর কিংবা কিশোরী। অনেকেই ওদের কাছে পৌঁছতে চাইছে। কিন্তু ব্যাটালিয়নের নিরাপত্তার খাতিরে তা সম্ভব নয়। অনেকে আবার ওদের সাথে সাক্ষাৎ করতে না পেয়ে কিছুটা মর্মাহত।



বাংলাদেশ এখন স্বাধীন – বিজয় উৎসব বাংলার সর্বত্র

কিছুক্ষণ পরে চলচ্চিত্র অভিনেতা রাজ্জাক সেখানে উপস্থিত হলেন। দেখতে এসেছেন বীর যোদ্ধাদের। উনি এরই মধ্যে বিখ্যাত হয়েছেন, দেশজুড়ে নামডাক। সৈনিকেরা শেষপর্যন্ত তাঁকে ঠেকালো না। উনি আসলেন অফিসারদের কাছে। উচ্ছ্বসিত হয়ে কোলাকোলি করলেন। বললেন – আমরা দারুণ খুশি। কি করতে পারি আপনাদের জন্য। আপনারা আমাদের গর্ব। খাবার আনলে খাবেন?

নায়ক রাজ্জাক যোদ্ধাদের শেষপর্যন্ত দিয়েছিলেন ড্রাইফুড। তবে যোদ্ধাদের দুপুর নাগাদ খাবার স্বাভাবিকভাবে পরিবেশিত হলো। প্রকৃত পক্ষে Soldiers march on belly and foot. কিন্তু ওদের প্রথম অংশটারই অভাব ছিল প্রথমে রাতভর এবং পরের দিনের প্রথম অংশে। উদর পূর্তির সাথে সাথে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ব্যাটালিয়ন। তারপর হুকুম হলো– Move to Race Course Jimkhana Club. বুঝা গেলো আপাতত ওখানেই ঠিকানা হবে ওদের। সূর্য হেলতে শুরু করেছে পশ্চিমে। যোদ্ধারাও জিমখানা ক্লাবের দিকে হাঁটা শুরু করলেন।



ঘাতকেরা পরাজিত - ওদের বর্তমান ঠিকানা বন্দি শিবির

ঢাকার চেনা রাস্তা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। ওরা বিকেলেই জিমখানা ক্লাবে পৌঁছে গেলেন। একটা দোতলা বিল্ডিং, একটানা লম্বা, ক'টা ঘর, কিছুটা ব্যারাকের মতো। ঐ সব ঘরে সবার জায়গা হলো না। কাজেই ক্লাব চত্বরে টেন্ট লাগাতে হলো যোদ্ধাদের থাকার জন্য।

ব্যাটম্যানরা অফিসারদের থাকার জায়গা গুছিয়ে দিলো। ঢাকার মুক্ত বাতাসে লম্বা করে শ্বাস নিলেন ওরা। হাসলেন প্রাণ খুলে। ওদের কি মনে হলো মুজতবা আলীর ইনহাস্ত ওয়াতানাম গল্পের কথাটি। ওরা কি লম্বা করে দম নিলো এবং ছাড়লো। যোদ্ধাদেরও কি রোগ বালা-মুসিবত সব দূর হয়ে গেলো নিজের স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে? ওরা কি সবাই সেদিন নতুন আবাসনের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে ভাবলো – ইনহাস্ত ওয়াতানাম, এই আমার জন্মভূমি!

বাংলার বাতাসে বারুদের গন্ধ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ঘরে ফিরতে শুরু করেছে লোকজন। রাস্তায় চলাচল বেড়েই চলেছে ক্রমশ, সারা দেশ জুড়ে, এমনকি ঢাকায়ও। হোক না কুড়ে ঘর তবু তো নিজের। জীবনকে হাতে করে নিজের ঘর মাটির বাঁধন ছেড়ে ছিল একদিন মানুষ। জীবন হারাবার ভয়ে শঙ্কিত প্রতিটি মুহূর্ত। শেষে উদ্বাস্তুর জীবন! আজ মুক্ত বাংলাদেশ, মুক্ত বাতাসে কলকলিয়ে কথা বলছে শিশু। দু'হাত উঁচিয়ে ছুটছে মা'র দিকে, আধো আধো কথা আর ভাঙা ভাঙা হাসিতে ভরে তুলছে আঙিনা। রাস্তায় মানুষের ঢল। ফিরছে ওরা স্বাধীন বাংলাদেশে। আজ আর ঘাতকেরা নেই। নেই তাদের সদর্প বিচরণ, অনাকাঙ্ক্ষিত হুঙ্কার। ওরা সব শৃঙ্খলিত। বাংলাদেশ এখন মুক্ত। তাই তো খালি পায় দীর্ঘ যাত্রায়ও সবার মুখে মুখে ফুটে আছে হাসি। এ হাসি হারাবার মাঝেও ফিরে পাবার হাসি। এ হাসি ঝঞ্ঝার পরে শান্ত সমুদ্রের বুকে উঁকি দেয়া সূর্যের হাসি।





সে সব দিনের পাকিস্তানের ভাষায় কিছু হিন্দু, কিছু সন্ত্রাসী দেশদ্রোহী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু একাত্তরের দিনগুলি যারা দেখার সুযোগ পেয়েছেন তারাই সত্যিকারের সাক্ষী সব ঘটনার। জীবন ভয়ে মানুষের স্রোত কি ভাবে ছুটেছে ভারতের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে! জহির রায়হানের Stop Genocide দেখেছি। দেখলে আঁতকে উঠে বিশ্ববাসী। এখনও আঁতকে উঠি আমরা। দেখি শরণার্থীদের লম্বা মিছিল। হঠাৎ করে প্রতিবেশি দেশে ঢুকে পড়ায় তাদের জীবনের ছন্দপতন, দুঃসহ জীবন যাপন। যাক তবুওতো প্রাণটা বেঁচে গেলো। তথ্য অনুযায়ী ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের সংখ্যা :

| | |
|---|---|
| আসাম | ৩,১২,৭১৩ |
| বিহার | ৮,৬৪১ |
| মেঘালয় | ৬,৬৭,৯৮৬ |
| ত্রিপুরা | ১৪,১৬,৪৯১ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ৭৪,৯৩,৪৭৪ |
| মোট : | ৯৮,৯৯,৩০৫ |

(তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ডকুমেন্টস। ২য় খণ্ড। ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৮১। পৃ.৮১।
হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র। ৮ম খণ্ড। পৃ. ৬৯০।)

ধীরে ধীরে চেহারা বদলাতে শুরু করেছে বাংলাদেশের। ফিরছে শরণার্থীরা নিজেদের বাস্তু ভিটায়। পোড়া মাটি সরিয়ে নতুন করে বাঁধতে শুরু করেছে ঘর। হাতে তুলে নিয়েছে লাঙল। ভাঙা ব্রিজ, কালভার্ট, সাঁকো মেরামতে লেগে গেলো বিভিন্ন সংস্থা। দেখতে দেখতে ক্ষত চিহ্ন মুছে যেতে শুরু করলো গর্বিত বাংলার। এ যেন প্রাণান্ত প্রচেষ্টা, দুঃসহ দিনগুলির শেষ চিহ্নকে নিঃশেষ করে দেয়ার। অনেক হারাবার দুঃখ আর বেদনা প্রেরণা হয়ে ইতিহাসের পাতায় লিখে দিল নতুন প্রজন্মের নাম। কেবল মাত্র ব্যথায় ভারাক্রান্ত হবার জন্য বিগত ব্যথার দিনগুলি পার হয়ে যায় নি।

কিন্তু মরণ কামড় দিয়ে গেলো পাকিস্তানি এবং তার দোসরেরা যাবার আগে। বিজয়ের শেষের দিকে ওরা বুদ্ধিজীবী হত্যা করা শুরু করলো নির্বিচারে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আসলে



ঘাতকেরা পরাজিত - ওদের বর্তমান ঠিকানা বন্দি শিবির

ঢাকার চেনা রাস্তা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো। ওরা বিকেলেই জিমখানা ক্লাবে পৌঁছে গেলেন। একটা দোতলা বিল্ডিং, একটানা লম্বা, ক'টা ঘর, কিছুটা ব্যারাকের মতো। ঐ সব ঘরে সবার জায়গা হলো না। কাজেই ক্লাব চত্বরে টেন্ট লাগাতে হলো যোদ্ধাদের থাকার জন্য।

ব্যাটম্যানরা অফিসারদের থাকার জায়গা গুছিয়ে দিলো। ঢাকার মুক্ত বাতাসে লম্বা করে শ্বাস নিলেন ওরা। হাসলেন প্রাণ খুলে। ওদের কি মনে হলো মুজতবা আলীর ইনহাস্ত ওয়াতানাম গল্পের কথাটি। ওরা কি লম্বা করে দম নিলো এবং ছাড়লো। যোদ্ধাদেরও কি রোগ বালা-মুসিবত সব দূর হয়ে গেলো নিজের স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে? ওরা কি সবাই সেদিন নতুন আবাসনের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে ভাবলো – ইনহাস্ত ওয়াতানাম, এই আমার জন্মভূমি!

বাংলার বাতাসে বারুদের গন্ধ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ঘরে ফিরতে শুরু করেছে লোকজন। রাস্তায় চলাচল বেড়েই চলেছে ক্রমশ, সারা দেশ জুড়ে, এমনকি ঢাকায়ও। হোক না কুড়ে ঘর তবু তো নিজের। জীবনকে হাতে করে নিজের ঘর মাটির বাঁধন ছেড়ে ছিল একদিন মানুষ। জীবন হারাবার ভয়ে শঙ্কিত প্রতিটি মুহূর্ত। শেষে উদ্বাস্তুর জীবন! আজ মুক্ত বাংলাদেশ, মুক্ত বাতাসে কলকলিয়ে কথা বলছে শিশু। দু'হাত উঁচিয়ে ছুটছে মা'র দিকে, আধো আধো কথা আর ভাঙা ভাঙা হাসিতে ভরে তুলছে আঙিনা। রাস্তায় মানুষের ঢল। ফিরছে ওরা স্বাধীন বাংলাদেশে। আজ আর ঘাতকেরা নেই। নেই তাদের সদর্প বিচরণ, অনাকাঙ্ক্ষিত হুঙ্কার। ওরা সব শৃঙ্খলিত। বাংলাদেশ এখন মুক্ত। তাই তো খালি পায় দীর্ঘ যাত্রায়ও সবার মুখে মুখে ফুটে আছে হাসি। এ হাসি হারাবার মাঝেও ফিরে পাবার হাসি। এ হাসি ঝঞ্ঝার পরে শান্ত সমুদ্রের বুকে উঁকি দেয়া সূর্যের হাসি।





সে সব দিনের পাকিস্তানের ভাষায় কিছু হিন্দু, কিছু সন্ত্রাসী দেশদ্রোহী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু একাত্তরের দিনগুলি যারা দেখার সুযোগ পেয়েছেন তারাই সত্যিকারের সাক্ষী সব ঘটনার। জীবন ভয়ে মানুষের স্রোত কি ভাবে ছুটেছে ভারতের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে! জহির রায়হানের Stop Genocide দেখেছি। দেখলে আঁতকে উঠে বিশ্ববাসী। এখনও আঁতকে উঠি আমরা। দেখি শরণার্থীদের লম্বা মিছিল। হঠাৎ করে প্রতিবেশি দেশে ঢুকে পড়ায় তাদের জীবনের ছন্দপতন, দুঃসহ জীবন যাপন। যাক তবুওতো প্রাণটা বেঁচে গেলো। তথ্য অনুযায়ী ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের সংখ্যা :

| | |
|---|---|
| আসাম | ৩,১২,৭১৩ |
| বিহার | ৮,৬৪১ |
| মেঘালয় | ৬,৬৭,৯৮৬ |
| ত্রিপুরা | ১৪,১৬,৪৯১ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ৭৪,৯৩,৪৭৪ |
| মোট : | ৯৮,৯৯,৩০৫ |

(তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ডকুমেন্টস। ২য় খণ্ড। ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৮১। পৃ.৮১।
হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র। ৮ম খণ্ড। পৃ. ৬৯০।)

ধীরে ধীরে চেহারা বদলাতে শুরু করেছে বাংলাদেশের। ফিরছে শরণার্থীরা নিজেদের বাস্তু ভিটায়। পোড়া মাটি সরিয়ে নতুন করে বাঁধতে শুরু করেছে ঘর। হাতে তুলে নিয়েছে লাঙল। ভাঙা ব্রিজ, কালভার্ট, সাঁকো মেরামতে লেগে গেলো বিভিন্ন সংস্থা। দেখতে দেখতে ক্ষত চিহ্ন মুছে যেতে শুরু করলো গর্বিত বাংলার। এ যেন প্রাণান্ত প্রচেষ্টা, দুঃসহ দিনগুলির শেষ চিহ্নকে নিঃশেষ করে দেয়ার। অনেক হারাবার দুঃখ আর বেদনা প্রেরণা হয়ে ইতিহাসের পাতায় লিখে দিল নতুন প্রজন্মের নাম। কেবল মাত্র ব্যথায় ভারাক্রান্ত হবার জন্য বিগত ব্যথার দিনগুলি পার হয়ে যায় নি।

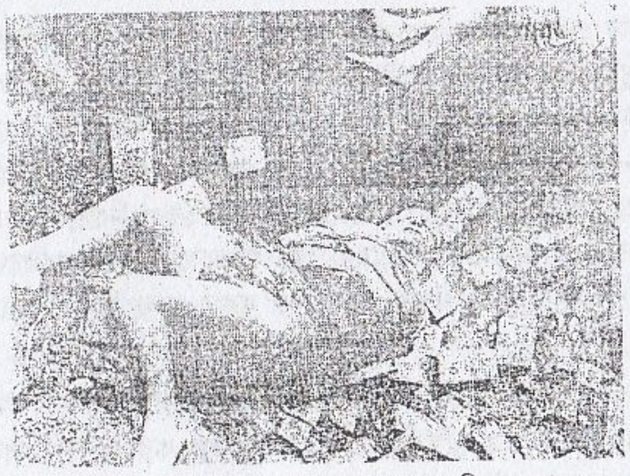
কিন্তু মরণ কামড় দিয়ে গেলো পাকিস্তানি এবং তার দোসরেরা যাবার আগে। বিজয়ের শেষের দিকে ওরা বুদ্ধিজীবী হত্যা করা শুরু করলো নির্বিচারে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আসলে

ওদের বড় শরীরের সাথে কুবুদ্ধির ব্যাপ্তিও আনুপাতিক হারে বড়ো ছিল। তা না হলে সহজেই বুঝতে পারতো বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভা, ক্ষণজন্মা সন্তানদের জন্ম দিয়েছে বার বার। দু'চারজনকে হত্যা করে এ জাতিকে নির্মূল করা যাবে না। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর সুস্পষ্ট প্রমাণ।



নিঃশেষে যারা দিয়ে গেছে প্রাণ – ক্ষয় নেই তার ক্ষয় নেই।
রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মরদেহ।

অপ্রস্তুত নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করেও যাদের পরাস্ত করা যায়নি, রাতের আঁধারে বুদ্ধিজীবী হত্যা করে সেই জাতির বিনাশ! এ নির্বোধের পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঙালি সেই জাতি যারা হানাদারদের পরাজয়ে আর নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করেছে মাত্র ন'মাসে। তবে এটা ঠিক, বুদ্ধিজীবী হত্যায় আমরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি, কিছুটা দুর্বলও। বিস্মিত আর



বিশ্ব হতবাক- প্রথিতযশা ডাক্তার ফজলে রাব্বির মৃতদেহ

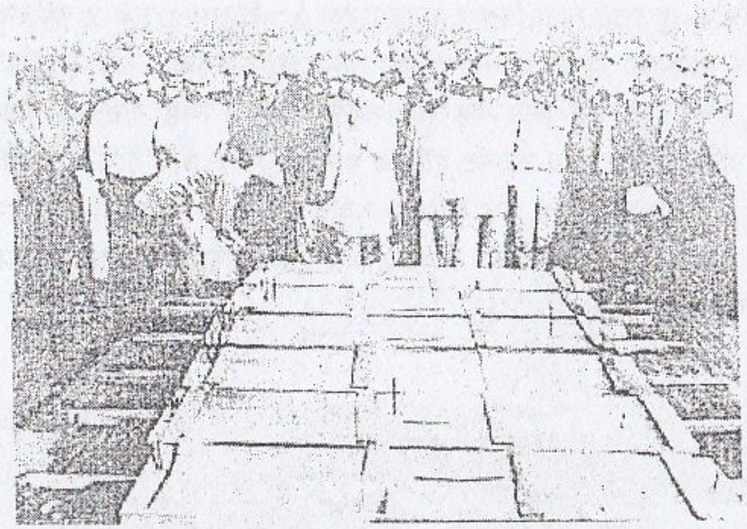


মর্মাহত হয়েছে সারা বিশ্ব। হানাদারেরা ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় কর্মরত সকল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের গভর্নর হাউজে সমবেত হবার নির্দেশ দেয়। উদ্দেশ্য, বেশি কষ্ট না করে অল্পতেই সমূলে নিধন। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ায় অফিসারবৃন্দ আর গভর্নর হাউজে যাননি। কিন্তু তাই বলে ঘাতকরা থেমে থাকেনি। রাজাকার এবং আলবদরের সহায়তায় ১৪ ডিসেম্বর রাতে তালিকা অনুযায়ী নেমে পড়ে বুদ্ধিজীবী নিধনে, বাংলার সোনার সন্তানদের ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করে।



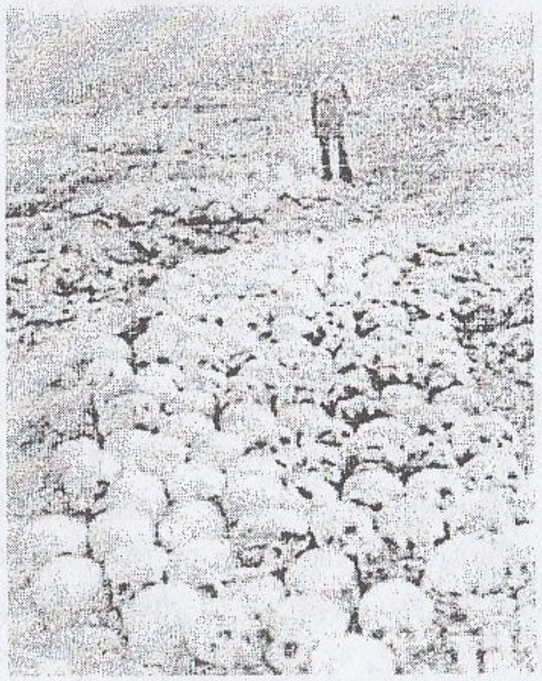
আমরা তোমাদের ভুলিনি – বধ্যভূমিতে
নিষ্প্রাণ শুয়ে আছে ক'জন বুদ্ধিজীবী

বিখ্যাত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় ছিলেন সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার, কবি আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ডা. মোহম্মদ মুর্তোজা, ডা. আবুল খায়ের, সাংবাদিক নিজামউদ্দিন, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডা. ফয়জুল মহী, রশীদুল হাসান, সেলিনা পারভীন, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বি প্রমুখ। দেশ জুড়ে কতো নাম, কতো আত্মাহুতি ! কতো কান্না! বিধাতার দিকে দু'হাত তুলে বলি, এতো ত্যাগ ছাড়া কি তুমি বিজয় দিতে পারতে না!



আলোকিত স্বজনেরা শত্রুর জিঘাংসায় গিয়ে দাঁড়াল শহীদের কাতারে – ওরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

তবে দিলে না কেন? সুখ এবং দুঃখ, দুই সহোদর যেন। একজন ছাড়া আর একজন বাঁচতে পারে না। বিজয়ের আনন্দ আর স্বজন হারানোর ব্যথা একেবারে পাশাপাশি। তবে ব্যথাকে বাঙালি ক্রমান্বয়ের বিজয়ের শক্তিতে পরিণত করলো। শোককে ভুলে সুখের পালে হাওয়া লাগতে শুরু করেছে সর্বত্র।



সভ্যতার কলঙ্ক – পাকিস্তানি বর্বরতার শিকার বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষ



শোনা যায় ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে চেয়েছিলেন। তার শেষ এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভুট্টোর মতামত জানতে চাইলে ভুট্টো তাকে নিরুৎসাহিত করেন। এ সম্পর্কে (KCA, P.25110) বলছে – President Yahya Khan had proposed to Mr. Bhutto on December 20, 1971 that he should order the Sheikh's execution before handing over power, to which Mr. Bhutto had replied "If I kill Mujib not one of the West Pakistanis will ever come home."

মনে হলো এতদিনে সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে শুরু করেছেন ভুট্টো। এর খানিকটা যদি আরো ক'মাস আগে দিতেন তাহলে হয়ত এতো রক্তপাত দেখতে হতো না।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হচ্ছে। তিনি মন্ত্রিসভার সামান্য রদবদল করেছেন। খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয় নিয়ে এসেছেন। আব্দুস সামাদ আজাদ হয়েছেন মোশতাকের স্থলাভিষিক্ত। অন্যান্য নতুন মন্ত্রিদের মধ্যে আব্দুল আজিজ, ফনিভূষণ মজুমদার, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জহুর আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখ্যযোগ্য। আইন শৃংখলা রক্ষার জন্যও নতুন নীতিমালা ঘোষণা করা হলো। এরই সাথে একনজরে খতিয়ে দেখা যাক বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ :

| | |
|---|---|
| পাকিস্তানি নির্মতায় শহীদ | - ৩০ লক্ষ |
| ভস্মীভূত ঘরবাড়ি | - ৪৩ লক্ষ |
| পাকিস্তানি অত্যাচারে বাস্তুচ্যুত | - ৩ কোটি |
| খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ | - ৩০ লক্ষ টন |
| ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়ক সেতু | - ২৭৪ টি |
| সড়ক পরিবহনের ধ্বংসপ্রাপ্ত যানবাহন | - ২৩৩ টি |
| ধ্বংসপ্রাপ্ত রেললাইন | - ৬৫ মাইল |
| ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলসেতু | - ৩০০ টি |
| ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় | - ২১,৪৮০ টি |
| ধ্বংসপ্রাপ্ত কলেজ | - ২৯০ টি |
| পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত মিল | - ৫২৬ টি (যা পরবর্তীতে সরকারি পরিচালনায় আনা হয়) |

এরই মধ্যে মিত্রবাহিনী তাদের প্রত্যাহার পর্ব শুরু করেছেন। জেনারেল মানেকশ বলেছেন – পঁচিশ হাজার সৈন্য ১৫ জানুয়ারি নাগাদ ভারতে ফিরে যাবে এবং সাত থেকে আট ডিভিশন সৈন্যের অবশিষ্টাংশ আরও কিছুকাল বাংলাদেশে অবস্থান করবে। (সূত্র: দি স্টেটস্‌ম্যান)

ডিসেম্বর পার হয়েছে। জানুয়ারির হিমেল বাতাসে শীতের আমেজ ভরপুর। বাংলাদেশের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তবুও কেন যেন এক শূন্যতা এ জাতিকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। যার নেতৃত্বে এবং প্রেরণায় পুরো জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনি নেই ! কবে ফিরবেন কিংবা তিনি আদৌ ফিরতে পারবেন কিনা এ নিয়ে সবাই সন্দিহান। অনিশ্চয়তার ভেলা ভেসে চলেছে অনির্দিষ্ট ভাবে, সাথে আছে নানা জল্পনা-কল্পনা। কিন্তু সে দিনের জাতির দাবি, বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে হাল ধরবেন দেশগঠনের।



তখনো বাতাসে হিমেল আমেজ। প্রতিটি ভোর তখনো কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু আমাদের বুকের উত্তাপ অফুরন্ত। বাংলাদেশের সরকার চাপ দিলেও ভুট্টো কিন্তু নাটকীয়তা ছাড়েননি। ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তির ব্যাপারে ভুট্টো করাচিতে এক পাবলিক মিটিংএ জনগণের মতামত নিয়েছেন। তারা একবাক্যে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ভুট্টো জনগণের সামনে বলেছেন – ধন্যবাদ, আপনারা কাঁধ থেকে একটা বড় বোঝা তুলে নিয়েছেন।

বোঝা যাচ্ছিল বরফ গলতে শুরু করেছে। গলতেই হবে। বসন্ত আসলে শীতকে বিদায় নিতেই হয়। এটাই নিয়ম। শুনলাম ভুট্টো বৈঠক করেছেন বঙ্গবন্ধুর সাথে। তাতে তিনি পাকিস্তানিদের সাথে কোনো এক ধরনের সমঝোতায় আসার অনুরোধ করেছেন তাঁকে। বঙ্গবন্ধু অবশ্য বলেছেন জনগণের সাথে আলাপ না করে তাঁর পক্ষে কোনো কথা দেয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ করে ভুট্টো ৬ জানুয়ারি ড. কামাল হোসেনকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বললেন না সেদিনও। তবে কেন যেন মন বলছিল – সময় আসন্ন, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংবাদ পাবো যে কোনো দিন, যে কোনো সময়।

ভুট্টোর কথার গাঁথুনি এবং কাজে আশার আলো থাকলেও কোনো ফলাফল ছাড়াই ১৯৭২ এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পার হলো। দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু। কেঁপে উঠলো ইথার তরঙ্গ। নেচে উঠলো বাংলাদেশ। মুক্তি! বঙ্গবন্ধুর মুক্তি!



আনন্দে হেসে উঠলো মুক্ত বিশ্ব। ৮ জানুয়ারি ১২.৩৫ মিনিটে পিআইএ'র স্পেশাল বিমান লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। বের হলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি এখন মুক্ত। বাংলাদেশের একমাত্র অবিসংবাদিত নেতা মুজিব, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে রয়েছেন ড. কামাল হোসেন তার রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

বিবিসি স্বাভাবিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে মুজিবের আগমনের উপর বিশেষ বুলেটিন প্রচার শুরু করলো। দি ডেইলি টেলিগ্রাফ বিশেষ সংখ্যা বের করলো। লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় নামলো মানুষের ঢল। ইংল্যান্ডের বিরোধী দলীয় নেতা হ্যারল্ড উইলসন বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানালেন। বাংলাদেশের মিশনের কর্মকর্তারা জননেতাকে নিয়ে গেলেন হোটেল ক্লারিজেস-এ।

হৈ চৈ পড়ে গেলো চারদিকে। ফিরে এসেছেন শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত মাটিতে, মুক্ত বাতাসে। একটা মুহূর্তের খবরও যেন ছুটে না যায়! আর প্রতীক্ষা! কখন তিনি বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখবেন। শুনলাম লন্ডনে তাঁর কণ্ঠ। বললেন কিভাবে নির্জন সেলে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করেছেন তিনি। কষ্টের অনুভূতির মাঝেও তাঁর উপচে উঠা আনন্দ অনুভব করতে পারছিলাম। যখন তিনি ধরা গলায় বললেন – আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই, আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই। বুঝলাম তিনিও বাংলার মাটিতে ফিরতে ব্যাকুল।

ফিরছেন বঙ্গবন্ধু। দেশজুড়ে বইছে প্রাণের জোয়ার। আনন্দে কলকলিয়ে উচ্ছল শিশুর মতো হাসছে জাতি। যেন যুগ যুগ পার করে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ঝলমলে সূর্য, শান্তির দূত। কিন্তু রেডিও জানালো বঙ্গবন্ধুর যাত্রা বিরতি হবে দিল্লিতে।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ারফোর্সের বিমানে এসে দিল্লির পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন। বিশেষ যাত্রী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যতদূর মনে পড়ে ভরাট গলায় ইংরেজিতে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কেউ একজন পাশ থেকে তাকে বাংলায় বলার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি বাংলাতেই বক্তৃতা করলেন। তার শেষ কথাগুলো কিছু কিছু মনে পড়ে। যেমন – আমি ফিরে যাচ্ছি, আমার হৃদয়ে কারো জন্য কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয় বরং এ তৃপ্তি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অসুরের বিরুদ্ধে মানবতার বিজয় হয়েছে।

ডিসেম্বর পার হয়েছে। জানুয়ারির হিমেল বাতাসে শীতের আমেজ ভরপুর। বাংলাদেশের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তবুও কেন যেন এক শূন্যতা এ জাতিকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। যার নেতৃত্বে এবং প্রেরণায় পুরো জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনি নেই ! কবে ফিরবেন কিংবা তিনি আদৌ ফিরতে পারবেন কিনা এ নিয়ে সবাই সন্দিহান। অনিশ্চয়তার ভেলা ভেসে চলেছে অনির্দিষ্ট ভাবে, সাথে আছে নানা জল্পনা-কল্পনা। কিন্তু সে দিনের জাতির দাবি, বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে হাল ধরবেন দেশগঠনের।



তখনো বাতাসে হিমেল আমেজ। প্রতিটি ভোর তখনো কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু আমাদের বুকের উত্তাপ অফুরন্ত। বাংলাদেশের সরকার চাপ দিলেও ভুট্টো কিন্তু নাটকীয়তা ছাড়েননি। ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তির ব্যাপারে ভুট্টো করাচিতে এক পাবলিক মিটিংএ জনগণের মতামত নিয়েছেন। তারা একবাক্যে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ভুট্টো জনগণের সামনে বলেছেন – ধন্যবাদ, আপনারা কাঁধ থেকে একটা বড় বোঝা তুলে নিয়েছেন।

বোঝা যাচ্ছিল বরফ গলতে শুরু করেছে। গলতেই হবে। বসন্ত আসলে শীতকে বিদায় নিতেই হয়। এটাই নিয়ম। শুনলাম ভুট্টো বৈঠক করেছেন বঙ্গবন্ধুর সাথে। তাতে তিনি পাকিস্তানিদের সাথে কোনো এক ধরনের সমঝোতায় আসার অনুরোধ করেছেন তাঁকে। বঙ্গবন্ধু অবশ্য বলেছেন জনগণের সাথে আলাপ না করে তাঁর পক্ষে কোনো কথা দেয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ করে ভুট্টো ৬ জানুয়ারি ড. কামাল হোসেনকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বললেন না সেদিনও। তবে কেন যেন মন বলছিল – সময় আসন্ন, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংবাদ পাবো যে কোনো দিন, যে কোনো সময়।

ভুট্টোর কথার গাঁথুনি এবং কাজে আশার আলো থাকলেও কোনো ফলাফল ছাড়াই ১৯৭২ এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পার হলো। দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু। কেঁপে উঠলো ইথার তরঙ্গ। নেচে উঠলো বাংলাদেশ। মুক্তি! বঙ্গবন্ধুর মুক্তি!



আনন্দে হেসে উঠলো মুক্ত বিশ্ব। ৮ জানুয়ারি ১২.৩৫ মিনিটে পিআইএ'র স্পেশাল বিমান লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। বের হলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি এখন মুক্ত। বাংলাদেশের একমাত্র অবিসংবাদিত নেতা মুজিব, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে রয়েছেন ড. কামাল হোসেন তার রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

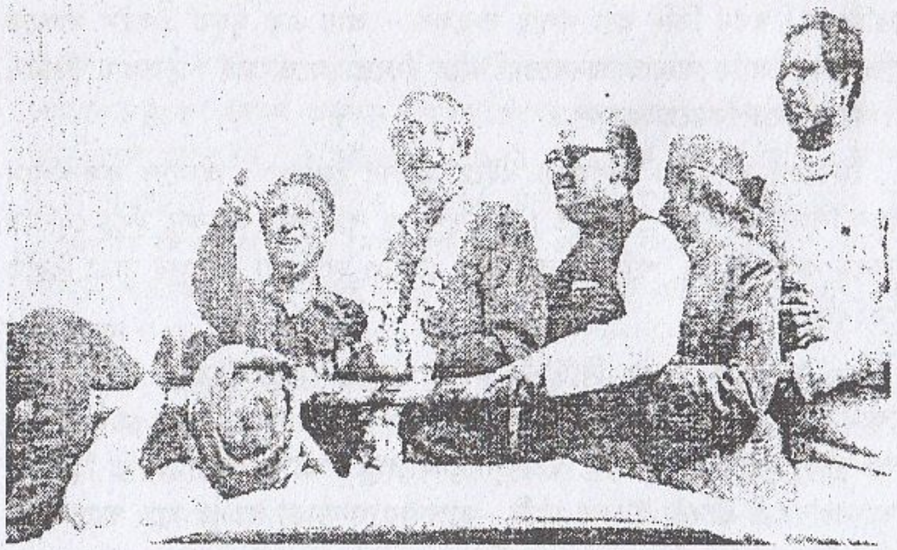
বিবিসি স্বাভাবিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে মুজিবের আগমনের উপর বিশেষ বুলেটিন প্রচার শুরু করলো। দি ডেইলি টেলিগ্রাফ বিশেষ সংখ্যা বের করলো। লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় নামলো মানুষের ঢল। ইংল্যান্ডের বিরোধী দলীয় নেতা হ্যারল্ড উইলসন বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানালেন। বাংলাদেশের মিশনের কর্মকর্তারা জননেতাকে নিয়ে গেলেন হোটেল ক্লারিজেস-এ।

হৈ চৈ পড়ে গেলো চারদিকে। ফিরে এসেছেন শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত মাটিতে, মুক্ত বাতাসে। একটা মুহূর্তের খবরও যেন ছুটে না যায়! আর প্রতীক্ষা! কখন তিনি বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখবেন। শুনলাম লন্ডনে তাঁর কণ্ঠ। বললেন কিভাবে নির্জন সেলে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করেছেন তিনি। কষ্টের অনুভূতির মাঝেও তাঁর উপচে উঠা আনন্দ অনুভব করতে পারছিলাম। যখন তিনি ধরা গলায় বললেন – আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই, আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই। বুঝলাম তিনিও বাংলার মাটিতে ফিরতে ব্যাকুল।

ফিরছেন বঙ্গবন্ধু। দেশজুড়ে বইছে প্রাণের জোয়ার। আনন্দে কলকলিয়ে উচ্ছল শিশুর মতো হাসছে জাতি। যেন যুগ যুগ পার করে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ঝলমলে সূর্য, শান্তির দূত। কিন্তু রেডিও জানালো বঙ্গবন্ধুর যাত্রা বিরতি হবে দিল্লিতে।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ারফোর্সের বিমানে এসে দিল্লির পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন। বিশেষ যাত্রী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যতদূর মনে পড়ে ভরাট গলায় ইংরেজিতে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কেউ একজন পাশ থেকে তাকে বাংলায় বলার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি বাংলাতেই বক্তৃতা করলেন। তার শেষ কথাগুলো কিছু কিছু মনে পড়ে। যেমন – আমি ফিরে যাচ্ছি, আমার হৃদয়ে কারো জন্য কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয় বরং এ তৃপ্তি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অসুরের বিরুদ্ধে মানবতার বিজয় হয়েছে।

বাহাত্তরের জানুয়ারির সেই দিনটিতেই বাংলাদেশের মানুষ এবং মাটি গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কখন প্রিয় নেতা মুজিবকে নিয়ে উড়বে পাখি আকাশে আর ফিরে আসবে আপন নিবাস, বাংলাদেশে। অবশেষে ঢাকার আকাশে কাঙ্ক্ষিত বিমানটি এসে গেলো। ক'বার চক্কর কেটে সাই সাই করে নেমে এলো মাটিতে। এক লম্বা দৌড় দিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ালো টার্মিনালের কাছে। সিঁড়ি নামানো হলো। মুখ বের করলেন বঙ্গবন্ধু। দেখলেন মুক্ত বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশ ও তার মানুষ দেখলো তাদের প্রিয় নেতাকে। আমি আরও অনেকের সাথে সুদূর পাড়াগাঁয়ে, ঢাকা থেকে বহুদূরে, বসে আছি রেডিও নিয়ে। সবার মুখে হাসি, তৃপ্তি। কিন্তু চোখে পানি কেন? হঠাৎ করেই এক সময় অনুভব করলাম বাংলার দূর গ্রামের আমরা ক'জন আসলে আনন্দে কাঁদছি। শুধু কি আমরা? না আমাদের মতো আরো অনেকেই তাদের প্রিয় নেতাকে ফিরে পাবার আনন্দে কাঁদছে। এ কান্না এক সুসন্তান তার মায়ের কোলে ফিরছে তাঁর জন্য। ফিরে পাবার কি যে অপার আনন্দ যারা ফিরে পায়নি তারা কি কখনো তা বুঝবে! যে দিন বঙ্গবন্ধু ফিরলেন আমাদের বিজয়ী যোদ্ধারা তখন জিমখানা ক্লাবেই।

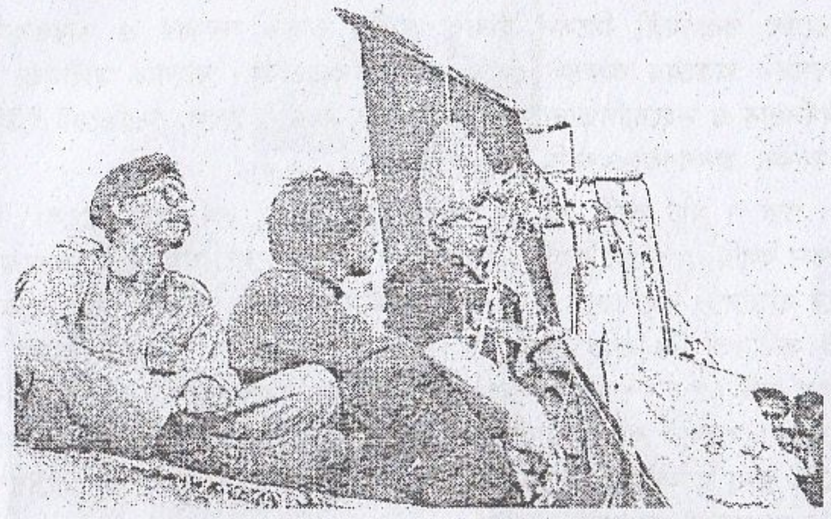


১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল - স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন

একটা কোম্পানি গার্ড অব অনার দিতে এয়ারপোর্টে গিয়েছে। জিমখানার সামনেই রেসকোর্স। সুবিশাল মঞ্চ বানানো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জন্য, যোদ্ধাদের ক্যাম্প থেকে বড়জোড় একশ' গজ দূরে। দশ থেকে পনর ফুটের কম নয় উচ্চতা। ওরা বসে আছেন। ওদের নিরাপত্তা কেউ বিঘ্নিত করলো না। কিন্তু জনতার ঢল নেমেছে রাস্তায়। তাদের উল্লাস দেখার মতো। স্লোগানে স্লোগানে



ভরে উঠেছে রাজপথ। লোকে লোকারণ্য রেসকোর্স। ১ - ১৪ মিঃ তেজগাঁও বিমান বন্দরে নেমে রেসকোর্সে পৌঁছতে বঙ্গবন্ধুর সময় লাগলো মোট তিন ঘণ্টা। ২ ইস্ট বেঙ্গলের ক'জন যোদ্ধা বসে বসে গল্প করছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্টেজে উঠে



এ এক আনন্দময় প্রত্যাবর্তন – রেসকোর্সে জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবন্ধু

গেছেন কিছুক্ষণ হলো। সেখানেও উপচে পড়া ভীড়। বসে বসেই একাত্তরের যোদ্ধারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন স্টেজে উঠে দাঁড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু। হঠাৎ সেন্ট্রি এসে ওদের কাছে একটা চিঠি দিলো। বললো – উনার নাম আবু সাঈদ চৌধুরী। কমান্ডিং অফিসার মেজর মঈন হেলাল মোর্শেদকে বললেন – দেখতো উনি কি চান। হেলাল মোর্শেদ এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোকের কাছে। আগন্তুক হেলাল মোর্শেদকে বললেন – আমি এই কাগজটা বঙ্গবন্ধুর কাছে দিতে চাই। Please do this favour for me.

হেলাল মোর্শেদ ফিরতে তার কাছে ঘটনাটা শুনলেন ওরা। তখন কিন্তু ওরা জানত না এ চিঠি বাংলাদেশের ভাবী প্রেসিডেন্টের হাতে লেখা। যা হোক, একজন সৈনিককে দিয়ে সেই চিট স্টেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো।

একত্রিশ বার তোপধ্বনির পর জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠলো। মনে হলো বঙ্গবন্ধু শিশুর মতো কাঁদছেন। কথা বলতে শুরু করেছেন তিনি। তাঁর ভারি, গলা আবেগে আপ্লুত, বুজে আসছে বারবার।

বললেন – ভাইয়েরা আমার, লাখ লাখ মানুষ প্রাণ দানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও। আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লাখ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট

করেছেন। আমাকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা। বাংলার এক কোটি লোক প্রাণভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থনদান ও সহযোগিতাদানের জন্য ব্রিটিশ, জার্মান, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম, দুর্গ গড়ে তোলো। আজ আবার বলছি আপনারা একতা বজায় রাখুন। আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো। বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবো না। দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি কারো নেই। গত দশ মাসে সেনাবাহিনী (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নেই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্য মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই।

আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি – যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পূর্ণ হবে না। তোমরা, আমার ভাইয়েরা গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্য। তোমরা রক্ত দিয়েছ। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না।

তোমরা বাংলায় যারা কথা বলো না, তারা এখন থেকে বাংলার মানুষ হও। ভায়েরা, তাদের গায়ে হাত দিও না! তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই! বাঙালি কেবলমাত্র স্বাধীনতার জন্যই আত্মত্যাগ করতে পারে তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকারের সাথে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের উপর ন্যস্ত রাখুন। ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালি এক বারই মরতে জানে। তাই বলছি, ক্ষমা চাই না। তাদের বলেছি, তোমরা আমাকে মারলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও। মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ও অন্যান্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানেই আমি মরতে চাই। তবুও মাথা নত করতে পারবো না। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা নির্দেশ মতো সংগ্রাম চালিয়ো। তারা সে ওয়াদা পালন করেছে।





শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর



শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল



শহীদ মোঃ রুহুল আমিন



শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমান



শহীদ নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ



শহীদ ফ্লাইট লে. এম মতিউর রহমান



শহীদ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ

ওরা বীরশ্রেষ্ঠ – ওরা আমাদের অহঙ্কার

এদেশের নেতা যেমন মাথা নত করেননি তেমনি মাথা নত করেনি সাত কোটি মানুষ। নিজের জীবন দেশের জন্যে বিলিয়ে দেয়ার বিরল নজির স্থাপন করে ওদেরই সাতজন হয়ে গেলেন বীরশ্রেষ্ঠ। জাতির হৃদয়ে রেখে গেলেন অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরা সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান। পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতারা – আপনারা অসংখ্য বাঙালি হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন।

আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারবো না। ওরা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। এমন গ্রাম নেই যেখানে আগুন দেয় নি, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে নি। আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এতো বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির বিশ্বে আর নেই। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এতো বেসামরিক লোক মরে নাই। সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা। (বক্তৃতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হয়েছে)

বঙ্গবন্ধুর আবেগ জড়িত বক্তৃতা শুনতে শুনতে এক সময় আমি সুন্দর এক আদর্শ বাংলাদেশের কল্পনায় নিজেদের হারিয়ে ফেলি। মনে আছে, সেই ভাষণ শুনেছি আমি এবং আমার মতো অনেকেই। বঙ্গবন্ধুর চোখ দিয়ে কল্পনায় দেখেছি এক বাংলাদেশ যেখানে গোলায় ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ। ছাত্র ছাত্রীদের কলকণ্ঠে মুখর কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস। পদ্মার বুকে ছপ ছপ করে বৈঠা ফেলে এগিয়ে চলেছে পানসি। জেলের হাতে এই মাত্র ওঠা রূপালি ইলিশের ঝিলিক। ঐ দূরে কি বাউল একতারাটা নিয়ে সুখের কোনো সুর তুলছে? না কি চোখ বন্ধ করে বসে আছে গাছ তলায় ধ্যানমগ্ন। নলখাগড়া কিংবা পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভাসছে বালিহাস, আকাশে উড়ছে গাঙচিল। আবার বালি হাসের দল হঠাৎই পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে গা ভাসাছে আকাশে, সীমাহীন সুদূর শূন্যতায়! আমার শরীর মন জুড়ে জীবনানন্দের কবিতার আমেজ ছড়িয়ে পড়লো ----

এই বোধ-শুধু এই স্বাদ পায়
সে কি অগাধ-অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ
দেখিবে সে মানুষীর মুখ।

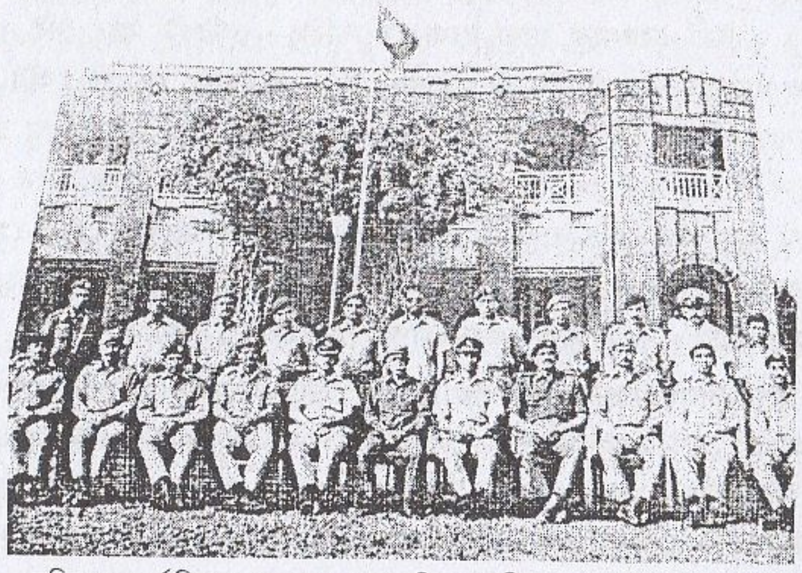




এগিয়ে চলে মুক্তিযুদ্ধের অসাধারণ স্মৃতিচারণ। এ যে বাংলাদেশের ঐশ্বর্য, বীরদের বিজয় আর বীরত্বের এক বিরল গাথা। বিলুপ্তির বিপর্যয় থেকে স্বপ্ন ভগ্নের মতো, সময়ের গর্ভ হতে উঠে আসা অনন্য সেই উপাখ্যান। সময়ের গভীর থেকে উঠে আসা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো।

সেদিনের ২ ইস্ট বেঙ্গলের স্বাভাবিক ইউনিট কর্মসূচি জিমখানা ক্লাবেই শুরু হলো। সামনেই বটতলায় একতলা একটা বিল্ডিং হয়ে উঠলো যোদ্ধাদের অফিসার মেস। খাওয়া-দাওয়া করছেন সবাই স্বাভাবিক ভাবেই। ইউনিট থেকে কেউ কেউ ছুটিতে যাচ্ছেন। প্রয়োজনে মেহমানরা আসছেন, দেখা করেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাদের সাথে। সেই সময়টাতে লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম ছিলেন ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুটেন্ট আর উপ-অধিনায়ক মেজর মতিউর রহমান।

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য বার বার হয়নি। তবে একদিন জেনারেল ওসমানী ব্যাটালিয়ন দেখতে এলে মিলে গেলো সেই



মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এজি ওসমানীর সাথে সেক্টর কমান্ডারগণ

এদেশের নেতা যেমন মাথা নত করেননি তেমনি মাথা নত করেনি সাত কোটি মানুষ। নিজের জীবন দেশের জন্যে বিলিয়ে দেয়ার বিরল নজির স্থাপন করে ওদেরই সাতজন হয়ে গেলেন বীরশ্রেষ্ঠ। জাতির হৃদয়ে রেখে গেলেন অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরা সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান। পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতারা – আপনারা অসংখ্য বাঙালি হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন।

আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারবো না। ওরা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। এমন গ্রাম নেই যেখানে আগুন দেয় নি, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে নি। আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এতো বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির বিশ্বে আর নেই। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এতো বেসামরিক লোক মরে নাই। সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা। (বক্তৃতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হয়েছে)

বঙ্গবন্ধুর আবেগ জড়িত বক্তৃতা শুনতে শুনতে এক সময় আমি সুন্দর এক আদর্শ বাংলাদেশের কল্পনায় নিজেদের হারিয়ে ফেলি। মনে আছে, সেই ভাষণ শুনেছি আমি এবং আমার মতো অনেকেই। বঙ্গবন্ধুর চোখ দিয়ে কল্পনায় দেখেছি এক বাংলাদেশ যেখানে গোলায় ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ। ছাত্র ছাত্রীদের কলকণ্ঠে মুখর কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস। পদ্মার বুকে ছপ ছপ করে বৈঠা ফেলে এগিয়ে চলেছে পানসি। জেলের হাতে এই মাত্র ওঠা রূপালি ইলিশের ঝিলিক। ঐ দূরে কি বাউল একতারাটা নিয়ে সুখের কোনো সুর তুলছে? না কি চোখ বন্ধ করে বসে আছে গাছ তলায় ধ্যানমগ্ন। নলখাগড়া কিংবা পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভাসছে বালিহাস, আকাশে উড়ছে গাঙচিল। আবার বালি হাসের দল হঠাৎই পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে গা ভাসাছে আকাশে, সীমাহীন সুদূর শূন্যতায়! আমার শরীর মন জুড়ে জীবনানন্দের কবিতার আমেজ ছড়িয়ে পড়লো ----

এই বোধ-শুধু এই স্বাদ পায়
সে কি অগাধ-অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ
দেখিবে সে মানুষীর মুখ।

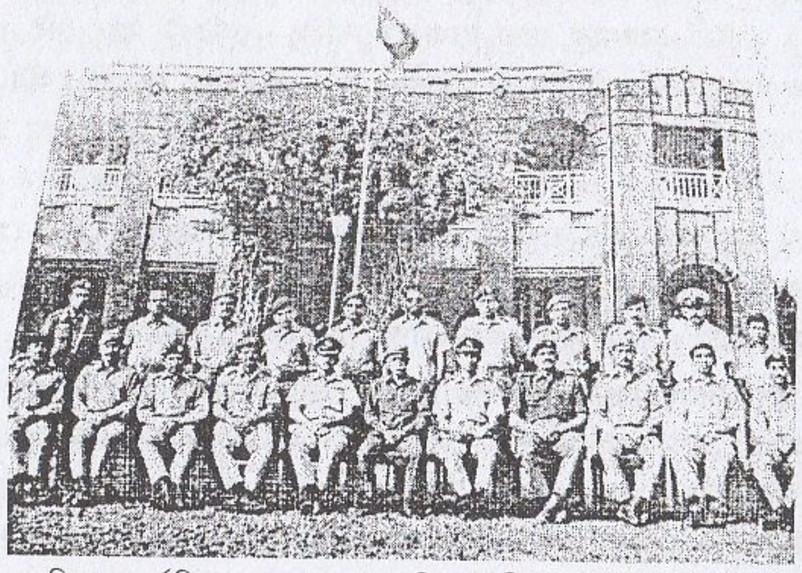




এগিয়ে চলে মুক্তিযুদ্ধের অসাধারণ স্মৃতিচারণ। এ যে বাংলাদেশের ঐশ্বর্য, বীরদের বিজয় আর বীরত্বের এক বিরল গাথা। বিলুপ্তির বিপর্যয় থেকে স্বপ্ন ভগ্নের মতো, সময়ের গর্ভ হতে উঠে আসা অনন্য সেই উপাখ্যান। সময়ের গভীর থেকে উঠে আসা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো।

সেদিনের ২ ইস্ট বেঙ্গলের স্বাভাবিক ইউনিট কর্মসূচি জিমখানা ক্লাবেই শুরু হলো। সামনেই বটতলায় একতলা একটা বিল্ডিং হয়ে উঠলো যোদ্ধাদের অফিসার মেস। খাওয়া-দাওয়া করছেন সবাই স্বাভাবিক ভাবেই। ইউনিট থেকে কেউ কেউ ছুটিতে যাচ্ছেন। প্রয়োজনে মেহমানরা আসছেন, দেখা করেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাদের সাথে। সেই সময়টাতে লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম ছিলেন ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুটেন্ট আর উপ-অধিনায়ক মেজর মতিউর রহমান।

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য বার বার হয়নি। তবে একদিন জেনারেল ওসমানী ব্যাটালিয়ন দেখতে এলে মিলে গেলো সেই



মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এজি ওসমানীর সাথে সেক্টর কমান্ডারগণ

বিরল সুযোগ। সকাল দশটা কিংবা এগারোটা হবে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন লে. কর্নেল শফিউল্লাহ এবং মেজর মঈন। অন্যান্য অফিসারবৃন্দ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। জেনারেল এসে একে একে হাত মিলালেন সবার সাথে। ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করলেন। খোঁজ-খবর নিলেন কেমন আছেন ওরা। তারপর এক সাথে বসে চা পান করলেন এবং কিছুক্ষণ পর বিদায় নিলেন।

ঐ সময় লেফটেন্যান্ট কামাল এ ব্যাটালিয়নে আসতেন মাঝেমধ্যে। তিনি জেনারেল ওসমানীর এডিসি তখন। শেখ মুজিবও দেশের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এরই মধ্যে। প্রায়ই দেখা যায় জাতির পিতা এ ব্যাটালিয়নের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করেন। একদিন লেফটেন্যান্ট কামালকে একজন অফিসার বললেন – প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আসেন একদিন, খুব খুশি হবে ট্রুপ্‌স্।

কথা রাখলেন লেফটেন্যান্ট কামাল। ক'দিন পরেরই কথা। ঠিক ঠিকই বঙ্গবন্ধু গাড়ি থামিয়ে ব্যাটালিয়নে ঢুকলেন। দেখলেন তিনি ব্যাটালিয়নের অবস্থান, সুবিধা-অসুবিধা। হাসিমুখে কথা বললেন সবার সাথে এবং বিদায় নিলেন। সত্যি কথা বলতে কি সেদিন দেশের জনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধানকে কাছে পেয়ে ওরা সবাই খুব খুশি হয়েছিল।

ঐ দিনগুলোয় মিরপুর বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকে প্রায় বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ওখানে ভীড় জমায় যতো বিহারি আর গুণ্ডাপাণ্ডার দল। এলাকাটা তখনো ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ।

শেষে সিদ্ধান্ত হলো মিরপুরের দায়িত্বভার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বুঝে নিবে। ২ ইস্ট বেঙ্গলকে দেয়া হলো সে দায়িত্ব। তারিখটা মনে নেই। মনে করতে পারলেন না লেফটেন্যান্ট হোসেন। তবে ডিসেম্বরের কোনো একটা দিন, কোনো একটা রোববার। হয়ত ৩০ ডিসেম্বর। ঐতিহাসিক সত্য হলো জহির রায়হান হারিয়ে যান ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১। যখন সিদ্ধান্তটা হলো তখন বেলা দশটার কাছাকাছি। প্রায় আধাআধি ব্যাটালিয়ন ইতোমধ্যে মিরপুরে পৌঁছে গেছে। মুভ শুরু হয়েছে সেই ভোর থেকেই। হোসেন তখনও মেসে বসে। অ্যাডজুটেন্ট তাকে বললেন – আমি জানাব কখন আপনি মিরপুরে মুভ করবেন।

হঠাৎ লেফটেন্যান্ট সেলিম এসে হাজির। ছুটিতে ছিলেন তিনি। লেফটেন্যান্ট হোসেনকে সে জিজ্ঞেস করলেন – স্যার, কি খবর? হোসেন জিজ্ঞেস করলেন – তুমি না ছুটিতে, আসলে কেন? উত্তর এলো– ভালো লাগছিল না। হোসেন বললেন – ব্যাটালিয়ন মুভ করেছে। জবাবে সেলিম বললো – তা হলে আমার আর বসে থেকে কী লাভ? বলে অ্যাডজুটেন্টের অফিসের দিকে পা বাড়ালেন।



বেলা এগারোটা নাগাদ নির্দেশনা এলো মেডিকেল সাপোর্টের জন্য। অ্যাডজুটেন্ট লে. হোসেনকে লক্ষ্য করে বললেন– আপনি সরাসরি যাবেন না। কল্যাণপুর পার হয়ে মিরপুরে ঢোকার রাস্তার পাশেই পুলিশ ফাঁড়ি। তার কাছে একটা বাড়িতে আমাদের লোকজন আছে। ওখানেই রিপোর্ট করবেন।

কাজেই ব্যাটালিয়নের ডাক্তার হোসেন চললেন ঘুরপথ ধরে অ্যাম্বুলেন্সে, আসাদ গেটের পাশ দিয়ে। সে রাস্তাটা তখন বেশ সরু। এখন যা দেখি সে রকম কিছুই ছিল না তখন। ২০০৯ এবং ১৯৭১ সালের মধ্যে ব্যবধান অনেক। বর্ষার সময় রাস্তার দু'ধার পিচ্ছিল কর্দমাক্ত থাকতো। তবে শুকনো মৌসুমে তখন কেবল শুধু ধুলোবালি, দু'পাশেই। ঠিকই এগিয়ে যেতে মিরপুরের ঢোকার রাস্তার কাছেই মিলে গেলো আর্মির লোকজন। হোসেনের চিনতে কোনো কষ্টই হলো না। আসলে এটাকে একটা চেক পয়েন্টও বলা চলে। কেউ মিরপুরে ঢুকতে চাইলেও মিরপুর সে মুহূর্তে আর নিরাপদ নয়। সে কথাটা অ্যাডজুটেন্ট লে. হোসেনকে বলে দেননি। তিনি অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে ঢুকলেন বাড়ির ভিতরে। দেখলেন লে. কর্নেল শফিউল্লাহ ব্যাটালিয়নের ক'জন অফিসার এবং কিছু পুলিশ অফিসার পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। সবার মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন।

ওখান থেকে ব্যাটালিয়নের ডাক্তার লে. হোসেনকে একজন লোক দিয়ে ২ নং সেকশনে থানার পাশের একটা বাড়িতে পাঠানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই হোসেন উপস্থিত হলেন সেখানে। এটাই আপাতত ওদের ক্যাম্প। দেখা গেলো সেখানে উপস্থিত আছেন খালেদ মোশাররফ, মেজর মঈন, মেজর মতিউর রহমান এবং আরো ক'জন। তাঁদের সকলের মুখেই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। শুনলেন ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়নের একটা কোম্পানি ৬ নং সেকশনে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাছে আসতেই হঠাৎ গুলি বৃষ্টির শিকার হয়েছে। They came under fierce fire! কে বা কারা তাদের আক্রমণ শুরু করেছে জানা যায়নি।

তবে কোম্পানিটি হঠাৎ আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ওরা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। গুলির জবাবে গুলি দিয়েই প্রতিরোধ করে চলেছে আমাদের সাহসী যোদ্ধারা। কিন্তু অদেখা শত্রুর বিরুদ্ধে সুবিধা করে উঠতে পারছে না। প্রায় অন্ধের মতোই এ লড়াই শুরু হয়েছে এবং চলছে। ব্যাটালিয়নের বেশ ক'জন হতাহতও হয়েছে। নিহতদের তালিকায় রয়েছে লেফটেন্যান্ট সেলিমের নাম। হোসেনের মনটা খারাপ হয়ে গেলো একেবারে। কিছুক্ষণ আগেও অফিসার মেসে তরতাজা প্রাণ ছিল এই চটপটে তরুণ অফিসার স্বাধীনতার পরেও কতো মৃত্যু আর দেখতে হবে আমাদের!

হোসেন জানালেন, তিনি যখন সেখানে তখন ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের সাথে ব্যাটালিয়নের কন্ট্রোল সেলের যোগাযোগ আছে কেবল অয়্যারলেসের মাধ্যমে। ইতোমধ্যে ব্যাটারিও ফুরিয়ে এসেছে। চার্জ করারও উপায় নেই। তাঁর কথোপকথন শোনা গেলো। বলছেন কিছুক্ষণ পরে হয়ত আমি আর কমুনিকেশন করতে পারবো না। আমাদের সৈনিকদের অ্যামুনিশনও ফুরিয়ে আসছে। রিপ্লি-নিশমেন্টের (Replenishment) প্রয়োজন।

এ কাজের জন্য ঢাকা সিটি থেকে ছাত্র জনতার বাস ভর্তি এক বাহিনী এসে হাজির। তাদের উৎসাহ প্রবল। বুকে সাহসেরও অন্ত নেই। মাথায় এবং কাঁধে করে চললো একদল অ্যামুনিশন নিয়ে। ওরাও যখন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছলো শুরু হলো গুলিবৃষ্টি। উৎসাহ থাকলেও উপায়হীন হয়ে পড়লো ওরা। কাজেই ফিরতে হলো মিশন ইনকমপ্লিট রেখে।

এরই মধ্যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহ অস্থায়ী ক্যাম্পে চলে এসেছেন। কোনোভাবেই তখনও ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের বাহিনীর কাছে গোলা-বারুদ কিংবা ব্যাটারি কোনোটাই পাঠাতে সক্ষম হলো না ওরা। দুর্ভাগ্য যেন ধেয়ে এলো। সূর্যাস্তের পূর্বেই ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের সাথে কন্ট্রোল রুমের সকল যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে গেলো।

উদ্বেগের মাঝে নেমে আসলো রাতের অন্ধকার। শঙ্কা হলো আরও ঘনীভূত। ঢাকার মধ্যে এমন বেকায়াদায় পড়তে হতে পারে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। তাও কিনা চূড়ান্ত বিজয়ের পর, বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে! It was just after Magrib prayer. লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহসহ অন্যান্য অফিসারও উপস্থিত। কিছুটা বিমর্ষ ভাব আর উদ্বেগ সবার মুখে। বসে আছেন সবাই। কেবল অপেক্ষার পালা।

হঠাৎ করেই বেজে উঠলো টেলিফোন। লে. হোসেন হাত বাড়িয়ে ধরলেন রিসিভার। হ্যালো বলতেই শোনা গেলো অ্যাডজুটেন্ট লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিমের কণ্ঠ। তিনি বললেন – শুধু শুনবেন এবং হ্যাঁ বা না বলে জবাব দেবেন। তা-ই করলেন হোসেন। অ্যাডজুটেন্ট বললেন – একজন লোক, নাম বললে চিনবেন। He is Mr Zahir Raihan. ভোরবেলা যখন ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ মুভ করেন তখন তিনি গেছেন। তাঁর কোনো খোঁজ আছে? জবাবে হোসেন বললেন – না। অ্যাডজুটেন্ট আবার বললেন– ক্যাপ্টেন হেলালের সাথে পরিচয় করিয়ে দিইনি। অন্যান্য ট্রুপ্‌স্ এর সাথে একটা গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম তাঁকে। আসলে আমি দিতে চাইনি। তাঁর ছোটো ভাই আমার ক্লাশমেট। তার ইনসিসটেন্সে বাধ্য হই আমি। হোসেন হ্যাঁ না করেই তাঁর সাথে কথা চালিয়ে গেলেন। অ্যাডজুটেন্ট লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম খোঁজ চাচ্ছেন জহির রায়হানের। কিন্তু ক্যাপ্টেন হেলাল



মোর্শেদের গাড়িতেও তোলা হয়নি তাঁকে। পুরো কোম্পানি আক্রান্ত হওয়ায় কে কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার কোনো আর হদিস নেই। কে কার খোঁজ নেবে আর দেবে। সবই যেন রাতের অন্ধকারে ডুবে আছে।

টেলিফোন রাখতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহ লে. হোসেনকে জিজ্ঞেস করলেন–কে অ্যাডজুটেন্ট? জবাবে তিনি বললেন– হ্যাঁ। শফিউল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন–কারও ব্যাপারে জানতে চাইছে? লে. হোসেন এবারও জবাবে বললেন হ্যাঁ। শেষে তাঁকে তখন ঘটনাটা সংক্ষেপে বলতে হলো। কিন্তু ঐ সময় কিছুই করার নেই। অদৃশ্য শত্রু হামলে পড়েছে তাদের উপর। ফলে তখন এটা নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামালেন না কেউ।

সময় গড়াতে গড়াতে রাতের আঁধার আরো ঘনীভূত হলো। এক সময় লে. কর্নেল শফিউল্লাহ কথা বললেন জেনারেল ওসমানীর সাথে। তাঁকে অবহিত করলেন এখানকার পরিস্থিতি। পরে তিনি কথা বললেন বঙ্গবন্ধুর সাথে। তাঁদের কথাবার্তার মাঝেই খালেদ মোশাররফ দু'তিন বার শফিউল্লাহর দিকে হাত বাড়ালেন টেলিফোনের জন্য। বললেন তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলতে চান। কিন্তু শফিউল্লাহ খালেদ মোশাররফের কাছে টেলিফোন দিলেন না। বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা শেষ করে রিসিভার রেখে দিলেন। ফলে চটে গেলেন খালেদ। বললেন – আমি কথা বলতে চাইলাম আপনি দিলেন না?

শফিউল্লাহ ঠাণ্ডা মাথায় বললেন – বঙ্গবন্ধু কথা না বলতে চাইলে কী ভাবে তোমাকে দেব? খালেদ আবার জানতে চাইলেন কী কী কথাবার্তা হয়েছে? ধীরে ধীরে দু'জনার গলায় কাঠিন্য কমে এলো। জবাবে শফিউল্লাহ বললেন – We can take any action to rescue of our troops.

শুনলেন খালেদ। তারপর গো ধরলেন। বললেন – আমরা মর্টার ব্যবহার করবো। শফিউলাহ মেজর মতিউরের কাছে জানতে চাইলেন মর্টার এবং এর অ্যামুনিশন সর্ম্পকে। মতিউর জানালেন মর্টার এবং গোলাবারুদের কোনো ঘাটতি নেই। শেষে তিনি হুকুম দিলেন মর্টারগুলো পজিশনে নিতে। আদেশ পালন করলেন মেজর মতিউর। রাত আটটা কিংবা সাড়ে আটটা হবে। খালেদ মোশররফ মতিউরকে মর্টার শেল ছোড়ার নির্দেশ দিলেন। সেই রাতের নীরাবতা প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ করে উড়লো মর্টার শেল। পরপর বেশ ক'বার।

শফিউল্লাহ আবার ডাকলেন খালেদ মোশাররফকে। জিজ্ঞেস করলেন – কোথায় ফায়ার করছ? জবাবে খালেদ বললেন – ১২ নং সেকশন থেকে ৬ নং সেকশন পর্যন্ত সব জায়গায়। শফিউল্লাহ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হোসেনের কাছে আবার জিজ্ঞেস করলেন – আমার লোকজন কোথায়? খালেদ জবাবে

বললেন – স্পেসিফিক লোকেশন (Specific location) জানি না। শফিউল্লাহ হোসেনের দিকে তাকিয়ে বললেন – ডক্টর, মতিউরকে ফায়ার বন্ধ করতে বলুন।

রাত এগারোটার দিকে ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের টেলিফোন এলো। জানালেন মাত্র ক'জন লোক নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু আহত অবস্থায়। শফিউল্লাহ দেরি করলেন না। দেখতে গেলেন হেলাল মোর্শেদকে মেডিকেল কলেজে। অন্যান্যদের অতো রাতে আর সেখানে যাওয়া সম্ভব হলো না। ওরা ফিরল ২ নং সেকশনের অস্থায়ী ক্যাম্পে, কিছুক্ষণ পরেই। সে মুহূর্তে আর গোলাগুলি নেই। মিরপুরে যারা অ্যাকশনে ছিলেন সবাই সামান্য বিশ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। বিশ্রাম মানে ঘুম। সারাদিন অনেক ধকল গেছে, শরীর এবং মনের উপর। স্নায়ুর উপর চাপ কমাতে তখন হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়াটাই একমাত্র চিকিৎসা।

সে রাতেরই কথা। হয়ত দেড়টা হবে তখন। দরজায় নক হলো। খুলে দেখা গেলো একজন ইন্ডিয়ান হাই র‍্যাঙ্কিং অফিসার বেসামরিক পোশাকে।

জিপের দ্বিতীয় আসনে তাঁর স্ত্রী বসা। ফিরছেন ক্লাব থেকে। হোসেনকে জিজ্ঞেস করলেন – Where is Shafiullah? তখন শফিউল্লাহ ঘুমিয়ে পড়েছেন। হোসেন এবং মেজর মঈন লেফটেন্যান্ট কর্নেল শফিউল্লাহকে ডাকলেন আগন্তুকের অনুরোধে। লে. কর্নেল শফিউল্লাহ আগে থেকেই তাঁকে চিনতেন। The Indian officer wanted to know from Shafiullah about the incidence at Mirpur. বললেন– শুনলাম তোমাদের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। এরকম হবার তো কথা নয়। চলো দেখি।

কথাবার্তায় তাকে বেশ কনফিডেন্ট মনে হলো। সেই রাতে তিনি লে. কর্নেল শফিউল্লাহকে পাশে বসালেন। স্ত্রীকে বললেন পিছনের সিটে যেতে। ড্রিঙ্ক করে ছিলেন ভদ্রলোক। তারপরও সাবলীল গতিতে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। পরে জানা গেলো গাড়ি চালিয়ে তারা গিয়েছিলেন ৬ নং সেকশন পর্যন্ত। পুরো রাস্তায় না কোনো শত্রু, না কোনো মিত্র। ভোজবাজির মতো সব উধাও। All the way quiet. No signs of any conflict. যোদ্ধাদের ভাষায় বললে– Even not a rickshaw. এককথায় বলতে পারা যায় কাক-পক্ষীরও দেখা নেই। As if nothing happened there.

উদ্বেগ আর শঙ্কার একটা রাত পার হয়ে গেলো। ঝরঝরে আর একটা দিন উপহার দিলো পৃথিবী। আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। মনেই হচ্ছে না বিগত দিন এবং রাত আমাদের জোয়ানদের অদেখা শত্রুর সাথে বাঁচা-মরার লড়াইতে



লিপ্ত হতে হয়েছে। বিদ্যুতের মতোই হঠাৎ চমক সৃষ্টি করে তারা রাতের আঁধারে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার জন্য মিরপুরে আরো ট্রুপ্স্ এবং পুলিশ ফোর্সের সমাবেশের জন্য জেনারেল ওসমানী সম্মতি দিলেন। দেখতে দেখতেই রিএনফোর্সমেন্ট (Re-enforcement) করা হলো। মিরপুর তখন আমাদের সেনাবনাহিনীর কাছে মাথা ব্যথার কারণ। যেখানে সারা দেশে স্বস্তি, আনন্দ আর পুনর্গঠনের জোয়ার, সেখানে কিনা খোদ ঢাকার বুকেই শত্রুর সদম্ভ উপস্থিতি।

কাজেই দিনের আলোয় পরিকল্পনা হলো ব্যাটালিয়নের ডাক্তার যাবেন অবাঙালি ক্যাম্পে। আর লে. হোসেন হলেন মিশন সম্পন্ন করার জন্য সে ডাক্তার। এরই মধ্যে উর্দুভাষীদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় ক'জন লোককে ডেকে আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তাদের। তারা গোলাগুলির ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিহারি এলাকায় পানি এবং বিদ্যুৎও বন্ধ করে দেয়া হলো অনতিবিলম্বে।

শেষে সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওদের ক'জন নেতৃস্থানীয় লোক নিয়ে হোসেন চললেন অ্যাম্বুলেন্সে করে। যাবেন ৬ নং সেকশন থেকে ১২ নং সেকশন পর্যন্ত। তার পাশেই একজন অবাঙালিকে বসালেন তিনি। বিপদ-আপদে রক্ষাকবজ হিসেবে কাজ করবে হয়ত। ওরা হোসেনকে আশ্বস্ত করতে থাকলো-সাব কুছ নেহি হোগা। কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারছেন না তিনি। অ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে চললো। দেখা গেলো পথের দু'ধারে লোকের ভিড়।

ওরা এগিয়ে গেলেন পরিকল্পনা মাফিক। শেষে ১১ নং এবং ১২ নং সেকশনের মাঝামাঝি জায়গায় একটা হাসপাতালে ঢুকলেন তিনি। রোগীতে ভর্তি হাসপাতাল। একমাত্র উর্দুভাষী ডাক্তার এগিয়ে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলেন গতরাতে এখানে কোনো বুলেট ইনজুরির রোগী এসেছে কী না। ঘুরে ঘুরে দেখলেনও। বুলেট ইনজুরির কোনো রোগী নেই, না জীবিত না মৃত। ডাক্তার উল্টো হোসেনকে তাদের সমস্যা দেখালো। পানি ও বিদ্যুৎ নেই, নেই ঔষধ ও পথ্য। শেষে সে অনুরোধ করে বললো – যদি সম্ভব হয় রোগীর স্বার্থে এগুলোর ব্যবস্থা করতে। জবাবে হোসেন বললেন – আমি কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যাগুলো জানাবো।

নেতৃস্থানীয় বিহারিরা কোনো চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেনি। তাদের সাধ্য মতো হোসেনের ইচ্ছে অনুযায়ী সাথে সাথে থেকেছে। শেষে আর্মি ক্যাম্প পর্যন্ত এসেছে

তার সাথে। বলতে গেলে হোসেনের ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে তার নির্ধারিত স্থানে। কিন্তু এটাও সত্য এর বিকল্প ওদের সামনে খোলা নেই তখন।

শেষপর্যন্ত কোনো ইভিডেন্স পাওয়া গেলো না। যাদু মন্ত্রবলে সব কিছু উধাও হয়ে গেছে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের দুষ্ট যাদুকরের রূপোর কাঠির ছোঁয়া। নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে গত রাতের হামলার সকল চিহ্ন। হোসেনের কাছে বিষয়টি একটি বড় ধরনের প্রশ্ন হয়েই রয়ে গেলো।

তবে হ্যাঁ, মুক্ত হয়ে গেলো মিরপুর। জঞ্জাল সাফ। প্রতিরোধের আর কোনো চিহ্নই রইলো না সেখানে। উৎসব মুখর বাংলাদেশের মূল ধারার সাথে যোগ হলো এটা। এ যেন মেঘলা আকাশে মেঘের ফাঁকে হঠাৎ উঁকি দেয়া পূর্ণিমার চাঁদ। তবে চাঁদের কলঙ্কের মতো জেগে রইলো জহির রায়হানের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি! অনেক খোঁজার পরেও তাঁর আর কোনো হদিস পাওয়া গেলো না!

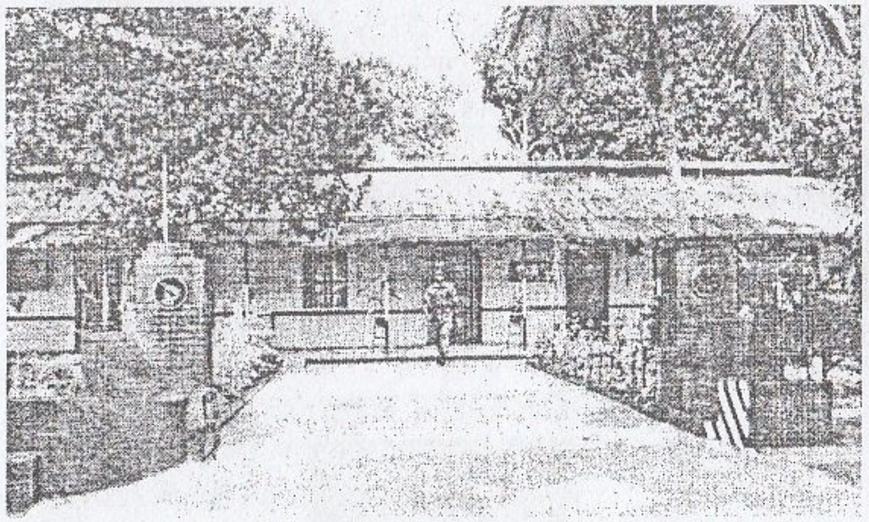


মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় পদচারণায় জেগে উঠে বাঙালি এবং বাংলাদেশিদের বিবেক। বীরত্ব আর বেদনায় ভরা দীর্ঘ নয় মাস। হারাবার এবং পাবার ঘটনাবহুল দিন এবং মাসগুলি। একাত্তরের যোদ্ধার মুখে যখন কুমিল্লা প্রসঙ্গে শুনলাম নিজেও খুঁজে ফিরলাম এর ইতিবৃত্ত। ধীরে ধীরে যা বের হয়ে এল তা ভয়াবহ। বললে ব্যথায় ভারাক্রান্ত হবে সকলের মন। হতে পারে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠবে হৃদয়ে। মানবতার বীভৎস অবমাননায় নির্বাক হয়ে যাবে পৃথিবী। মুক্ত ঢাকায় ফিরে আসার পরে ভেসে উঠলো কুমিল্লা সেনানিবাসের কথা একাত্তরের যোদ্ধার মনে। তার প্রথম কর্মস্থল, সেনাবাহিনীতে লালিত হবার প্রথম অধ্যায়। ফেলে আসা ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সহকর্মী এবং সৈনিকবৃন্দের কথা বার বার মনে হতে লাগলো তার। একাত্তরের মার্চের শেষের দিকে বি.বাড়িয়ায় থাকতেই শোনা যাচ্ছিলো কুমিলায় ব্যাপক বাঙালি সৈনিক নিধন হচ্ছে। যোদ্ধাদের কাছে সংবাদ ছিল উড়ো উড়ো। সেনানিবাসে না কেউ



বেরুতে পারছে, না কেউ ঢুকতে। কাজেই তথ্যগুলো ততোটা নির্ভরযোগ্য ছিল না তখনও। তাছাড়া যুদ্ধের ডামাডোলে এই তথ্যগুলো বারবারই হারিয়ে যাচ্ছিলো ওদের কাছে থেকে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত বাতাসে স্মৃতির নিঃশব্দ বিচরণ আবার জাগিয়ে তুললো আমাদের। হোসেন একদিন ঠিক করলেন যাবেন কুমিল্লায় এবং এক দিন ঠিক ঠিকই ট্রেনে চেপে বসলেন তিনি।

কুমিল্লায় পৌঁছে প্রথমেই গেলেন হানিমুন লজে। না কোনো স্মৃতির লেশমাত্র নেই সেখানে। খোঁজ নিলেন ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের। যা শোনা গেলো তা গা শিউরে উঠার মতো। রোমহর্ষক রক্ত হিম করা সব ঘটনা ঘটিয়েছে পাকিস্তানিরা। সভ্যতার সব চিহ্ন মান করে দিয়ে গেছে সামরিক জান্তা। মুসলিম নামের উপর লেপন করেছে কলঙ্ক। ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অধিনায়ক যথারীতি অফিস করেছিলেন ২৫ মার্চে। সেই কালরাতে ঢাকায় আর্মির তাণ্ডব মুখে মুখে ছড়াচ্ছে তখন। সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকবৃন্দের গোচরে আসতে শুরু করেছে সঠিক



একাত্তরের ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের বর্তমান অবয়ব

তথ্য। ধীরে ধীরে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা বাড়ছে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে। এরই মাঝে ২৬ মার্চ পার হলো। এলো ২৭ মার্চ। দেখতে দেখতে সেনানিবাসে বাঙালিদের ধরপাকড় শুরু হয়ে গেলো ততদিনে। ভয়ঙ্কর সেইসব দিন। আমাদের সাহসী সৈনিকবৃন্দ সেই ২৬ মার্চেই অস্ত্রাগার থেকে হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। ওরা সবাই তখন সশস্ত্র, আর খালিহাতে নেই কেউ।

৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অধিনায়ক আদেশ পেয়েছিলেন সৈনিকদের নিরস্ত্র করার। কিন্তু অবস্থা দেখে তিনি তা করলেন না এবং আদেশ অমান্য করে বাসায় গেলেন। সেখান থেকেই তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিগেড কোয়ার্টারে। সেই তাঁর শেষ যাওয়া। তিনি আর বাসায় ফিরলেন না। কমান্ডিং অফিসার চিরকালের

তার সাথে। বলতে গেলে হোসেনের ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে তার নির্ধারিত স্থানে। কিন্তু এটাও সত্য এর বিকল্প ওদের সামনে খোলা নেই তখন।

শেষপর্যন্ত কোনো ইভিডেন্স পাওয়া গেলো না। যাদু মন্ত্রবলে সব কিছু উধাও হয়ে গেছে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের দুষ্ট যাদুকরের রূপোর কাঠির ছোঁয়া। নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে গত রাতের হামলার সকল চিহ্ন। হোসেনের কাছে বিষয়টি একটি বড় ধরনের প্রশ্ন হয়েই রয়ে গেলো।

তবে হ্যাঁ, মুক্ত হয়ে গেলো মিরপুর। জঞ্জাল সাফ। প্রতিরোধের আর কোনো চিহ্নই রইলো না সেখানে। উৎসব মুখর বাংলাদেশের মূল ধারার সাথে যোগ হলো এটা। এ যেন মেঘলা আকাশে মেঘের ফাঁকে হঠাৎ উঁকি দেয়া পূর্ণিমার চাঁদ। তবে চাঁদের কলঙ্কের মতো জেগে রইলো জহির রায়হানের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি! অনেক খোঁজার পরেও তাঁর আর কোনো হদিস পাওয়া গেলো না!

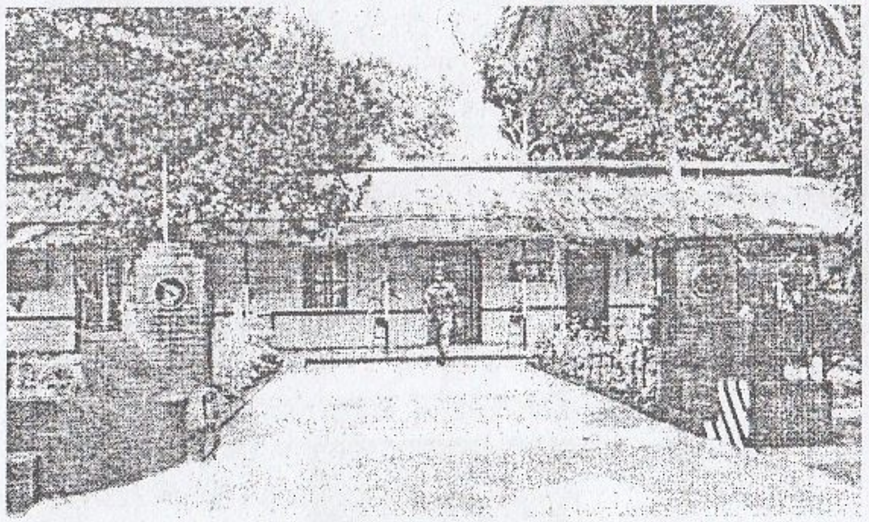


মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় পদচারণায় জেগে উঠে বাঙালি এবং বাংলাদেশিদের বিবেক। বীরত্ব আর বেদনায় ভরা দীর্ঘ নয় মাস। হারাবার এবং পাবার ঘটনাবহুল দিন এবং মাসগুলি। একাত্তরের যোদ্ধার মুখে যখন কুমিল্লা প্রসঙ্গে শুনলাম নিজেও খুঁজে ফিরলাম এর ইতিবৃত্ত। ধীরে ধীরে যা বের হয়ে এল তা ভয়াবহ। বললে ব্যথায় ভারাক্রান্ত হবে সকলের মন। হতে পারে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠবে হৃদয়ে। মানবতার বীভৎস অবমাননায় নির্বাক হয়ে যাবে পৃথিবী। মুক্ত ঢাকায় ফিরে আসার পরে ভেসে উঠলো কুমিল্লা সেনানিবাসের কথা একাত্তরের যোদ্ধার মনে। তার প্রথম কর্মস্থল, সেনাবাহিনীতে লালিত হবার প্রথম অধ্যায়। ফেলে আসা ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সহকর্মী এবং সৈনিকবৃন্দের কথা বার বার মনে হতে লাগলো তার। একাত্তরের মার্চের শেষের দিকে বি.বাড়িয়ায় থাকতেই শোনা যাচ্ছিলো কুমিলায় ব্যাপক বাঙালি সৈনিক নিধন হচ্ছে। যোদ্ধাদের কাছে সংবাদ ছিল উড়ো উড়ো। সেনানিবাসে না কেউ



বেরুতে পারছে, না কেউ ঢুকতে। কাজেই তথ্যগুলো ততোটা নির্ভরযোগ্য ছিল না তখনও। তাছাড়া যুদ্ধের ডামাডোলে এই তথ্যগুলো বারবারই হারিয়ে যাচ্ছিলো ওদের কাছে থেকে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত বাতাসে স্মৃতির নিঃশব্দ বিচরণ আবার জাগিয়ে তুললো আমাদের। হোসেন একদিন ঠিক করলেন যাবেন কুমিল্লায় এবং এক দিন ঠিক ঠিকই ট্রেনে চেপে বসলেন তিনি।

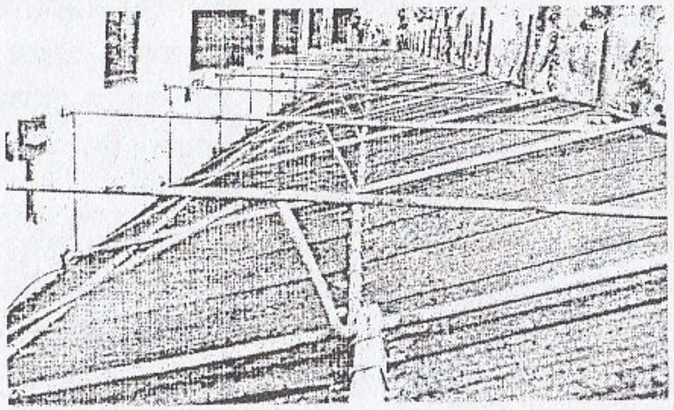
কুমিল্লায় পৌঁছে প্রথমেই গেলেন হানিমুন লজে। না কোনো স্মৃতির লেশমাত্র নেই সেখানে। খোঁজ নিলেন ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের। যা শোনা গেলো তা গা শিউরে উঠার মতো। রোমহর্ষক রক্ত হিম করা সব ঘটনা ঘটিয়েছে পাকিস্তানিরা। সভ্যতার সব চিহ্ন মান করে দিয়ে গেছে সামরিক জান্তা। মুসলিম নামের উপর লেপন করেছে কলঙ্ক। ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অধিনায়ক যথারীতি অফিস করেছিলেন ২৫ মার্চে। সেই কালরাতে ঢাকায় আর্মির তাণ্ডব মুখে মুখে ছড়াচ্ছে তখন। সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকবৃন্দের গোচরে আসতে শুরু করেছে সঠিক



একাত্তরের ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের বর্তমান অবয়ব

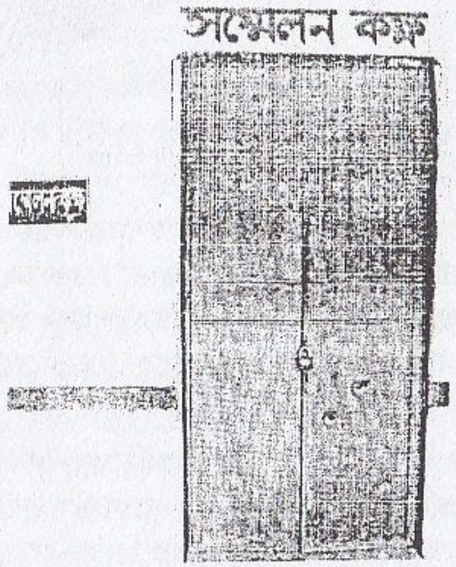
তথ্য। ধীরে ধীরে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা বাড়ছে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে। এরই মাঝে ২৬ মার্চ পার হলো। এলো ২৭ মার্চ। দেখতে দেখতে সেনানিবাসে বাঙালিদের ধরপাকড় শুরু হয়ে গেলো ততদিনে। ভয়ঙ্কর সেইসব দিন। আমাদের সাহসী সৈনিকবৃন্দ সেই ২৬ মার্চেই অস্ত্রাগার থেকে হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। ওরা সবাই তখন সশস্ত্র, আর খালিহাতে নেই কেউ।

৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অধিনায়ক আদেশ পেয়েছিলেন সৈনিকদের নিরস্ত্র করার। কিন্তু অবস্থা দেখে তিনি তা করলেন না এবং আদেশ অমান্য করে বাসায় গেলেন। সেখান থেকেই তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিগেড কোয়ার্টারে। সেই তাঁর শেষ যাওয়া। তিনি আর বাসায় ফিরলেন না। কমান্ডিং অফিসার চিরকালের



যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একাত্তরের ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স

জন্য হারিয়ে গেলেন মহাকালের বুকের মাঝে নিজের পায়ের ছাপ রেখে। আর ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অবস্থান কুমিল্লা সেনানিবাসের মাঝামাঝি। সৈনিকবৃন্দ আত্মরক্ষার সুযোগ পেলো না। ২৬ কিংবা ২৭ মার্চে পাকিস্তানিরা সতর্ক থাকলো। হানাদারেরা সম্ভবত বাঙালি সেনাদের নিধনের আদেশ পায় ২৮ মার্চে। কারণ ঐ দিন তারা বাঙালি সৈনিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করে। পরের দিন অর্থাৎ ২৯ মার্চ ২৪ এফএফ রেজিমেন্টে সহায়তায় ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স আক্রমণ করে ঘাতকের দল। মেশিনগানের উত্তপ্ত ব্যারেল থেকে ছুটে আসা তপ্ত সীসা আমাদের জোয়ানদের জীবন কেড়ে নেয়। দেশের জন্য গর্বিত শহীদ ওরা, সংখ্যায় ৪১ জন। সেই ক্ষত চিহ্ন নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই দিনকার ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স, বর্তমানে যার নতুন পরিচিত ৩১ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স নামে।



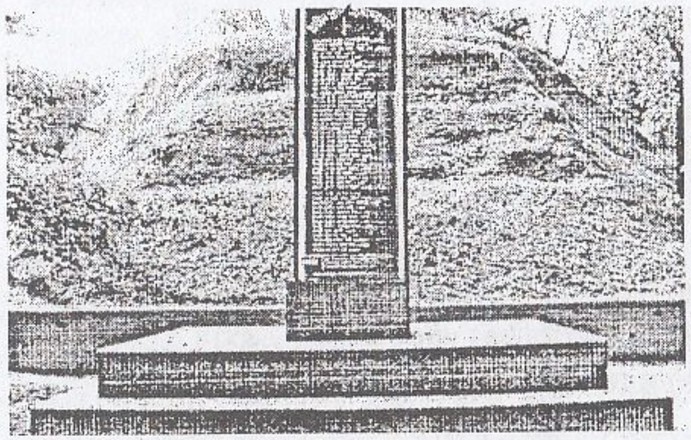

একাত্তরের ক্ষত চিহ্ন এখন বয়ে বেড়াচ্ছে
সেদিনের ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স



৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের যে সমস্ত সৈনিক নিশ্চিত আত্মাহুতি জেনেও শির উঁচিয়ে নিজ অফিসের সামনে শহীদ হন তাঁরা হলেন ঃ

(১) সুবেদার (এসএমটি) কে ইউ চৌধুরী, এএমসি
(২) নায়েব সুবেদার (এমএ) এ কে শাহ, এএমসি
(৩) নায়েব সুবেদার (জিডিএ) আবদুল হামিদ, এএমসি
(৪) নায়েব সুবেদার (জিডিএ) আবদুল গণি, এএমসি
(৫) হাবিলদার (জিডিএ) এস ইউ পাটোয়ারী, এএমসি
(৬) হাবিলদার (জিডিএ) সফিকুর রহমান, এএমসি
(৭) নায়েক (এসএমটি) আবদুল হাকিম, এএমসি
(৮) নায়েক (এসএমটি) তোজাম্মেল হোসেন, এএমসি
(৯) নায়েক (এসএমটি) আবদুর রহমান, এএমসি
(১০) নায়েক (করণিক) নূরুল ইসলাম, এএমসি
(১১) নায়েক (করণিক) সিরাজ মিয়া, এএমসি
(১২) নায়েক (করণিক) সাহেব আলী, এএমসি
(১৩) নায়েক (এমএ) আবদুস ছামাদ, এএমসি
(১৪) নায়েক (জিডিএ) আবুল কাশেম, এএমসি
(১৫) ল্যান্স নায়েক (এমএ) মোখলেছুর রহমান, এএমসি
(১৬) ল্যান্স নায়েক (এমএ) খলিলুর রহমান, এএমসি
(১৭) ল্যান্স নায়েক (এমটি) রবিউল হোসেন, এএমসি
(১৮) ল্যান্স নায়েক (কুক) মফিজুর রহমান, এএমসি
(১৯) ল্যান্স নায়েক (এমটি) আমিন হোসেন, এএমসি
(২০) ল্যান্স নায়েক (জিডিএ) আবদুল মান্নান, এএমসি
(২১) সিপাহী (এমএ) এনামুল হক, এএমসি
(২২) সিপাহী (এমটি) বাচ্চু মিয়া, এএমসি
(২৩) সিপাহী (এমটি) আবদুল হাকিম, এএমসি
(২৪) সিপাহী (এমটি) মীর হোসেন, এএমসি
(২৫) সিপাহী (এমটি) আবদুল গফুর, এএমসি
(২৬) সিপাহী (এমটি) নুরুল হুদা , এএমসি
(২৭) সিপাহী (এমটি) আবদুল মালেক, এএমসি
(২৮) সিপাহী (এমটি) নান্নু মিয়া, এএমসি
(২৯) সিপাহী (এসএমটি) রমিজ উদ্দিন, এএমসি
(৩০) সিপাহী (জিডিএ) আবুল হাশেম পাটোয়ারী, এএমসি
(৩১) সিপাহী (জিডিএ) তৈয়ব আলী, এএমসি
(৩২) সিপাহী (জিডিএ) সাফায়েত উলাহ, এএমসি

(৩৩) সিপাহী (জিডিএ) আবদুস ছামাদ, এএমসি
(৩৪) সিপাহী (জিডিএ) আবদুস ছাত্তার, এএমসি
(৩৫) সিপাহী (জিডিএ) মোখলেছুর রহমান, এএমসি
(৩৬) সিপাহী (কুক) নুরুন্নবী, এএমসি
(৩৭) সিপাহী (কুক) দানু মিয়া, এএমসি
(৩৮) এস এম ডবিউ জাফর আলী, বেসামরিক
(৩৯) ক্যান্টিন কন্ট্রাক্টর বাহার মিয়া, বেসামরিক
(৪০) ক্যান্টিন বয় নুরুল হক, বেসামরিক



ওরা কালজয়ী – ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের বীর শহীদদের সম্মানে
অফিস ভবনের সামনে গড়ে উঠেছে স্মৃতিসৌধ

হানাদারেরা একই দিনে ৪ ইস্ট বেঙ্গলের কুমিল্লায় অবস্থানরত সৈনিকদের উপরেও হামলা করে। উত্তর এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে ২৪ এফএফ এবং ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন এসএসজি'র সৈনিকরা অতর্কিত হানা দেয় ৪ ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থানে। শোনা যায়, পঁচিশে মার্চের কালরাতে ৩ কমান্ডো ব্যাটলিয়নের দু'টি কোম্পানি ঢাকায় নিরীহ বাংলা ভাষীদের হত্যাযজ্ঞে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে পাকিস্তানি উভয় দল ভারি এবং হালকা অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ শুরু করে ৪ ইস্ট বেঙ্গলের জোয়ানদের উপর। ওদের ছোঁড়া মর্টার শেল সরাসরি আঘাত হানে ইউনিটের কোয়ার্টার গার্ডে। সাথে সাথেই শহীদ হন কর্তব্যরত গার্ড কমান্ডার এবং দু'জন সেন্ট্রি। এ-রকমটা যে ঘটতে পারে দুঃসাহসী ৪ ইস্ট বেঙ্গলের উপস্থিত মাত্র সত্তর থেকে আশি জন সৈনিক তা অনুমান করতে পেরেছিল। মার্চের প্রথম দিকেই ব্যাটালিয়নকে দুর্বল করতে ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পঁচিশে মার্চ এবং তার আগেই এক কোম্পানি শমশেরনগর আর তিনটি কোম্পানি বি.বাড়িয়ায় চলে যায়। অন্য একটা প্লাটুনকে পাঠানো হয় কুমিল্লার জাঙ্গালিয়ায়। তাদের উপর দায়িত্ব বর্তায় বিদ্যুৎ গ্রীড স্টেনের পাহারা দেয়ার।



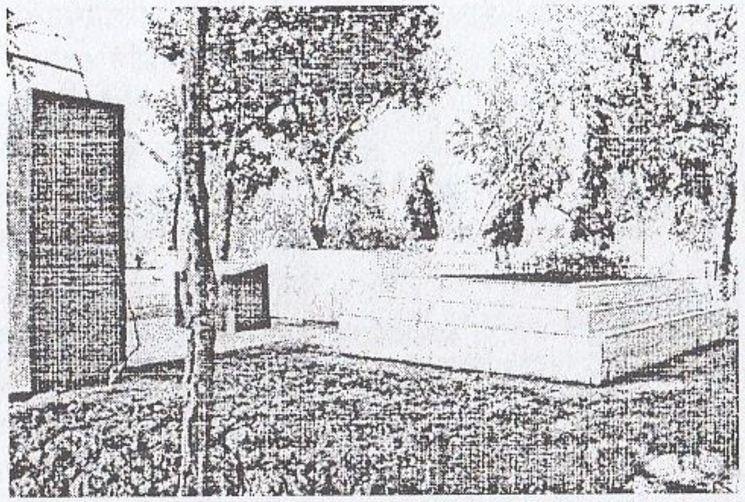
রিয়ার এলিমেন্ট কম সংখ্যক সৈনিক থাকলেও ওরা বিপদে ঘাবড়ে যায়নি। বরং সাহসের সাথে মোকাবেলা করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে নিয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয় আক্রান্ত হলে উত্তর পাশের ড্রেনে আশ্রয় নিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করবে তারা। কাজেই যখন আক্রমণ এলো ঘাবড়ে গেলো না ওরা ক'জন সাহসী যোদ্ধা। আহতরা চিৎকার করে বিশ্রামরত সৈনিকদের পূর্ব নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নিতে আহবান জানালো। অন্যান্য সৈনিক স্ট্যান্ড টু বলে চিৎকার করে উত্তর পাশের ড্রেনে আশ্রয় নেয় এবং শুরু করে প্রতিরোধ। বিপদের মুখে অটল, প্রত্যয়ী ওরা। শুরু হয় গুলির জবাবে গুলি। হানাদারদের মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণ এবং অবিরল গুলি বৃষ্টির মাঝেও আমাদের সৈনিকবৃন্দ পূর্ব দিকের ড্রেনের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। একাধারে দু'তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানিরা মেগাফোনে বাঙালি দেশপ্রেমিকদের আত্মসমর্পণের আহবান জানায়। কিন্তু বাঙালি সোনার ছেলেরা পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করেনি। তারা দক্ষিণের পাহাড় দিয়ে গ্রামের দিকে চলে যায় এবং নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হয়। সেই যুদ্ধে পাঁচজন বাঙালি সৈনিক প্রাণ হারায়। আর ওদেরই একজন সাহসী যোদ্ধা হাবিলদার আব্দুল মান্নানের বার্স্ট ফায়ারে পাকিস্তানিরা একজন মেজর পদমর্যাদার অফিসারও হারায়। তাছাড়াও তাদের হতাহতের সংখ্যা হয় আরও অনেক বেশি।

এ ছাড়াও কুমিল্লার বাঙালি হত্যাযজ্ঞের যে বীভৎস বর্ণনা জানা গেলো তাতে আঁতকে উঠতে হলো। ২৭ মার্চ দুপুর থেকেই সেদিনের ৫৩ ব্রিগেড সদর দপ্তরে বাঙালি অফিসার, জেসিও কিছু বেসামরিক কর্মচারীদের জড়ো করতে থাকে পাকিস্তানিরা। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহাঙ্গীরকেও ডেকে এনে আর বাসায় যেতে দেয়া হয়নি।

অফিসারদের একটা কক্ষে চাপাচাপি করে রাখা হয়। হানাদারেরা ব্রিগেড সদরে মোট ২৪ জন অফিসার বন্দি করে। এছাড়াও সেনানিবাসের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৩০০ জন বিভিন্ন পদবির সামরিক এবং ১২ জন বেসামারিক কর্মচারীকে নিয়ে এসে বন্দি করে রাখে। ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স এর অধিনায়কসহ যাঁরা দেশের জন্য অকাতরে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে মাত্র সামান্য কয়েকজনকে সনাক্ত করা গেছে। যেমন :

(১) লে. কর্নেল এ কে এম জাহাংগীর, এএমসি (অধিনায়ক ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স)
(২) লে. কর্নেল আনোয়ারুল ইসলাম (আইএসআই)
(৩) মেজর হাবিব (এসএসও)
(৪) মেজর এম এ খালেক
(৫) মেজর মহিউজ্জামান (ওসি, এফআইইউ)
(৬) ক্যাপ্টেন বদিউল আলম, এএমসি (উপ-অধিনায়ক, ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স)
(৭) ক্যাপ্টেন এ হুদা, আর্টিলারি (কোয়ার্টার মাস্টার, ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স)
(৮) ক্যাপ্টেন আনোয়ারুল আলম

(৯) ক্যাপ্টেন এ কে এম ফারুক
(১০) ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম
(১১) লেফটেন্যান্ট এনামুল হক, এএমসি
(১২) লেফটেন্যান্ট নূরুল ইমাম (তুর্কি), এএমসি
(১৩) লেফটেন্যান্ট সালাউদ্দিন
(১৪) লেফটেন্যান্ট আতিকুর রহমান
(১৫) সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হারুনুর রশিদ
(১৬) মাওলানা মোঃ আবদুল মান্নান, গ্যারিসন মসজিদের ইমাম
(১৭) মোঃ আবদুল খালেক, শিক্ষক ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

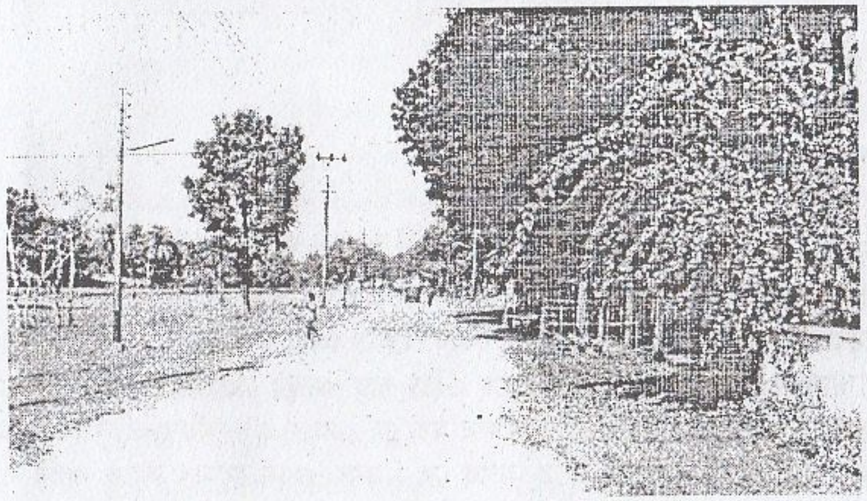


আমরা তোমাদের ভুলিনি – পরম শান্তিতে সি এম এইচ কুমিল্লার একপাশে চিরনিদ্রায় শায়িত লে. কর্নেল জাহাঙ্গীর, ক্যাপ্টেন বদিউল আলম এবং লেফটেন্যান্ট নূরুল ইমাম।

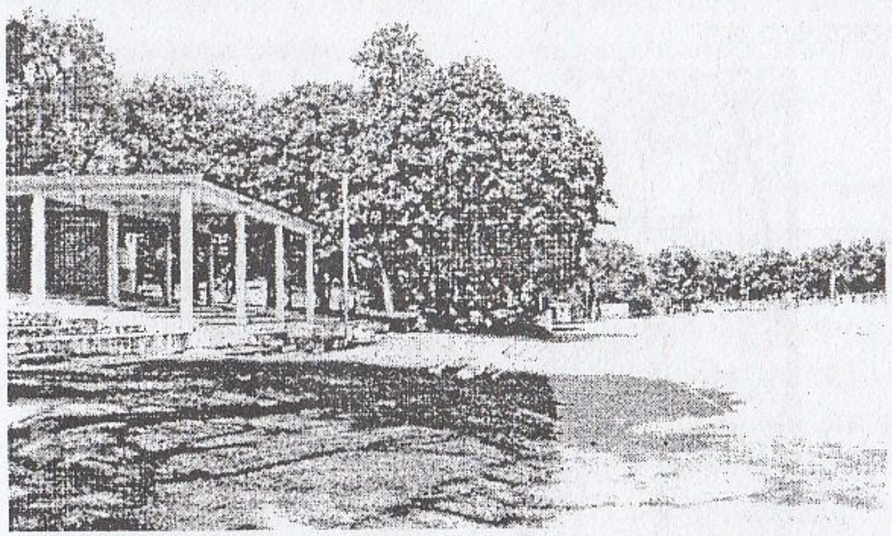
এদের হত্যাকাণ্ড যেমন হৃদয় বিদারক তেমনি নিষ্ঠুরতার এক নজিরবিহীন। ২৯ মার্চ বিকাল ৪ ঘটিকার দিকে তারা গুলি করে একে একে হত্যা শুরু করে বাঙালিদের। যখন দেখতে পেলো এভাবে তিনশ' লোকে জীবন নিতে অনেক সময় লাগবে তখন পাঁচ থেকে দশ জন করে এক একটা দলকে বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলো ঘাতকেরা। তারপর গুলি করে মেরে ফেলে দিলো গর্তে ! শুধু কী এখানেই ক্ষান্ত দিয়েছে হায়েনারা ! নির্দয়ভাবে ২৪ এফ এফ রেজিমেন্টের কোয়ার্টার গার্ডের সামনে গুলি করে হত্যা করে ২০০ জন বাঙালি সৈনিক। পরে গণকবরে ফেলে দেয়া হয় তাদের। এই নির্মমতারও নীরব সাক্ষী একাত্তরের ২৯ মার্চ। এদের নির্মমতায় লজ্জা পাবে হিটলার কিংবা হালাকুখান। একই দিনে সেনানিবাসের ৫৩ ফিল্ডরেজিমেন্ট আর্টিলারির পশ্চিম পাশের মাঠে পাকিস্তানি হানাদারেরা ৪৩০ জন বিভিন্ন পদে কর্মরত বাঙালি সৈনিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের জমায়েত করে। এরা কেউ পদাতিক বাহিনীর, কেউ এএসসি, ইএমই, এএমসি, এমইএস এবং সেনানিবাসের আশপাশের নিরীহ জনসাধারণ।



এদেরকে ১৩৫ পদাতিক ওয়ার্কশপ কোম্পানির ডাইনিং রুমে নিয়ে আসা হয় প্রথমে। সেখানেই রাতভর বন্দি থাকে সবাই। ৩০ মার্চ ভোর ছ'টায় এমইএস-এর একজন উর্দুভাষী এসডিও এসে পরিচয় পত্রধারী কিছু কর্মচারীদের নিয়ে যায়। সকাল ন'টার দিকে ঘাতকের দল একটি রশি নিয়ে ডাইনিং রুমে আসে এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে বন্দিদের বেঁধে ফেলে। তারপর তিন ভাগ করে বড় দলকে নিয়ে যায় স্কোয়াশ কোর্ট এলাকায়। বাকি দু'দলের এক দলকে নিয়ে যায় সার্ভে ইনিস্টিটিউটে (বর্তমানে আনন্দকুঞ্জ) এবং অন্যদল ধর্ম সাগরদিঘির (বর্তমান রূপ সাগরদিঘি) পূর্ব পাশের কোয়ার্টারে দুপুর দু'টো পর্যন্ত ঘাতকেরা বন্দিদের নিয়ে এভাবে ব্যস্ত থাকে।

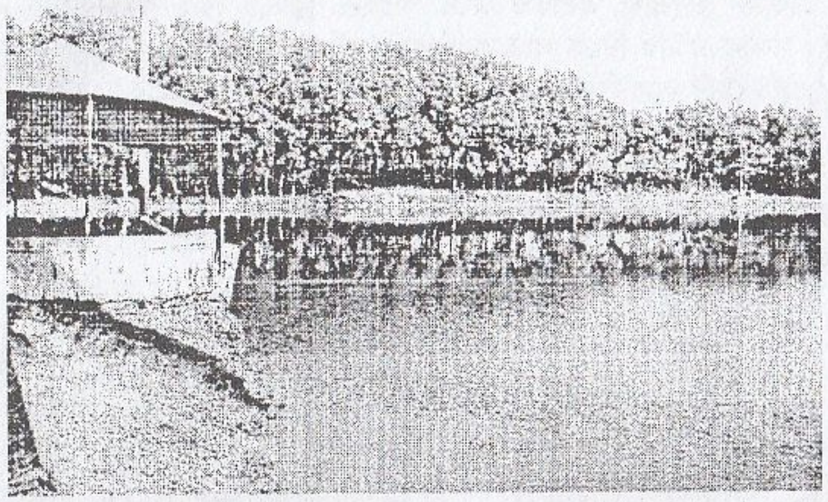


প্রেরণার উৎস সেই ইতিহাস – কুমিল্লা সেনানিবাসে লে. কর্নেল জাহাংগীর সড়ক



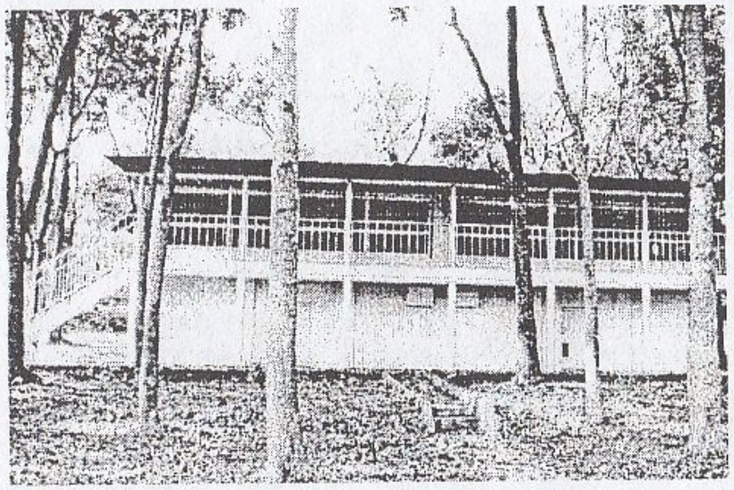
আমরা ভুলিনি তোমাদের – বর্তমান এম আর চৌধুরী স্টেডিয়ামের ঠিক দক্ষিণ পাশে পাওয়া যায় একটি গণ কবর।

স্কোয়াশ কোর্ট এলাকায় ছ'জন পাকিস্তানি ছ'টি চাইনিজ এলএমজি নিয়ে প্রহরায় ছিল। সন্ধ্যা ছ'টার দিকে অর্ডন্যান্স কোরের একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন এসে



গণহত্যার নীরব স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রূপসাগর দিঘি

বন্দি বাঙালি সৈনিকদের হত্যার নির্দেশ দেয়। গর্জে উঠে এলএমজি। নিজ দেশে বিদেশি হানাদারদের নির্মমতার শিকার হলো আমাদের সৈনিক এবং অন্যান্য বেসামরিক কর্মচারীবৃন্দ। দৈব্যক্রমে বেঁচে যায় আব্দুর রহমান। আহত অবস্থায় নিরাপদ এলাকায় চলে আসতে সক্ষম হয় সে। আর এই নজিরবিহীন নির্মমতার স্বাক্ষ্য বহন করে আজও বেঁচে আছে সে। তবে এখন কেমন আছে জানি না। অন্যান্য বন্দি সাপের বিষাক্ত ছোবল থেকে তারা পরিত্রাণ পেয়েছিল কিনা জানা যায়নি। স্কোয়াশ কোর্ট এলাকায় যে সমস্ত শহীদদের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তারা হলেন :



তোমাদের আত্মাহুতি আমাদের দিয়েছে সীমাহীন
শক্তি – একাত্তরের কুমিল্লা সেনানিবাসের স্কোয়াশ কোর্ট



ক। এ এস সি সৈনিকবৃন্দ

(১) সুবেদার মোঃ আবদুল গফুর চৌধুরী
(২) নায়েব সুবেদার আবদুল জলিল
(৩) হাবিলদার আবদুর রব
(৪) হাবিলদার ফরহাদ
(৫) নায়েক আবদুর রব
(৬) নায়েক লুৎফুর রহমান
(৭) নায়েক (ক্লার্ক) মো. আবদুর রহমান
(৮) সিপাহী আইয়ুব আলী
(৯) সিপাহী আবদুল জব্বার
(১০) সিপাহী রমিজ উদ্দিন

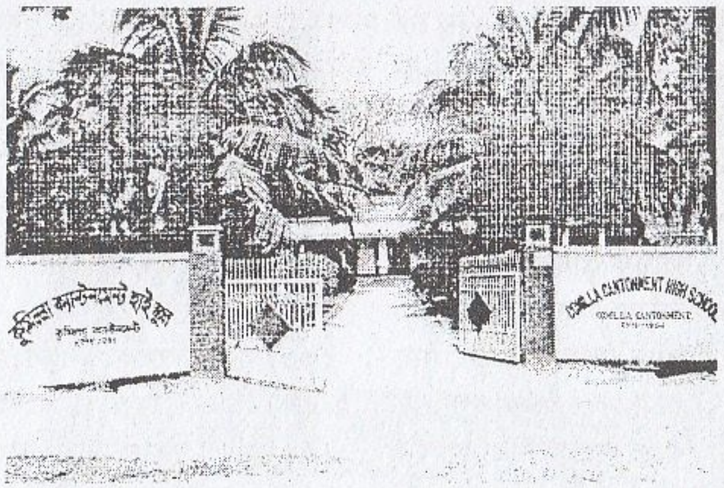
খ। ই এম ই সৈনিকবৃন্দ

(১) সম্মানিত লেফটেন্যান্ট আবদুল লতিফ
(২) হাবিলদার ক্লার্ক আবুল জব্বার
(৩) হাফেজ আবদুস সোবহান
(৪) সুবেদার নাদের হোসেন
(৫) সুবেদার শহীদুল আলম
(৬) নায়েব সুবেদার বরকত হোসেন
(৭) নায়েব সুবেদার আলী আহম্মেদ
(৮) নায়েব সুবেদার নুর মোহাম্মদ
(৯) নায়েব সুবেদার আবদুস সাত্তার
(১০) নায়েব সুবেদার হাবিবুর রহমান
(১১) নায়েব সুবেদার জুনাব আলী
(১২) সি কিউ এম এইচ আয়ুব আলী
(১৩) হাবিলদার এ আর চৌধুরী
(১৪) হাবিলদার এম এইচ রহমান
(১৫) হাবিলদার মনিরুল হক
(১৬) হাবিলদার গোলাম মর্তুজা
(১৭) হাবিলদার আব্দুর রশিদ
(১৮) হাবিলদার রফিক উদ্দিন
(১৯) হাবিলদার মনজুর মোর্শেদ
(২০) হাবিলদার রোকন উদ্দিন
(২১) হাবিলদার আবু তাহের
(২২) হাবিলদার আবদুল মালেক
(২৩) হাবিলদার মতিউর রহমান
(২৪) হাবিলদার আবদুল আজিজ
(২৫) হাবিলদার আসগর আলী
(২৬) হাবিলদার মোঃ রঙ্গু মিয়া
(২৭) হাবিলদার তাইছুর রহমান
(২৮) নায়েক মাহতাব উদ্দিন
(২৯) নায়েক সিরাজুল ইসলাম
(৩০) নায়েক আবদুল মতিন
(৩১) নায়েক আবদুর রব ভূঁইয়া
(৩২) নায়েক এসএম হক
(৩৩) নায়েক মনজুর আহমেদ
(৩৪) নায়েক বাতেন
(৩৫) ল্যান্স নায়েক জামাল মিয়া
(৩৬) ল্যান্স নায়েক খলিলুর রহমান
(৩৭) ল্যান্স নায়েক সামছুল হক
(৩৮) ল্যান্স নায়েক আবুল কাশেম
(৩৯) ল্যান্স নায়েক সিরাজুল হক
(৪০) ল্যান্স নায়েক সফি উলাহ
(৪১) ল্যান্স নায়েক আবদুল হাদি
(৪২) সিএফএন আব্দুর রশিদ
(৪৩) সিএফএন খোরশেদ আলম মৃধা
(৪৪) সিএফএন ফজলুল হক
(৪৫) সিএফএন আবদুল গণি
(৪৬) সিএফএন আওলাদ হোসেন
(৪৭) সিএফএন মোয়াজ্জেম হোসেন
(৪৮) সিপাহী হাবিবুর রহমান
(৪৯) সিপাহী আবদুল হান্নান
(৫০) সিপাহী আমিন উলাহ
(৫১) সিপাহী মকবুল আহম্মেদ
(৫২) সিপাহী মাহফুজ মিয়া
(৫৩) সিপাহী বিচ্চু মিয়া

গ। বেসামারিক ব্যক্তিবর্গ

(১) মোঃ ওমর আলী -সেনানিবাস পোস্ট মাস্টার
(২) চৌকিদার মোঃ কাওসার আলী -এসএসডি
(৩) টেইলার মাস্টার -এসএসডি
(৪) সুলতান আহম্মেদ- নিশ্চিন্তপুর
(৫) মকবুল হোসেন - ”
(৬) মকসুদ হোসেন - ”
(৭) আবদুল হামিদ -সাহেব নগর গ্রাম
(৮) সরাফত আলী - ”
(৯) রেশমত আলী - ”
(১০) আবদুল গণি- ”
(১১) ছায়েদ আলী (এমইএস এ কর্মরত ছিল) - ”
(১২) নুরুল ইসলাম - ”

শুধু কী এখানেই শেষ! না, তা হয়নি। বর্তমান ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুলের অবস্থান তদানীন্তন ডিটাচমেন্ট ১১৭ এফআইইউ'র কার্যালয় ছিল। এখানেও ওরা বর্বরতার নজির স্থাপন করে। আজও এখানে নির্যাতনের শিকার নিরস্ত্র বাঙালির




শান্ত পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পাকিস্তানি নির্যাতনের
সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল

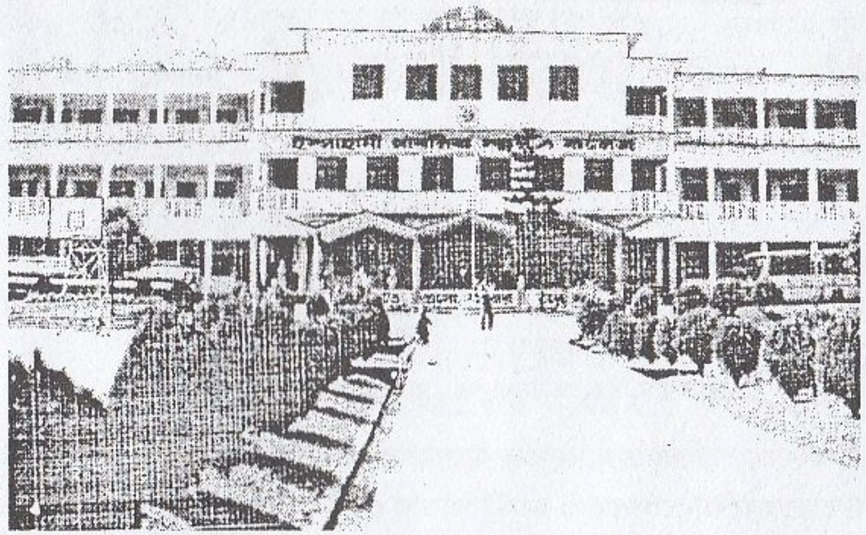
আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে আছে। একাত্তরের স্টেশন অফিসার্স মেস আজ অতীত হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্ম দেখলে কোনো দিন জানবেও না এখানে কী ঘটেছিল একাত্তরে। বর্তমানের ঝক ঝকে ট্রাস্ট ব্যাংকের গভীরে রয়েছে কল্পনাহীন নিষ্ঠুরতার ইতিহাস। এর অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে কর্মব্যস্ত বিআরইউ যেখানে



নবীন সৈনিকদের নির্বাচন করা হয়। এখানেই একাত্তরের ২৯ মার্চ পাকিস্তানিরা বিকৃত উল্লাসে ইস্পাহানি পাবলিক স্কুলের ১১ জন শিক্ষকসহ কুমিল্লা জেলার ডিসি ও এসপিকে হত্যা করে। এখানে যারা শহীদ হন তারা হলেন :

(১) জনাব মো. সামসুল আলম চৌধুরী, ডিসি কুমিলা
(২) জনাব মো. কবির উদ্দিন, এসপি কুমিলা
(৩) জনাব আবুল কাশেম, এমএ, উপাধ্যক্ষ
(৪) জনাব আজিজুল হক, এমএম, এমএ, সিনিয়র শিক্ষক
(৫) জনাব আবদুল জব্বার, বিএ, এমএড, সিনিয়র শিক্ষক
(৬) জনাব তাজুল ইসলাম, বিএ, এমএড, সিনিয়র শিক্ষক
(৭) জনাব শরফুদ্দিন আহমেদ, বিএসসি, বিএড, সিনিয়র শিক্ষক
(৮) জনাব মোছলেহ উদ্দিন, এমএ, এমএড, সিনিয়র শিক্ষক
(৯) জনাব আমির হোসেন, বিএবিএড, সিনিয়র শিক্ষক
(১০) জনাব আবদুল মালেক, বিএসসি, বিএড, সিনিয়র শিক্ষক
(১১) জনাব মফিজ উদ্দিন ভুঁইয়া, বিএসসি, বিএড, সিনিয়র শিক্ষক
(১২) জনাব খায়রুল বাসার, (চারুকলা শিক্ষক)
(১৩) জনাব আবদুল মান্নান, (খণ্ডকালীন ধর্মীয় শিক্ষক)

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়। ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজের মতো বিদ্যাপিঠকে ওরা বন্দিশিবির বানিয়ে ফেলে। নিরস্ত্র সৈনিকদের নির্মম হত্যার পর তাদের পরিবার বর্গ ও স্থানীয় কিছু বাঙালিকে এখানে বন্দি করে রাখে প্রায় যুদ্ধের পুরোটা সময়। কিন্তু তবুও কী জানি সব? সব জানা হয়েছে

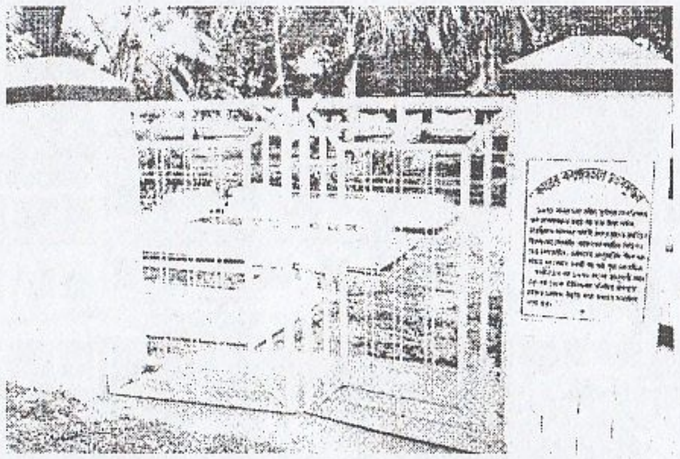


একাত্তরের বন্দিশিবির- কুমিল্লা সেনানিবাসের এক প্রান্তে
দাঁড়িয়ে আছে ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ

আমাদের? এখনো হয়ত রয়েছে অনেক আত্মত্যাগ, আপন মহিমায় অবিনশ্বর কিন্তু বিলীন হয়ে গেছে কালের গর্ভে। মানুষের জীবন হতে পারে এতোটা মূল্যহীন! মৃত্যুর আগে কিংবা পরেও নেই কোনো মর্যাদা। লাথি মেরে কিংবা ঠেলে শহীদদের মৃতদেহ ফেলে দেয়া হলো গর্তে, চরম অবহেলায়। কিন্তু বেঁচে যায় মনোরঞ্জন শীল। সে এখানে সবার চুল কাটতো। শোনা গেলো তাকেও বধ্যভূমিতে নেয়া হয়েছিল। হঠাৎ এক পাকিস্তানি অগ্রসরমান ঘাতককে থামায়। তারপর জিজ্ঞেস করে – এ আদমি মরণেকে বাদ হামকো বাল কোনো বানায় গা? তো বেঁচে গেলো মনোরঞ্জন। কিন্তু আত্মাহুতি দিলো একের পর এক ওরা অনেকে – অপরাধ, ওদের মায়ের ভাষা হলো বাংলা ভাষা। শহীদ হলো লেফটেন্যান্ট নুরুল ইমাম। যে ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সর্বকনিষ্ঠ অফিসার ছিল। যে ভেবেছিল - Army is a safer place.

এ সেনানিবাসের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ মিনার, ব্যস্ত রাস্তার কাছাকাছি নীরব সমাধি। এখানে যাদের সমাহিত করা হয়েছে তাদের সবার পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই সমাধির সামনে একটা বোর্ডে লেখা ক'টি কথা ওদের গৌরবময় আত্মত্যাগের কথা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

ওহে পথিক
বল ওদের গিয়ে
মাতৃভূমির সম্মানে শহীদ আমরা

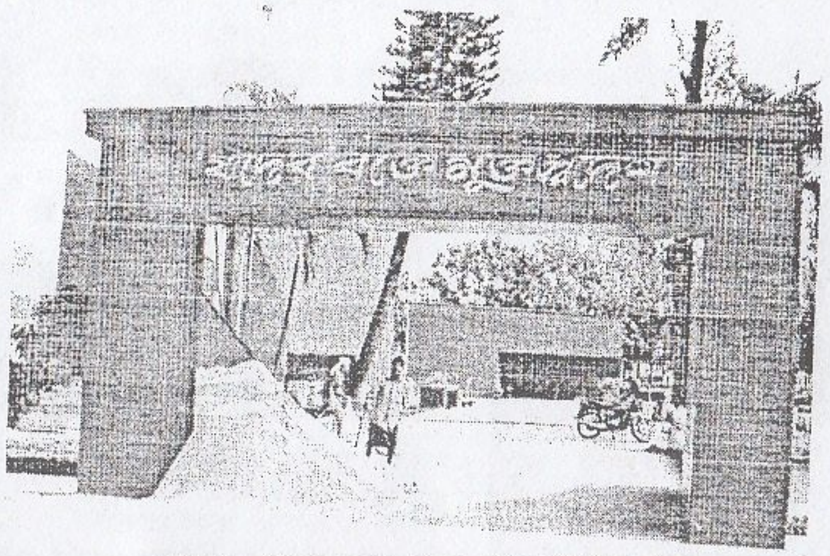


ওরা শহীদ, ওরা আমাদের গর্ব - কুমিল্লা সেনানিবাসে শহীদ সমাধি

আসলে পাকিস্তানিরা ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে ছিল নিষ্ঠুর। ওরা ঘাতক! কী ভাবে দেবে নিরাপত্তা! এ যেন বিধাতার দেয়া অধিকার হরণের প্রচেষ্টা। ওরা ভাষাকে ছিনাবে, কেড়ে নেবে প্রাণ। এ যেন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা একদল নেকড়ে, হামলে পড়েছে লোকালয়ে। ধারালো নখরের আঘাতে বধ করে চলেছে চোখে



দেখা যে কোনো প্রাণি। যেন জীবনের সকল চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে গোরস্থানের নীরবতায়। এতো মৃত্যু! এতো কান্না! এতো আত্মত্যাগ! শুধু স্বাধীনতার জন্য। শুধু নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার জন্য! অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে ফিরলাম



কুমিল্লা সেনানিবাসের পূর্ব প্রান্তে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে
শহীদদের স্মরণে যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ

আমাদের বীরত্বগাথা, অপরাজিত বাংলার কথা, দুঃসাহসী বাংলাদেশিদের কথা। এক সময় অশ্রুভরা চোখে মনে হলো গর্বিত মোরা, উঁচু করে দেখছি আকাশ, বিশাল, সীমাহীন, ঝিকিমিকি তারায় ভরে আছে দিগন্ত জুড়ে। দেখলাম সুকান্ত কে। কতো সুকান্তের মিছিল! ওরা এগিয়ে আসছে হাতে হাত মিলিয়ে। সম্মিলিত কণ্ঠে বলছে :

সে সূর্য
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়ত আমরা প্রত্যেকেই
এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবো।

দেখলাম মাথার উপরে ছাদের শক্ত বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেছে বহুক্ষণ। শুধু দাঁড়িয়ে আছে নীলাঞ্জনা হয়ে, জ্বল জ্বলে লাল সূর্যটাকে বুকে ধরে ঐ দূরের বিশাল আকাশ। মনে হলো শহীদদের মিছিলে আমিও একজন। আমিও গর্বিত, শরীক হয়েছি ওদের সাথে, ওদের মিছিলে।




মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহঙ্কার - একাত্তরের গৌরবময় ঐতিহ্যকে বুকে ধরে
ঢাকা সেনানিবাসে গড়ে উঠেছে বিজয় কেতন

অহঙ্কারে স্ফীত বুকে এগিয়ে চলেছি ওদের সাথে পা মিলিয়ে। দেখি চোখের সামনে এক জাতি, ত্যাগে বলীয়ান। মৃত্যু ভয়হীন, দেশের জন্য উৎসর্গকৃত ওরা সাত কোটি, ওরা তের কোটি, ওরা পনের কোটি, ওরা সীমাহীন।

কালের বুকে আসন গেড়েছি আমরা। মৃত্যুকে করেছি জয়। শোক আমাদের শক্তি, শোক আমাদের প্রেরণার অগ্রদূত। এদেশ কারো কাছে পরাভূত হবার নয়। আনন্দে আর অহঙ্কারে সুকান্তের কণ্ঠে মিলিয়ে চিৎকার করে বললাম :

সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়!
জ্বলে - পুড়ে - মরে ছাড়খার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।



মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিক সংকলনে যে সব গ্রন্থাবলী এবং বিভিন্ন সূত্রের সাহায্য নিয়েছি তা নিম্নে উলেখ করা হলো :

১। বাংলাদেশ ডকুমেন্টস। ১ম ও ২য় খণ্ড। ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৮১।
২। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিলপত্র। প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম, দশম খণ্ড। ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২
৩। মোহাম্মদ সা'দাত আলী সম্পাদিত। গৌরব একাত্তর। ঢাকা : আহমদ পাবলিক হাউস, ২০০৩।
৪। এএসএম শামছুল আরেফিন। মুক্তিযুদ্ধে জয়দেবপুর। ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ২০০১
৫। আব্দুল আজিজ বাগমার। স্বাধীনতার স্বপ্ন উন্মেষ ও অর্জন। ঢাকা : অপূর্ব সংসদ, ১৯৯৯।
৬। রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। ৭১ এর দশ মাস। ঢাকা : কাকলী, ১৯৯৭।
৭। মেজর (অব.) আকতার আহমেদ। অ্যাডভান্স টু কন্টাক্ট। ঢাকা : ইউপিএল, ২০০০।
৮। মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। ঢাকা : কাকলী, ১৯৯৫।
৯। মেজর নাসিরউদ্দীন। যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা। ঢাকা : অনুপম, ১৯৯২।
১০। লে. জেনারেল জেএফ জেকব। সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা। ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৭।
১১। মুহম্মদ নুরুল কাদির। দুইশ ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা। মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৭।
১২। জাহানারা ইমাম। একাত্তরের দিনগুলি। ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬।
১৩। এয়ার মার্শাল আসগর খান। জেনারেলস ইন পলিটিক্স। ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৮৩।
১৪। মেজর জেনারেল কে. এম. শফিউল্লাহ। বাংলাদেশ এট ওয়ার। ঢাকা : একাডেমিক পাবলিসার্স, ১৯৮৯
১৫। কিসিংস কনটেম্পরারি আরকাইভস
১৬। মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র। তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ঢাকা : ১৯৮৮
১৭। শফিকুল ইসলাম স্বপন। এক মুক্তিযোদ্ধার জীবনযাপন। ঢাকা: ১৯৯৭
১৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী। আফতাব আহমদ। ঢাকা : ১৯৯৫
১৯। দি পাকিস্তান টাইমস (ডিসেম্বর ২১, ২২, ১৯৭০ এবং জানুয়ারি ১৪, ৩১ মার্চ ২, ১৯৭১)
২০। দি ডন (ডিসেম্বর ২৮, ফেব্রুয়ারি ১০, ১৬, ১৭, ১৯৭০)
২১। দি পাকিস্তান অবজারভার (৪ জানুয়ারি, ১৯৭১)
২২। দি স্টেটস্‌ম্যান
২৩। বাল্টিমোর সান
২৪। নিউইয়র্ক টাইমস
২৫। গার্ডিয়ান
২৬। দি টেলিগ্রাফ